পূর্ব পাকিস্তান

অমিতাভ গুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

মুদ্রাকর
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

১৬·০০

ভূমিকা

পার্টিশান বা দেশ-বিচ্ছেদ কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। কারণ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক একটি অখণ্ড জাতির যে পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যাশিত, দেশ খণ্ডনের দ্বারা সেই প্রত্যাশার কিম্বা জীবন বিকাশের সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে থাকে। কোরিয়া ভিয়েৎনাম, জার্মানী এবং ভারতবর্ষ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দেশগুলি কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত হয়েছে এবং এই দেশগুলির কোথাও জীবন ও সমাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সম্প্রদায় ও জাতিগত অজস্র জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। খণ্ডিত ভারত ও পাকিস্তানের দিকে তাকালে এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে। প্রধানতঃ যে হিন্দু-মুস্লিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ খণ্ডিত ও স্বাধীন পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো, সেই আসল উদ্দেশ্যই সার্থক হয়নি। অর্থাৎ পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ উভয় অংশেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা অব্যাহত আছে। এই সমস্যার মীমাংসা করতে হলে বাস্তব ক্ষেত্রে (কেবল খাতায় পত্রে নয়) সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্যের অধিকার এবং শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত সমাজের অধিকার দিতে হবে। ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উর্ধ্বে রাষ্ট্রকে স্থান দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান কোন অংশেই আজও সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি—সমাজতন্ত্র তো এখনও বহু দূর। তবু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এদেশে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রচলিত, যার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মূল অধিকারগুলি আমাদের মোটামুটি করায়ত্ত। কিন্তু গত দশ বছরের অধিক কাল ধরে পাকিস্তানে ছিল আয়ুব-শাহীর একনায়কত্ব। ফলে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি ঘটেছে বহু কাল এবং এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান বা পূর্ব-বঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ, সেখানে পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, পশ্চিম-পাকিস্তান—বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের একাধিপত্য সেখানে এবং পূর্ব-বাংলা কার্যতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের একটা উপনিবেশ মাত্র। এই ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের আশায় পূর্ব-বঙ্গের মানুষ এবং বিশেষভাবে ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে আসছে গত যোল সতেরো বছর ধরে। পূর্ব-বঙ্গ আজ বিদ্রোহের পথে।

শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত পূর্ব-বঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের এই দুঃসহ অবস্থা সম্পর্কে যে বইটি লিখেছেন, সমসাময়িক ইতিহাসের দিক থেকে তা' অত্যন্ত মূল্যবান্। শ্রীগুপ্ত সাম্প্রতিক কালের সাংবাদিকতায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি শক্তিমান লেখক, নানা পত্রপত্রিকায় দেশ-বিদেশ এবং বিশেষভাবে পাকিস্তান সংক্রান্ত তাঁর রচনাগুলি আমি পড়েছি। পাঠকবর্গ এই পুস্তকের বিষয়বস্তু থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ চিত্র পাবেন। সমাজ ও জীবন বিকাশের বহু মৌলিক দাবী নিয়ে আজ পাকিস্তানে এবং বিশেষভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে সঙ্কট। এই সঙ্কটের চেহারা শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। কিন্তু এগুলি তাঁর কোন কল্পনাপ্রসূত রচনা কিম্বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত কোন প্রোপাগাণ্ডা নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতা ও সংবাদপত্রের মন্তব্য এবং রিপোর্ট থেকে শ্রীগুপ্ত তাঁর বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। এ জন্য তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ, পূর্ব-বাংলার দ্বন্দ্ব ও মনোভাব পূর্ব-বঙ্গবাসীদের বক্তব্য থেকেই উপস্থিত করা হয়েছে। এ জন্য লেখকের যত্ন এবং পরিশ্রমও উল্লেখযোগ্য। আমি লেখককে তাঁর এই পুস্তকের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি দেশখণ্ডন সত্ত্বেও বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কলিকাতা
১৩. ৫. ৬৯

ইতি—
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

'পূর্ব-পাকিস্তান' রচনার কাজে আমি নানা ভাবে যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ না জানালে আমার কর্তব্য-চ্যুতি ঘটবে বলে মনে করি।

প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় গণনেতা ও পাক-ভারত মৈত্রী সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার অক্লান্ত মহান কর্মী পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার যুক্তফ্রণ্ট সদস্য শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত-কে যাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান নিয়ে আমার গবেষণা হয়তো সুরুই হোত না। বস্তুতঃ পান্নালালবাবুর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'কম্পাস' পত্রিকায় আমার পাকিস্তান নিয়ে লেখার হাতে খড়ি হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও বার্তা-সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পাকিস্তান' নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে লিখতে থাকি এবং এই বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার বহু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই বইটির জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে দৈনিক বসুমতী, পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রী সমর গুহ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য-র পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর লেখা কয়েকটি অতীব তথ্যসমৃদ্ধ রচনা এই গ্রন্থ-প্রণয়ণে আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁদের কাছে এই ঋণ স্বীকার করে সমরবাবু ও অসিতবাবুকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এঁরা ছাড়া পশ্চিম-বঙ্গে ও পূর্ব-পাকিস্তানে আমার অগণিত বন্ধুবান্ধব যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন—বিশেষ করে 'কম্পাস' সংবাদ-সাপ্তাহিক গোষ্ঠির সতীর্থরা—তাঁদেরও আমি জানাচ্ছি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অমিতাভ গুপ্ত

"স্মরণিকা"
২৫৫।৯৮, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

স্বর্গত পিতা
৺হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

রমনার দু-প্রান্তে গাছে গাছে কৃষ্ণচূড়া লাল রং ছড়াচ্ছে। যেন পথের দু-পারে আগুন লেগেছে। সকাল থেকে মেঘলা করে আছে। কেমন যেন থমথমে দিন। চিলগুলো নিঃশব্দ ডানায় এমন উদাসীর মতন উড়ছে, মনে হয় যেন আকাশে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এমন সময় প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দে একটা মিলিটারি ট্রাক সবেগে চলে গেল। আবার যেন গভীর নিস্তরঙ্গতা। রাস্তায় কোন লোক নেই। গাছের ফাঁক দিয়ে মেডিকেল কলেজ, মুসলিম হলের চূড়া দেখা যাচ্ছে। স্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে গেল। তারই হুইসিলের আওয়াজ ভেসে এল। যেন একটা চাপা কান্নার মতন সে আওয়াজ। দূরে রাস্তার ধারে উলঙ্গ একটি ভিখিরি বালক। আপনভোলা হয়ে গান ধরেছে। সে গানের কোনো কথা বোঝা গেল না। পিঁ-পিঁ শব্দে প্রচণ্ড হর্ন, জিপের কনভয়, মিলিটারি কনভয় চলেছে। মিলিটারি জিপের রং দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। ঐ জিপের ভেতরে যারা বসে আছে তারাও আমার-ই মত মানুষ। কিন্তু ঐ সামরিক পোশাক আর লৌহ শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত হয়ে ব্রেনগান হাতে করে পিট-পিট করে যখন ওরা গাড়ী থেকে রাস্তার লোকের দিকে তাকায়, তখন কেমন যেন ভয়-ভয় করে, গা ছম-ছম করে। হঠাৎ হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ ভেসে এল। ঐ ধ্বনি শুনে সারা শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। কতবার তো শুনেছি 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—নিজেও তো দিয়েছি এই শ্লোগান কতবার। কিন্তু এমনভাবে এই শ্লোগান কানে যাওয়ায় উদ্বেলিত হয়ে উঠিনি তো কখনও। কেমন যেন একটা উত্তেজনা বোধ

করতে লাগলাম। জোরে পা চালালাম ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের দিকে। মাইকে গান ভেসে আসছে—'দুর্গম-গিরি কান্তার মরু'। আরো জোরে পা চালালাম। 'হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন্ জন' সমবেত কণ্ঠে চলেছে গান। সঙ্গে যারা গাইছে তাদের চেহারাগুলোও ততক্ষণে নজরে পড়ল। সভাস্থলে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয়েছে। লোক আসছে, চারদিক থেকে লোক যেন সারা ঢাকা শহরের উদ্দাম যৌবন পদ্মার বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতন ঠেলে আসছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। অসংখ্য স্রোতোধারার সম্মিলিত ছাত্র-জনতা যেন বিশাল সমুদ্রের রূপ নিয়েছে। এ যেন 'উনিশ-শো বাহান্ন'র রক্তঝরা দিনগুলোকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সতের বছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারি আকাশ তো ঠিক এমনই মেঘলা করেছিল। ছাত্র-জনতার স্বতোৎসারিত আন্দোলন সেদিনও সারা শহরকে উদ্বেলিত করেছিল। শহীদের বুকের রক্তে সেদিন নতুন ইতিহাস লিখেছিল পূর্ব-বাংলার ছেলেমেয়েরা। বাংলাকে মাতৃভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা। আজ সতের বছর পরেও সেই সংগ্রাম শেষ হয়নি। সে সংগ্রামের অগ্নি আজও বহ্নিমান। তাই আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুরু হয়েছে আন্দোলনের আরেক নতুন পর্যায়। 'আত্মদান করব তবু আত্মসমর্পণ করব না'—চতুর্দিক থেকে গগন বিদীর্ণ করে করতালি ধ্বনি পড়ল বক্তার সংকল্পের প্রতি সমর্থন জানিয়ে। তাকিয়ে দেখি মাইকের সামনে অনুমান পঁচিশ-ছাবিশ বছরের এক যুবক বক্তৃতা করছেন। তাঁর বক্তব্য এবং ভাবভঙ্গি সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে এক আশ্চর্য আত্মপ্রত্যয়ের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভিড় ঠেলে আরেকটু মঞ্চের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করলাম। সেখান থেকে বক্তার মুখের আদল অনেক স্পষ্টভাবে দেখা গেল। চোখে যেন তার আগুন জ্বলছে। আজই প্রভাতী সংবাদপত্রে বেরিয়েছে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম

প্রান্তেও। কাল লাহোরে ছাত্র মিছিলের ওপর গুলি চালিয়েছে আয়ুবের পুলিশ। রাওয়ালপিণ্ডিতে, পেশোয়ারে, লাহোরে ছাত্ররা দিয়েছে ধর্মঘটের ডাক। মিছিল বেরুবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সত্যি পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণগুলো এক ঐতিহাসিক ভূমিকা অবলম্বন করছে। শুধু ঢাকাতেই নয়, পশ্চিম প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণগুলোও যেন আজ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মানে যদি শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়, তবে সত্যিই আজ পাকিস্তানে তাই চলছে। তবে সে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ছকেবাঁধা শিক্ষা নয়, এ শিক্ষা নতুন অগ্নিমন্ত্রের শিক্ষা, সত্যিকারের স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবার শিক্ষা।

বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নামে ধোঁকাবাজি লোকে ধরে ফেলেছে। তাই সহস্র-কণ্ঠে দাবী উঠেছে চাই পূর্ণ গণতন্ত্র। চাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার তীরে গণতন্ত্রের জন্য অনেক আগেই যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল, আজ সুদূর পশ্চিমেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারি বুলেটের দম্ভকে তুচ্ছ করে শত-শত আত্মনিবেদিত যুবক-যুবতী সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। যেটা এতদিন মামুলী বিক্ষোভ কিম্বা হাঙ্গামার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এখন সেটাই সংগঠিত সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। পাকিস্তানী জনগণের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সূচনা। এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর।

মানুষ আজ ভয়মুক্ত। ভয়কে মানুষ জয় করেছে। তের-চৌদ্দ বছরের কচি কিশোর প্রকাশ্য রাস্তায় চিৎকার করে বলছে—এ অন্যায়, এ অবিচার চলতে পারে না—আমরা চলতে দেব না। যে মৌলভী সাহেবরা অনেকে শাসকদের সমালোচনায় আগে মুখ খুলতেন না। বরঞ্চ তাঁদের সবচেয়ে বড় সহায় ছিলেন, তাঁরাও আজ বলছেন 'খোদার ইচ্ছায় কখনও চিরকাল এমন চলতে পারে না।' পাকিস্তানের মানুষ অত্যাচারে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে আর

আমরা নীরব দর্শক হয়ে তা দেখব তা হতে দেবো না। ছাত্র-শিক্ষক, অধ্যাপক, শ্রমিক, কৃষক, কেরানী, কর্মচারী—সর্বস্তরের মানুষ আজ অন্ততঃ একটি প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ যে, এই একনায়কত্ব আর একদিনও চলতে দেওয়া উচিত নয়। এই অবস্থার অবসানের জন্য আজ পাকিস্তানের জনতা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। তারই লড়াই চলছে আজ দিকে-দিকে। গতবছর ফ্রান্সে যে উত্তাল গণ-আন্দোলনের জোয়ার সুরু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত দ্য'গলের পুনরার্বিভাবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কিন্তু আজকের পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চেহারা এবং চরিত্রের মধ্যে ফ্রান্সের উদ্দামশীলতার অনেক মিল থাকলেও ফ্রান্সের মত পাকিস্তানের সংগ্রামের ব্যর্থতার কোন সম্ভাবনা নেই। সেটা আজকের ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম কিংবা রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, পেশোয়ার বা করাচীর মানুষের সঙ্গে না মিশলে তাঁদের সঙ্গে কথা না বললে বোঝা যাবে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে দেখা যাবে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক। দোকান-পাট খোলা। মানুষ হাটবাজার অন্যান্য সব কাজই করছে। পাবলিক বাসে অসংখ্য মানুষের ভীড়। অফিস-যাত্রীরা ব্যস্ত-সমস্ত। এমনিতে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সকলেই একটা দৃঢ় সংকল্পের অদৃশ্য বন্ধনে মনের দিক থেকে ঐক্যসূত্রে বাঁধা। শুধু ছাত্র বা যুবক কেন, ঢাকায় পটুয়াটুলিতে শহরের অত্যন্ত পুরাতন এবং ঘিঞ্জি অঞ্চলের লোহার দোকানের ব্যাপারীরা পর্যন্ত গদিতে বসে রাজনীতি আলোচনা করছে। সবাই যথারীতি সবই করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারই মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে যেন এক মৌন সংকল্পে অখণ্ড আত্ম-প্রত্যয়ে, এক ভয়ঙ্কর অজ্ঞাত বিপদের অথচ বিজয়ের অভিমুখে যাত্রা করেছে পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ। কোন বিপদকেই এরা ভয় করে না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—কথাগুলো আজ পদ্মাপারের মানুষের ভিতরেই যে আক্ষরিক অর্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা বলতে কি ইংরেজ আমলেও যাঁরা লড়াইয়ের ময়দানে আসেননি—পাকিস্তানে আজ তাঁরাও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সামিল হয়েছেন।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অফিস আদালত রেস্তোঁরায় একই আলোচনা—এই মিলিটারী রাজের অভিশপ্ত দিন শেষ হয়ে কবে গণতন্ত্রের সূর্যোদয় হবে। ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন অনেক আগেই সুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের দিন থেকেই। কিন্তু আজ সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনার যেন এক অত্যাশ্চর্য জাগরণ সারা দেশের আপামর মানুষের মধ্যে চৈত্রের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছেন পূর্ব-বাংলার ছাত্র এবং যুব সমাজ। পূর্ব-পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্রদের জন্য আজ সেখানকার সকলেই গর্বিত। আয়ুবের মত জাঁদরেল ডিক্টেটরকে পর্যন্ত তাঁরা মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতন আন্দোলনের ঝাপটায় তারা ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছে আয়ুব ও তাঁর শাসকগোষ্ঠীকে। এই আন্দোলনের জের হিসাবেই প্রেসিডেন্ট আয়ুব মেনে নিতে বাধ্য হলেন সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করবে পাকিস্তান। অবশ্য এই ঘোষণার আগেই আয়ুব জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আসরে তিনি আর অবতীর্ণ হবেন না।

এই সংগ্রামের ফলে আয়ুবশাহীর দাঁত-নখ ভেঙ্গে গিয়েছে। একটি একটি করে গণদাবী মেনে নিয়ে ক্ষমতাদৃপ্ত আয়ুবশাহী পশ্চাদপসরণ করেছে। পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধি তুলে নিয়েছেন, রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন, সম্পূর্ণ সাজানো তথাকথিত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রহসন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য'গলের মত শক্ত মানুষ হবার উচ্চাশা হয়ত ছিল কিন্তু তিনি তার চেয়েও শক্তিশালী

পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে হেরে গেছেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নতি-স্বীকারের দরুণ এ গণ-আন্দোলন স্তব্ধ হয়নি। কারণ এ আন্দোলন শুধু ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে নয়, এ আন্দোলন একটি ঘৃণিত রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধারের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিষ্পেষিত হয়েছে, পূর্ব-পাকিস্তান একটি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, সাধারণ মেহনতি ও বুদ্ধিজীবি মানুষ অধিকারচ্যুত হয়েছে, কুড়িটি ভাগ্যবান পরিবার দেশের সমস্ত ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেছে এবং দুর্নীতির বিষ সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থান পাক-ভারত উপমহাদেশের গত কুড়ি বছরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে পারা যায়। অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য অপসারণ ইত্যাদি নানা দাবীতে পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এবার পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের উভয় অংশে মূলত ছাত্র-নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠল তার ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। এ আন্দোলনের ব্যাপকতা, বিস্তার ও দীর্ঘ-স্থায়িত্ব সারা বিশ্বের মানুষকে বিস্মিত করেছে। আন্দোলনের পুরোধায় যাঁরা আছেন অর্থাৎ ছাত্রসমাজ অসহনীয় নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, অকম্পিত চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু সংকল্প বা আদর্শচ্যুত হননি। এবারকার আন্দোলন পূর্ব-বঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে যেখানে অশীতিপর বৃদ্ধ গণনেতা মৌলানা ভাসানী এখনও চুম্বকের মতো জনসাধারণকে আকর্ষণ করেন। ইসরাইল অধিকৃত আরব অঞ্চলের রমণীদের মতো পাকিস্তানের নারীরাও আজ বিক্ষোভ-মিছিলে রাজপথে সমাগত হয়েছেন।

এ জয় হয়তো বা সাময়িক। আরও বৃহত্তর জয়ের জন্য পাকিস্তানের জনগণ প্রতীক্ষমান। কিন্তু তবু এ জয়ের পথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু রক্ত এবং অশ্রুর বিনিময়ে আজকের এ সীমাবদ্ধ জয়। অশ্রু ও রক্তের অক্ষরে লেখা পাকিস্তানীদের বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানীদের সেই বঞ্চনা মুখর কিন্তু সংগ্রামী দিনগুলির কয়েকটি অধ্যায়ের কাহিনীই শোনাব এখন।

ভারতের সব মুসলমান একটি ভিন্ন জাতি—কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন কোন সচেতন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষেও একথা কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে ভারত-বিভাগের মাত্র ছ-মাসের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ এমন এক আন্দোলনের সূত্রপাত করবে যার মর্মকথা হোল পূর্ব-বাংলার বাঙালী-জাতীয়তাবাদ। বস্তুতঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ কথা সবাই ধরেই নিয়েছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। দেশ-বিভাগ ভারতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এত বড় পরাজয় যে, এর পরে অন্ততঃ সুদীর্ঘকাল পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার রুদ্ধ হবে—এটাই ছিল সর্বমহলের বিশ্বাস। যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তদানীন্তন মুসলীম লীগ সরকার 'হিন্দুদের ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়ে তাকে দমন করতো। এভাবে অতীতের শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিকে নির্মূল করা হয়েছিল, গণতান্ত্রিক কর্মীদের ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের উপর চালানো হয়েছিল নির্মম অত্যাচার। কম্যুনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকেই পাকিস্তানে বে-আইনী। কম্যুনিস্টরা সবাই তখন জেলে অথবা আত্মগোপন করে আছেন। কম্যুনিস্ট সন্দেহেও নির্বিচারে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে—তাঁদের মধ্যে তের থেকে তিপ্পান্ন সব বয়সের মানুষই আছেন। যাঁরাই রাজনীতিতে সচেতন, আজাদী-অর্জনের উন্মত্ত আনন্দ থিতিয়ে আসার পর যাঁরা উদ্বেগের

সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে পাকিস্তানের নতুন সরকার গুটিকয়েক প্রভাবশালী পরিবারের স্বার্থক রক্ষায় যতটা করিতকর্মা—সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনে ততটা নন, তাঁরা যখনই সরকার-বিরোধী কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তাঁদের সবাইকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে জেলে বন্ধ করা হয়েছে।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণে প্রাণ দিয়েছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সাতজন বিশ্বস্তনেতা বা সাথী—কৃষক নেতা কম্পরাম সিং, তরুণ ছাত্র আনোয়ার হোসেন, শ্রমিক নেতা দেলওয়ার হোসেন, প্রখ্যাত দেশভক্ত সুধীন ধর, সুখেন ভট্টাচার্য, হানিফ শেখ ও বিজন সেন।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে বুলেটে যাঁদের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, পূর্ব-পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের রুটি-রুজির সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী। বন্দীদশায় তাঁরা নতি স্বীকার করতে রাজী হননি—বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঝাণ্ডাকে অবনমিত হতে দেননি। কারাপ্রাচীরের বাইরে কোটি-কোটি মানুষের ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও বাঁচার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে তাঁরা যেমন ছিলেন দৃঢ়, অচঞ্চল ও আপোষহীন—তেমনি কারাগারের অভ্যন্তরে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা রাজবন্দীদের মর্যাদা ও অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাইফেলের উদ্যত নল ও মর্যাদা-হীন ও অধিকারহীন অস্তিত্ব মেনে নিতে তাঁদের বাধ্য করতে পারেনি।

পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসনচক্রের উদ্দেশ্য ছিল, এই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড দ্বারা—প্রথমতঃ, কারাগারে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মনোবলকে ভেঙ্গে দেওয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব-পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানের জনসাধারণের সর্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

২৪শে এপ্রিলের আগে ও পরে পাকিস্তানের শাসকচক্র রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে যে কারা-নীতি অবলম্বন করেছিল, তাতে খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছিল যে ক্ষমতাসীন সরকার কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। স্বৈরাচারী বৃটিশ আমলেও রাজনৈতিক বন্দীরা কারাগারের চূড়ান্ত অব্যবস্থা নিপীড়নের মধ্যেও যে সব অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেগুলিকে পর্যন্ত নাকচ করে দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে শিক্ষা-প্রাপ্ত আমলারা স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দিতে চেষ্টা করেছিল। প্রাক্তন বৃটিশ প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসব বিবেকহীন আমলারা আজাদী-উত্তরকালে জমিদার ও মুৎসুদ্দীদের সঙ্গে একজোট হয়ে জনপ্রিয় নেতাদের নির্মমভাবে দমন করার পন্থা অবলম্বন করেছিল। এই কারণেই রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার ব্যাপারে বেসরকারী এবং বিচার-বিভাগীয় তদন্তের জন্য সারা দেশ যে দাবী জানিয়েছিল, তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে রাজশাহী জেলে সাতজন দেশপ্রেমিক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু রাজনৈতিক বন্দীদের নির্বিচারে হত্যা করার কাহিনীকেই সামনে আনেনি—২৪শে এপ্রিলের হত্যাকাণ্ড ছিল দেশের গণ-আন্দোলনের কর্মীদের উপর নির্যাতন চালানোর একটি নির্মম দৃষ্টান্তস্বরূপ।

২৪শে এপ্রিলের কথা মনে হলেই সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কারাগারের ভিতরে ও বাইরে মেহনতী মানুষের উপর শাসকচক্র যে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিল, তার ছবি। তাদের মনে পড়ে যায় সেইসব মানুষের কথা—যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, শহরে-গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম করতে গিয়ে। মনে পড়ে যায় তাঁদের কথা, যাঁরা গণতন্ত্র, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্য আন্দোলন

করতে গিয়ে স্বৈরাচারী এবং আত্মসর্বস্ব শাসকচক্রের হিংস্র ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় তাঁদের কথা, যাঁরা সন্ত্রাসের নীতিকে অগ্রাহ্য করে গণমুক্তির পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।

ভীরুতা, ক্লীবতা ও কাপুরুষতাকে জয় করে ২৪শে এপ্রিলের বীর শহীদরা দেশবাসীর সামনে এক মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের নির্মম দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই অন্ধকার দিনগুলিতে জনতার শক্তির উপর আস্থা রাখা সু-কঠিন ছিল বই কি!

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই এমন একটা 'অঘটন' ঘটে গেল যা বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত গণতান্ত্রিক কর্মীদের ঝাঁকানি দিল। সমগ্র পূর্ব-বাংলাকে তা অবাক করলো। পাকিস্তান-স্রষ্টা 'জাতির জনক' কায়েদে আজম ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ গভর্নর-জেনারেলের পতাকা উড়িয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সফরে ঢাকা পৌঁছালেন। সেদিন রাত্রে ঢাকা শহর বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল—জাতির পিতাকে জানানো হোল সাদর অভ্যর্থনা। সারা পূর্ব-বাংলা থেকে রেল, স্টীমার, নৌকা ও হাঁটাপথে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কায়েদে আজমকে শুধু মাত্র একবার চোখের-দেখা দেখে জীবনের সাধ পূরণের জন্য ঢাকায় জমায়েত হয়েছিল। অগণিত মানুষ—যেন জন সমুদ্র—এবং তারা মুহুর্মুহু মাত্র দুটি ধ্বনি উচ্চারণ করছিল 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। মহম্মদ আলি জিন্না তখন স্বভাবতই পাকিস্তানে জন-সাধারণের চোখে অবিসংবাদী নেতা। তাঁর যে কোন কথাই পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা—তিনি যা বলবেন বা করবেন তাই ধ্রুব-সত্য। অথচ ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে এসে কায়েদ-ই-আজম পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গে ছাত্রদের যখন বললেন: 'প্রিয় ছাত্রগণ—আমি তোমাদের জানাতে

চাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দু-ই হবে। এ ভাষার মারফত ইসলামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোন ভাষায় তা হয়নি—' সে সময় আকস্মিক কয়েকজন ছাত্র একযোগে প্রতিবাদ করে উঠলেন—'না-না-না'। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বরিশালের মেধাবী ছাত্র সর্দার ফজলুল করিম। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এ যেন এক চ্যালেঞ্জ। কায়েদ-ই-আজমের কথার কোন প্রতিবাদ হবে এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। অবমানিত কায়েদ-ই-আজম তাড়াতাড়ি ভাষণ শেষ করে সমাবর্তন মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন। সমাগত ছাত্ররা ধ্বনি তুললেন: 'উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' এই ঘটনা ঢাকা শহর তথা সারা পূর্ব-বাংলায় অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল আর ছাত্র-মহলে জাগাল অভূতপূর্ব উদ্দীপনা।

সেদিন এই ঐতিহাসিক সভায় যে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর-জেনারেল আয়ুব খান, পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন সাবএরিয়া কমাণ্ডার।

২৪শে মার্চের যে ঘটনায় সারা পাকিস্তানে বিদ্যুৎ খেলে গেল যার প্রভাব এ দেশের বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ওপর হয়েছিল সুদূর-প্রসারী—তার পটভূমিকা ও পরবর্তী কাহিনী এবার কিছু শোনাই।

সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ রাজনীতিতে সচেতন ছিলেন না, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেননি। তাঁরা সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ধর্মরক্ষার জন্য। স্বাধীনতা লাভের পর কিন্তু সাময়িকভাবে রাজনীতিতে তাঁদের সক্রিয়তা কমে গেল। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পর্ক প্রায় হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশের

সম্পর্ক। পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পূর্ণ চালিত হতে লাগল পশ্চিম-পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। অর্থনৈতিক উন্নতি যেটুকু ঘটল তার সবই পশ্চিমাঞ্চলের ভাগ্যে। আমদানি করা কাঁচা মালের শতকরা ৯০ ভাগ নিয়োজিত হোল পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য। পূর্বাঞ্চলে নতুন পাটকল একটাও তৈরী হোল না কিন্তু পশ্চিমে হোল নতুন ২১৩ টা।

পূর্ব-বঙ্গের শাসনব্যবস্থা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদ চলে এসেছিল পঞ্জাবী ও উর্দুভাষীদের কবলে। সংখ্যা-লঘুরা পূর্ব-বঙ্গ ত্যাগ করার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রায় সবটাই পূর্ণ করেছিল পশ্চিম-পাকিস্তানীরা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরেও দেখা গেল যে পূর্ব-বঙ্গের আমলাতন্ত্রের শতকরা প্রায় আশি জন অবাঙালী। চীফ সেক্রেটারী, অন্যান্য বিভাগীয় সচিব, জেলাশাসকরা, পুলিশের বড় কর্তারা প্রায় সকলেই পঞ্জাবী ও উর্দুভাষী। বাংলাদেশ বা বাঙালীদের জন্য তাঁদের বিন্দুমাত্র দরদ বা মমতা ছিল না।

পূর্ব-বঙ্গের জনসংখ্যা ছিল সারা পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের সর্বস্তরে নিযুক্ত বাঙালীর সংখ্যা ছিল ৪ শতাংশের কম। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে, ডাক তার, কাস্টমস ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বিভাগগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বাঙালী অফিসার একজনও ছিলেন না।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে ১০৫টি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে তার জন্য ৩৫'১৬ কোটি এবং ১৯৫০-৫১ সালে এই বাবদ ৪৬·৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই টাকার ৯০ ভাগ খরচ করা হয় পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে ৫২,০০০ টন লোহা আমদানী করা হয় কিন্তু তার সবটাই যায় পশ্চিম-পাকিস্তানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৫০ সালে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ৭০

লক্ষ টাকা, কিন্তু লাহোরের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বছর দেওয়া হয় প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ছয় গুণ বেশী।

১৯৫০ সালে করাচী রেডিও স্টেশনের জন্য ৩,৭৫,০০০ টাকা, লাহোরের জন্য ৩,৮৩,০০০ টাকা, পেশোয়ারের জন্য ২,৫৫,০০০ টাকা অর্থাৎ পশ্চিম-পাকিস্তানের তিনটি বেতার কেন্দ্রের জন্য মোট ব্যয় করা হয়েছিল ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা—কিন্তু এ বছর পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা রেডিও স্টেশনের জন্য খরচ করা হয় মাত্র ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। উপরন্তু ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অধিকাংশ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন অবাঙালী।

পূর্ব-বঙ্গ থেকে পাক সেনাবাহিনীতে ৫০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানী নিয়োগ করবার দাবী ওঠে—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবী স্বীকার করা দূরে থাকুক—একটি বাঙালী প্ল্যাটুন পর্যন্ত গঠন করতে দিতে রাজী হননি। ১৯৫০ সালে দেশরক্ষা বা Defence খাতে পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৮০ কোটি টাকা—এর মধ্যে ৭৮ কোটি টাকা পশ্চিম-পাকিস্তান-এর জন্য এবং মাত্র ২ কোটি টাকা আসে পূর্ব-পাকিস্তানে।

দেশের অর্থনীতিতে, শাসন ব্যবস্থায় এই চূড়ান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের পূর্বাঞ্চলীয় নেতারা সোচ্চার হয়ে ওঠা দূরে থাক, আপত্তি পর্যন্ত করলেন না। একমাত্র কংগ্রেসী নেতা কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচির কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে পরপর তিন দিন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবী নিয়ে আবেগময় ভাষণ দিলেন। সেখানে বাংলাভাষা হয়ে দাঁড়াল পূর্ব-বঙ্গের দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণের ব্যথা-বেদনা-বঞ্চনা-আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। যেন বাংলাভাষাকে স্বীকার করার অর্থ পূর্ব-বঙ্গের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবী, রাজনৈতিক দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া। দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানী যতটা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন

ততটা সুবিধা পূর্ব-বঙ্গকে, পূর্ব-বাংলার জনসাধারণকে দিতে হবে এ আকুলতাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল ধীরেনবাবুর বক্তৃতায়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষণের পর পাকিস্তানী নেতাদের ভয় হোল যে মুসলিম লীগ নীতি-বিরোধী বক্তৃতার ফলে হয়ত তিনি পূর্ব-বঙ্গে ফিরে গেলে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে নিগৃহীত হবেন, এমন কি নিহতও হতে পারেন। তাঁকে সশস্ত্র প্রহরীদের পাহারায় ঢাকা বিমানবন্দরে পাঠান হোল। বিমানপোত অবতরণ করল, প্রায় হাজারখানেক জনতা মিলিটারীকে অগ্রাহ্য করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর দিকে ছুটে গেল। কিন্তু দেখা গেল যে তাঁরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে হত্যা করতে আসেনি। তারা ধীরেনবাবুকে কাঁধে করে তুলে বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এসে শহর প্রদক্ষিণ করল, তাঁর জয়ধ্বনি দিল।

১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচীর কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে সর্বপ্রথম দাবী জানান যে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বললেন যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে বাংলা তার যোগ্য মর্যাদা পাবার দাবী নিশ্চয়ই জানাতে পারে।

উত্তরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানান যে, 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু এবং অন্য কোনো ভাষা নয়।'

পূর্ব-বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লীগনেতা খাজা নাজিমুদ্দিন জনাব লিয়াকতের আরেক ডিগ্রী ওপরে গিয়ে বললেন যে পূর্ব-বঙ্গের অধিকাংশ লোকই (অর্থাৎ বাঙালীরাও) উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চান— বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবার কোনো যৌক্তিকতাই তাঁরা দেখতে পান না।

খাজা নাজিমুদ্দিন, ১৯৪৮-এর ৪ঠা মার্চ কলকাতায় একটি বিবৃতিতে বললেন, 'I am sure nobody excepting a handful of persons in East Bengal demand that Bengali should be the official language of Pakistan.'

লিয়াকৎ-নাজিমুদ্দিনের উক্তি পূর্ব-বঙ্গে ধিক্কৃত হলো, কিন্তু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন বিপুলভাবে অভিনন্দিত। করাচীর লীগ-পাণ্ডারা ভেবেছিলেন যে 'হিন্দু' ধীরেন্দ্রবাবুর ঔদ্ধত্যের জন্য পূর্ব-বঙ্গ তাঁকে 'হিন্দুস্থানের দালাল' বলে উপহাস করবে।

পূর্ব-বঙ্গের সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্বেষ-মূলক ও বিমাতৃসুলভ মনোভাবে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা করবার দাবী জানিয়ে জনসভা, মিছিল অনুষ্ঠিত হলো, পথে পথে পোস্টার পড়ল।

মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন ছাড়াও পূর্ব-বঙ্গের জন-সাধারণ উর্দু'র দাপটে তাঁদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়াবে সে কথা ভেবেও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীর শেষে পাকিস্তান নৌ-বিভাগের কয়েকটি নিম্নপদে মধ্যমশিক্ষিত প্রার্থী আহ্বান করে যে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে, দরখাস্তকারীদের উর্দু অথবা ইংরাজীতে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হবে। বলা বাহুল্য কোনও মধ্যম শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে ইংরাজী বা উর্দুতে এ পরীক্ষা দিয়ে উর্দুভাষী প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না।

পূর্ব-বঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম সমিতি গড়ে উঠল। তাঁরা ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ ঢাকায় এক সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করলেন। বিক্ষোভকারী, শোভাযাত্রা ও পিকেটারদের ওপর পুলিশ বেদম লাঠি চালাল। অনেককে গ্রেপ্তার করল। পুলিশী হামলায় যাঁরা আহত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক শের-ই-বঙ্গাল—ফজলুল হক সাহেবও ছিলেন।

জনসাধারণের প্রবল আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন অংশত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তিনি ১৫ই মার্চ, ১৯৪৮—পূর্ব-বঙ্গ বিধানসভায় একটি সাতদফা পরিকল্পনা পেশ করে জানালেন যে বাংলাকে উর্দু'র সমান মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বিবৃতির সময়েও বিধানসভার বাইরে ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছিল যে ভাষা-আন্দোলনকে নেহাতই ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে খাজা নাজিমুদ্দিন কতকগুলি ছেঁদো কথা বলেছিলেন। মাত্র চার দিন পরেই, অর্থাৎ ১৯শে মার্চ, পাকিস্তানের জনক কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর প্রথম পূর্ব-বঙ্গ সফরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেবেন—সুতরাং তার আগে যেন-তেন-প্রকারেন ঢাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই হবে। তাই খাজা নাজিমুদ্দিনের এই চাতুরীপূর্ণ আপোষ প্রচেষ্টা।

পূর্ব-বঙ্গে কায়েদ-ই-আজমের সাদর আবাহন কি করে অনাদৃত বিসর্জনে পরিণত হোল সে কথা আগেই বলেছি।

১৯৪৮-এর ২৮শে মার্চ পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা কায়েদ-ই-আজম ঢাকা ত্যাগ করলেন, কিন্তু তুটি কথা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথমতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীরা আর পশ্চিমের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে রাজী নন, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে কোনো মূল্য দিয়ে তাঁদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করবেন।

এর পরের মাসেই অর্থাৎ এপ্রিলে (১৯৪৮) প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব হবিবুল্লা বাহার সাড়ম্বরে ঢাকায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করলেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে 'ডন' ও 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সমুচিত দণ্ডবিধানের দাবী জানালেন, কিন্তু এ দাবীর পক্ষে কোনো সমর্থক তাঁরা পেলেন না—পূর্ব-বঙ্গের জনসাধারণ, এমন কি কট্টর লীগপন্থীদের মধ্যেও নয়।

কিন্তু করাচীর অবাঙালী আমলাতন্ত্র পূর্ব-বঙ্গে উর্দু-প্রচার-অভিযান চালিয়ে পূর্ব-বাংলার ধর্মপ্রাণ সরল মুসলিম জনতার কাছে উর্দু ভাষাকে কোরাণের ভাষা বা 'লিসান্নুল কোরাণ' বলে তুলে

ধরল। দেশের মধ্যে যাঁরা শরীফ বলে নিজেদের মনে করতেন, তাঁরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে বললেন: 'বাংলা ইতরজনের ভাষা, উর্দু শরাফতির ভাষা'।

পূর্ব-পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ 'ওজারতির দুই বছর'-এ বলছেন:

'পূর্ব-পাকিস্তানে লোকে যাতে করে রাতারাতি উর্দু শিখতে পারে তার মহড়া চলতে লাগল পুরাদস্তুর।

রেডিও পাকিস্তান হররোজ পাঁচ মিনিট উর্দু সবক দিতে লাগল। পূর্ব-বাংলার মানুষকে উর্দু হজম না করায়ে ছাড়বে না।

উর্দু না শিখলে আর যাই হোক চাকরি মিলবে না।

এটাই হবে রাষ্ট্রভাষা বা রাজার ভাষা। যেমন ইংরাজী ছিল ইংরেজ আমলে। যারা রাজা তাদের ভাষাই তো রাষ্ট্রভাষা হবে।'

স্কুল-পাঠ্য বাংলা বই নতুন করে লেখা হতে লাগল উর্দু 'লব্‌জে'র গাঁথুনী দিয়ে—সৃষ্টি হলো এক বিচিত্র বাংলা ভাষার। একটি নমুনা 'নয়া-জামাত' নামে ষষ্ঠ-শ্রেণীর একটি পাঠ্য-পুস্তক থেকে উদ্‌ধৃত করা হলো:

'পাতা জাফরীতে নারজীল বুকে তবুবার শরবৎ; নারঙ্গী রঙ্গে রসিক মেহেলী মেওয়াব মহব্বৎ। সুম্বল কেশী প্রবাল শা'জাদী সাজিয়াছে জওহরী; জবল নূরের চূড়া হতে তার উঠিয়াছে তকরীর।'

'নতুন মাসিক' না বলে 'মাহ্-এ-নও' নাম দিয়ে সরকার একটি উর্দু-রঞ্জিত বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করলেন। উর্দু-বাংলা মিশ্রিত পত্রপত্রিকাগুলিকে পাক-সরকার সাহায্য দিতে লাগলেন দরাজ হাতে। মোল্লা-মৌলানাদের এক শ্রেণীও সরকারী আনুকূল্যে বাংলা ভাষা ইসলামীকরণের জিগির তুলে এই ভাষাকে হত্যা করবার পশ্চিমী চক্রান্তে সামিল হলেন।

আতাউর রহমান খাঁ সাহেব বলছেন:

অনেক অতি-উৎসুক ব্যক্তিরা কসরৎ চালাতে সুরু করল।

যদি নেহাত বাংলা নাই ছাড়তে পার—তবে একটু ইসলামী লেবাস পরায়ে দাও। হিন্দুয়ানীর বদ্‌-বুঁ কেটে যাবে।

কয়েকজন পণ্ডিতের মাথা খুলে গেল। আদাপানি খেয়ে নামল কসরৎ করতে। গবেষণাও চলল জোর। নতুন আবিষ্কার জগতকে যেন স্তম্ভিত করে দেবে।'

পাকিস্তানের তক্তাউসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা উর্দু সাম্রাজ্যের খোয়াবে কি পরিমাণ বিভোর হয়েছিলেন তার কিছুটা পরিচয় মিলবে পাক উজিরে-আজমে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানের সঙ্গে আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান খান সাহেবের এক সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে।

উর্দু-পাগল জনাব লিয়াকৎ জনাব আতাউরকে বললেন—'কি চেঁচামেচিই না করছেন আপনারা এই ভাষা নিয়ে? এতে আপনাদের গৌরবের কি আছে? বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, অথচ এই ভাষা নিয়ে মারামারি করে আপনারা পাকিস্তানের মূল আদর্শটাই ধ্বংস করে দিচ্ছেন।'

বিচলিত জনাব আতাউর—'আদর্শটা কি? পূর্ব-বাংলাকে লুট করাটাই কি আদর্শ নাকি?'

জনাব লিয়াকৎ কোনো জবাব দেবার আগেই জনাব আতাউর তীব্র শ্লেষের সঙ্গে আবার বললেন: 'শুধু বাংলা ভাষা কেন, আমরা বাঙালীরা তো হিন্দু রক্তের ধারক ও বাহক। বাংলার মুসলমান নিম্নস্তরের হিন্দু সমাজ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান সেজেছে, আমাদের দেহে সেই রক্ত এখনও বইছে, এসব কথা অনেক অবাঙালী নেতা অনেকবার বলেছেন। সেই জন্য আপনারা যাঁরা আরব-ইরাণ থেকে এসেছেন তাঁরা আমাদের ঘৃণার চোখে না হলেও করুণার চোখে দেখেন নিশ্চয়ই।'

জনাব লিয়াকৎ—'এ সব আপনি কি বলছেন?'

জনাব আতাউর—'আমি ঠিকই বলছি। তবে বাংলা ভাষা

কেবল হিন্দুর ভাষা—কথাটা শুধু মিথ্যা নয়, অন্যায়। সোনারগাঁয়ের আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ও তাঁর অনুগামী নসরত শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ থেকে সুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমান বাদশাহ নওয়াবরা অনেকেই বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেছেন।'

জনাব লিয়াকৎ—'বাজে কথা।'

জনাব আতাউর—'জী না, এইটাই ইতিহাস। মানেন কি না মানেন সেটা আলাদা কথা।'

জনাব লিয়াকৎ—'বুঝেছি আপনাদের মতলব, আপনারা স্বাধীন বাংলা করতে চান। আপনারা চান আলাদা হয়ে যেতে।'

জনাব আতাউর—'এটাও আপনাদের এক প্রকার অপপ্রচার।'

জনাব লিয়াকৎ (স্বগত ভাবে)—'আলাদা হবে? শখ তো ভাল। জানে না যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

জনাব আতাউর—'জী না, তা হবে কেন? বেশ টিকে আছি—টিকে থাকব এর চাইতে সুন্দরভাবে।'

জনাব লিয়াকৎ—'রেখে দিন, আপনার ও সব লাব্বাকি কথা। আমি এ সব শুনতে প্রস্তুত নই।'

পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা নিয়ে গণচেতনা আবার উদ্বেল হয়ে উঠল যখন ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। নাজিমুদ্দিন সাহেব তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা কমিটি আবার হয়ে উঠল সক্রিয়। তাঁদের উদ্যোগে আহূত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে স্থির হলো যে নাজিমুদ্দিন তথা মুসলিম লীগ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে সারা পূর্ব-বাংলায় ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট

পালন করা হবে। এই জন্য একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটিও গঠিত হলো।

২১শে ফেব্রুয়ারীর হরতালকে সফল করবার জন্য ছাত্ররা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার একটি প্রস্তুতি ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানাল। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত এক হরতাল পালন করেন এবং এক মাইল দীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা বের করে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই ষোল দিন ২১শে ফেব্রুয়ারীর ব্যাপক প্রস্তুতি চলল—পূর্ব-বাংলার সর্বত্র।

কিন্তু অন্য দিকে বাংলা ভাষার সংগ্রামকে দলিত করবার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও তাদের তল্পীবাহক আমলাতন্ত্র উন্মত্ত হয়ে উঠল।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেম্বলীর বাজেট অধিবেশনের দিন। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিলেন যে হরতাল হোক, কুছ পরোয়া নেই, ২১শে, যথানির্দিষ্ট বাজেট অধিবেশন চালাতেই হবে।' তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪৪ ধারা জারী করে ঢাকা জেলার সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলেন। সরকারের এই আদেশ ঢাকার সর্বস্তরের লোকের মধ্যে তীব্র ধিক্কারের সৃষ্টি করল, ছাত্র-ছাত্রীরা সলিমুল্লা হলে মিলিত হয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন—'সাধারণ ধর্মঘট চলবে—১৪৪ ধারা ভাঙ্গব।'

২১শে ফেব্রুয়ারী ভোর থেকেই ভাষা সংগ্রাম কমিটির স্বেচ্ছা-সেবকরা পথে পথে টহল দিতে লাগলেন। সেদিন ঢাকা শহরের ভাব থমথমে। দোকানপাট বাজার নামেমাত্র খুলেই ঝাঁপ বন্ধ করল। যানবাহনহীন শূন্য রাজপথ—স্কুল কলেজ সব বন্ধ—পদচারীর সংখ্যাও নামমাত্র।

বেলা দশটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন অগণিত ছাত্র-ছাত্রী। অ্যান্টিরায়ট ব্ল্যাক-মেরিয়া গাড়ী নিয়ে রাইফেলধারী

বিরাট এক পুলিশ বাহিনী অপেক্ষমান ছিল অদূরেই। বেলা বারটা নাগাদ দশজন ছাত্রের এক একটি দল আইন অমান্য করতে সুরু করল—ব্ল্যাক-মেরিয়া ছোঁ মেরে তাঁদের তুলে নিয়ে যেতে লাগল লালবাগের থানায়। দলের পর দল আসছে—যেন আর শেষ নেই। ধৈর্যচ্যুত হয়ে পুলিশ চালাল লাঠি, ছাড়ল কাঁদনে গ্যাস—সাময়িক ভাবে ছাত্র জমায়েত হলো ছত্রভঙ্গ।

কিন্তু, বেলা দুটোর সময় আবার সমবেত হলেন বিশাল এক ছাত্র দল। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল—চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন কাতারে কাতারে ছাত্ররা। এবারে আর ছোট ছোট দলে নয়—বন্যার বেগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের বেষ্টনী তাঁরা বিপর্যস্ত করে দিলেন। বেসামাল হয়ে পুলিশবাহিনী সুরু করল বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। গুলিবিদ্ধ উনিশটি দেহ লুটিয়ে পড়ল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করলেন আবদুল জব্বর ও রফিকুদ্দীন আহমেদ। আর রাত আটটা নাগাদ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ফেললেন আবদুল বরকৎ। সেদিন গুলি, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জে আহত প্রায় চারশত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল হাসপাতালে।

ঘটনাস্থলের অদূরেই অবস্থিত ছিল পূর্ব-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যখন রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল তখন অ্যাসেম্বলীতে চলছিল বাজেট সেশন। বিরোধী কংগ্রেস দলের শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন : ‘পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালিয়েছে। আমাদের ছেলেদের যখন রক্ত ঝরছে, কিছুতেই তখন আইন সভার অধিবেশন চলতে পারে না।’ মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মৌলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (বর্তমানে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা) দাবী জানালেন যে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবকে নিজে ঘটনাস্থলে

যেতে হবে। নুরুল আমীন নির্লজ্জের মত বললেন, 'আমরা আবেগে বিচলিত হবো না।' এর পরে কংগ্রেস সদস্যরা, তপশিলী সদস্যরা এবং আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ একযোগে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ-গৃহ ত্যাগ করলেন।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঘোষণা করলেন যে, পর দিন ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁরা সহপাঠীদের শবদেহ নিয়ে শোক-মিছিল বের করবেন।

পরদিন মৃতদেহগুলি জনসাধারণের হাতে দেওয়া না হলেও সকাল প্রায় এগারটার সময় হাজার হাজার মানুষ মৃত শহীদদের উদ্দেশ্যে জানাজার নমাজ পাঠ করলেন। নমাজের পর বেরুল বিশাল জনতার এক শোক-সন্তপ্ত মিছিল। সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা এ কাফিলায় সামিল হয়েছিলেন—ছাত্র, কেরানী, মিলকর্মী থেকে সুরু করে রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা পর্যন্ত। শোভাযাত্রাকারীরা গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের রক্তসিক্ত সার্টগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন পতাকারূপে। ঢাকা হাইকোর্টের কাছে পুলিশ আবার গুলি চালাল এই মিছিলের ওপর—লুটিয়ে পড়ল আরও কয়েকটি তরুণ তাজা প্রাণ। তবুও ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে এগিয়ে চলল সংগ্রামী জনতার তেজোদৃপ্ত মিছিল। এদিন সকলের বুকে শোভা পাচ্ছিল শোক-চিহ্নের প্রতীকরূপে কালো ব্যাজ। তাঁরা মুহুর্মুহু ধ্বনি তুলছিলেন—'পুলিশী জুলুম বন্ধ করো,' 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করো', 'ঢাকার গুলির প্রতিকার করো।'

পরের দিন সূর্যোদয়ের আগেই ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের সামনে দশ ফুট উঁচু এক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করলেন এবং শোভাযাত্রা করে এসে এই স্তম্ভে জানালেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। পুলিশ কিছুক্ষণ পরেই বিচূর্ণ করল এই শহীদ-মিনার।

ঢাকা শহরে পর পর কয়েকদিন চলল স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক হরতাল। কর্তৃপক্ষ শহরকে করলেন কার্ফ্যু-কবলিত।

পূর্ব-বঙ্গের সর্বত্র এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপক ধর্মঘট পালিত হলো প্রতিটি জেলায়। অসংখ্য ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলেন, পুলিশী জুলুমের বলি হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসী দলের মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীন্দ্রনাথ সেন, মুসলিম লীগের মৌলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, হামিদুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) প্রভৃতি।

মুসলিম লীগ পাণ্ডারা 'হিন্দু ভারত' ও 'হিন্দু কমিউনিস্টদের' দায়ী করে নানা বিবৃতি দিলেন। কেউ বললেন চারদিক থেকে কমিউনিস্টরা পূর্ব-বাংলাকে ঘিরে ফেলেছিল, কেউ বা বললেন, পশ্চিম-বাংলা থেকে হিন্দু যুবকেরা ঢাকায় এসে পায়জামা পরে ছাত্রদের দলে মিশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে ঢাকার চল্লিশ জন বিশিষ্ট আইনজীবী তখন একটি বিবৃতিতে বললেন, 'পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাদের ওপর একটি বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা কোনোক্রমেই মেনে নেবেন না।'

পূর্ব-বঙ্গের বুকে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এই অভাবনীয় গণ অভ্যুত্থান দেখে মুসলিম লীগ নেতা জনাব নুরুল আমীন প্রমাদ গণলেন। ঢাকায় গুলিবর্ষণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আইন সভার এক জরুরী বৈঠকে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্য করাচীর কাছে সুপারিশ করে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

পূর্ব-বঙ্গের ইতিহাসে এক অক্ষয় দিবস এই ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই দিনই সূচনা হলো পূর্ব-বাংলার গণজীবনে এক নতুন ও যুগান্তকারী অধ্যায়ের।

মনে হোল সমস্ত আকাশটাই ছেয়ে গেছে
লালে লাল। তারপর মনে হলো
চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে

গাছগুলোর মাথায়! চোখ দুটো ব্যাথা করে উঠলো।
দিগ্‌প্রান্তের শ্যামলীমায় দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিলাম।
ভাবলাম স্বস্তির নিশ্বাস
ফেলবো। কিন্তু এ কি! এত রক্ত! রক্তে রাঙ্গিয়ে
দিয়েছে সব প্রান্তর! ইতিহাস
লিখেছে বুকের রক্ত দিয়ে! আমি চিৎকার
করে উঠলাম, 'পলাশ! পলাশ! ব্যর্থ হলো
তোমার রক্ত রং। এর চেয়েও আমার
ভাইদের রক্ত লাল! বুকের রক্তে যারা পথ রাঙ্গিয়ে দিলো'
আজকের দিন প্রমাণ দিয়েছে আমরা লড়তে পারি
আজকে মোদের শপথের দিন : ২১শে ফেব্রুয়ারী।'

—অমর একুশ।

এই শহীদ দিবসের ঘটনাই বঞ্চিত পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উৎস ঘটনা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীই হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ ও জন্মদাতা।

আজকের দিনের অনিবার্য স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনেরই ক্রমবিকাশ। সুতরাং সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের 'এক বিরাট ইতিহাস নিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে এই ২১শে ফেব্রুয়ারী। তাই 'খুনে রাঙা' এই মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী আজ পূর্ব-বঙ্গের বাঙ্গালীদের কাছে 'অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী'। তারা আজ কামনা করে এই মহান রক্তরাঙা দিবসের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক কৃত্রিম কুয়াশায় আবৃত সমস্ত বাঙালী অন্তর।

মহৎ আদর্শের জন্য ছাত্র-তরুণদের আত্মোৎসর্গের উদাহরণ অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল নয়, কিন্তু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে

পূর্ব-বাংলার নওজোয়ানদের প্রাণদানের উদাহরণ অনন্য। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দানের এমন দুর্লভ নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলে জানা নেই। মনে পড়ছে মিশরের কথা। আরবরা যখন মিশর অধিকার করে তখন মিশরবাসী কপটিক ভাষায় কথা বলত। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর প্রচণ্ড তাড়নায় কপটিক ভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, আরবীই তার আসন গ্রহণ করে। আজ কপটিক মৃত—তার রূপ নির্ণয় ভাষাতত্ত্বের-গবেষণা সাপেক্ষ আর মিশরবাসী অকাতরে আরবী বলে চলেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য দেশের শাসকগোষ্ঠী হয়ত এই ভাগ্যই নির্ধারণ করে রেখেছিল শহীদরা প্রাণের বিনিময়ে যা প্রতিরোধ করেছে।

আদর্শের জন্য, কল্যাণের জন্য, সত্যের জন্য আত্মবিসর্জনের পথেই মানুষের ইতিহাস গৌরবে ভাস্বর হয়ে ওঠে। পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসকে মহৎ করে তোলার পথে ২১শে ফেব্রুয়ারী তাই এক অতুলনীয়, অবিস্মরণীয় দিন। শোকোচ্ছ্বাসের কাতরতায় নয়, বরং গণতান্ত্রিক স্বাধিকার অর্জনের আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের অপরাজেয় সঙ্কল্পের ভিতর দিয়েই এই পরম লগ্নটি বছর বছর ঘুরে আসে।

২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-বঙ্গের জাতীয় জীবনে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বীরের রক্ত আর মায়ের অশ্রু, দেশবাসীর ভালবাসা আর চৈতন্য, সংগ্রামশীলতা আর কণ্ঠস্বীকার এদিনকে গড়ে তুলেছে। বিনিময়ে এ দিনের কাছ থেকে তারা পেয়েছে ভবিষ্যতে চলার পথের ইঙ্গিত।

পাক-ভারত মৈত্রী প্রচেষ্টার নিরলস কর্মী মহান বিপ্লবী শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত 'একুশে ফেব্রুয়ারী ও আমাদের প্রগতি'-শীর্ষক একটি অনবদ্য প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

'অত্যন্ত সংক্ষেপে বললেও একথা বলতে হয় যে, পূর্ব-বাংলায় জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য যে সংগ্রাম আজও

অব্যাহত রয়েছে তার উৎস ও প্রেরণা ১৯৫২-র স্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী ও এই দিনের ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক ঝগড়া নয়, রাজনৈতিক সংগ্রাম। পূর্ব-বাংলার মানুষের জাতীয়তার ভিত্তি কি, পূর্ব-পাকিস্তানে মানুষের অধিকার রক্ষা পাবে কি পাবে না, এই সব মূল প্রশ্নই ভাষা-আন্দোলনের ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়, মানুষের জাতীয় সত্তা ও সাম্প্রদায়িক পরিচয় এক নয়, বাংলা দেশের মানুষ শুধু মুসলিম ও হিন্দু হিসেবে বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, তারা বাঙালী হিসেবে একই জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয়তায় যে সাম্প্রদায়িক অপব্যাখ্যা দেশবিভাগের আগে-পরে প্রবলভাবে চালু হয়েছিল, ভাষা আন্দোলন তার প্রভাব খর্ব করে, তার সম্প্রসারণ রোধ করে। একই জন্মভূমি ও ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলায় গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশ ঘটে এবং মানবিক অধিকারের সংগ্রাম বহুক্ষণ শক্তিশালী হয়। সাম্প্রদায়িকতা বজায় থাকলে বাংলা দেশে পূর্বে বা পশ্চিমে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন অসম্ভব, ছাত্র বা যুব আন্দোলনও সম্ভব নয়। ভাষা আন্দোলনের সাফল্য ও শক্তি সাম্প্রদায়িকতাকে ভেতর থেকে দমন করার ফলে, তাই অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছিল। এই কারণেই ভাষা আন্দোলনে যাঁরা অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তাঁদেরই পুরোভাগে দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলীম লীগের চরম পরাজয় সম্ভব করেছিল এই গণতান্ত্রিক শক্তি এবং তার ফলে সারা পাকিস্তানেই রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়েছিল। এই কারণেই আমরা উল্লেখ করছি যে ২১শে ফেব্রুয়ারী পাক-ভারত রাজনীতিতেও একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।'

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডাঃ আনিসুজ্জামান 'একুশে ফেব্রুয়ারী ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা'-শীর্ষক একটি অনবদ্য রচনায়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য উজাড় করে সম্প্রতি লিখেছেন : 'একুশে ফেব্রুয়ারীর আবেগ ও ঐক্য থেকে পরবর্তীকালে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ যেমন সম্ভবপর হয়েছিল, সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও অনুরূপ আলোড়ন ঘটেছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর আত্মত্যাগ সারা দেশে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক চেতনার সঞ্চার করেছে।

…কোন্ ভাষার মৃত্যু হয় কখন? যখন সে ভাষার সঙ্গে বৃহৎ জনপ্রবাহের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। সেদিক থেকে আজ একথা মনে করে আশ্বস্ত হবার কারণ আছে যে, জনসাধারণ যে গভীর আবেগ ও ভালবাসার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছে তাতে এ ভাষার মৃত্যু নেই। আজ শুধু বার বার একথাই মনে হচ্ছে যে মৃত্যু নেই আমার বাংলা ভাষার, মৃত্যু নেই এর বড় বড় সাধকের আর তেমনি মৃত্যু নেই তাদের যারা আপন দেহকে বর্ম করে এ ভাষার প্রতি আঘাত নিবারণ করে শহীদ হয়েছেন।

এই ভাষায় কথা বলে আমরা ধন্য, এই জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ধন্য, এই ভাষার জন্য একত্রিতভাবে শপথ নিয়ে ধন্য, আর ধন্য আজ সেই মহান শহীদদের উদ্দেশ্যে নিজেদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারছি বলে।'

'একুশে তারিখ : আমাদের প্রাণে তাই
অগ্নিশপথ তুমিই দিয়েছ এঁকে
সে শপথে জ্বলে হৃদয়ের রোশনাই—
জীবন-পত্রে রক্ত আঁখর লেখে'।

(ফেরারী দিন : সুব্রত বড়ুয়া, ঢাকা)

করাচীর শাসন মঞ্চেও এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। জাতির জনক কায়েদ-ই-আজম মোহম্মদ আলি জিন্না ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন।

কায়েদ-ই-আজমের মৃত্যুর পর পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (একদা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী) খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হলেন—কিন্তু দেশের সর্বেসর্বা থেকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান। কায়েদ-ই-আজমের লোকান্তরের পর পাকিস্তানের জটিল রাজনীতির যবনিকার আড়ালে ক্ষমতার লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। ফলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ১৯৫১ সালের অক্টোবরে এক গভীর চক্রান্তের বলি হয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ যুগের ঝানু এক সিভিলিয়ন পঞ্জাব-তনয় গোলাম মহম্মদ পঞ্জাবী-গোষ্টির সমর্থনে গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হলেন এবং খাজা নাজিমুদ্দিনকে নামিয়ে দেওয়া গেল প্রধানমন্ত্রীর পদে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর গদিতে নাজিমুদ্দিন বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেননি। গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে বিভাগ-পূর্ব-বঙ্গের সুরাবর্দী মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য বগুড়ার মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসালেন। বগুড়ার মহম্মদ আলি কার্যত পরিণত হলেন গভর্নর জেনারেলের এক ক্রীড়নকে। পাক.শাসনযন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন গোলাম মহম্মদ।

দেশের শাসক গোষ্ঠির পরিবর্তনের এই পটভূমিকায় পাক-শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গঠিত হোল 'বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটি' বা সংক্ষেপে বি-পি-সি। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গ চরম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই রিপোর্টের মূলনীতিতে বলা হয়েছিল যে পাকিস্তানের গণতন্ত্র পরিচালিত হবে দুটি পরিষদের সমন্বয়ে। নিম্নপরিষদ গঠিত হবে পূর্বে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কিন্তু উর্ধ্ব পরিষদ গঠিত হবে প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। বাজেট, অর্থবিল, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুই পরিষদের যুক্ত বৈঠকে পাস করাতে হবে। পূর্ব-বঙ্গের মানুষের পক্ষে এই

রিপোর্টের অর্থ দাঁড়াল এই যে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকচক্র পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে ভীত এবং পূর্ব-বাংলাকে বেলুচিস্থানের সম-পর্যায়ে ফেলে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করতে বদ্ধপরিকর। প্রতিটি নাগরিকের সম-অধিকারের ভিত্তিতে পাক-শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তানে একটি সর্বাত্মক হরতাল পালিত হোল।

পূর্ব-বঙ্গের প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে প্রথম বি-পি-সি রিপোর্টটি বাতিল করে একটি দ্বিতীয় বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটি গঠন করা হোল। এই দ্বিতীয় কমিটির রিপোর্টে স্থির হোল যে পাকিস্তানে দুই কক্ষ-যুক্ত পার্লামেন্ট গঠিত হবে। উর্ধ্ব কক্ষের আসন সংখ্যা হবে ১২০ এবং নিম্নকক্ষের ৪০০ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আসন সংখ্যা বণ্টন করা হবে সমান হারে। অর্থাৎ দ্বিতীয় রিপোর্টেও পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যাধিক্য খর্ব করে পূর্ব-পাকিস্তানের আসন সংখ্যা পশ্চিম-পাকিস্তানের আসনের সমান করে দেওয়ার ব্যবস্থা হোল। বস্তুত সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-বাংলাকে ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে তখন করাচীর নেতৃত্ব ছিল বদ্ধপরিকর এবং এই নেতৃত্ব তখন সম্পূর্ণ পঞ্জাবী গোষ্ঠির করায়ত্ত।

পূর্ব-বাংলা সম্পর্কে পশ্চিম-পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে সাধারণ বাঙালীর বিক্ষোভ এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে পাক-গণ-পরিষদে বাঙালী সদস্যরা অভিযোগ তুললেন 'পূর্ব-বাংলাকে আজ পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্ত করা হয়েছে'।

বিভিন্ন সরকারী কমিটিতে পঞ্জাবী ও বাঙালী সদস্যদের মধ্যে সংঘাত এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি (বগুড়া) প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন যে বি-পি-সি রিপোর্ট প্রকৃতপক্ষে বাঙালী-পঞ্জাবী সংঘর্ষের একটি রণক্ষেত্র মাত্র—'Really a Bengali-Punjabi fight.'

দুটি বি-পি-সি রিপোর্টের মাধ্যমে প্রতিটি বাঙালীর কাছে সুস্পষ্ট

হয়ে ওঠে যে পূর্ব-বঙ্গকে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করবার গভীর এক চক্রান্ত সুরু হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ। একে ঐ আন্দোলনেরই পরিণতি বলা চলে। মাত্র সাত বছর আগে যে মুসলিম লীগের জনপ্রভাব ও ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা যাদের গর্ব ও ঐতিহ্য, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সেই মুসলিম লীগ একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। তিনশোর চেয়েও বেশী আসনের মধ্যে তারা মাত্র ন'টি আসন পেল।

মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে এমন নির্বাচনী প্রচারের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে শুধু ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সর্বশ্রেণীর জনতাই এই প্রচারে অংশ গ্রহণ করেনি, সরকারী কেরানী, পদস্থ বাঙালী কর্মচারী এবং চাপরাসীরা পর্যন্ত যুক্তফ্রণ্টের প্রচারে পথে বেরিয়ে পড়েন। সে এক অসাধারণ জনজাগরণ, এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় পাক-প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলির পক্ষে ভাষণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং সভা ভেঙ্গে যায়। নির্বিচারে পুলিশের লাঠি চলতে থাকে। নির্বাচনের আগে প্রায় ১৪০০০ যুক্তফ্রণ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেব তাঁর নিজের কেন্দ্রে একটি পঁচিশ বছরের যুবকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং বহু মুসলিম লীগ নেতার জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ব-বঙ্গের জাতীয় জীবনে হয়ে উঠল এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

যুক্তফ্রণ্টের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের পিছনে ছিল তাদের একুশ দফা প্রোগ্রাম যার মর্ম কথা হোল বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার সহ পূর্ব-বাংলার বাঙালীদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার।

একুশ দফা দাবীর মধ্যে একটি ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ করা এবং যে বর্ধমান হাউস থেকে বাংলাভাষা-আন্দোলনকারীদের উপর নুরুল আমিন গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই বাড়িটিকে 'বাংলা অ্যাকাডেমীতে' পরিণত করা। একুশ দফাতে আরও দাবী জানান হয়েছিল যে সশস্ত্রবাহিনী, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র ছাড়া আর সব বিষয় পূর্ব-বাংলা সরকারের হাতে থাকবে।

এছাড়া পাক-গঠনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে দাবী করা হয় যে পূর্ব-বাংলাকে পূর্ণ ও অখণ্ড অটোনমী দিতে হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে অধিকার থাকবে পূর্ব-বঙ্গের। দেশ রক্ষার বিষয়েও পূর্ব-বঙ্গে আঞ্চলিক বাহিনী গঠন, এই প্রদেশে অর্ডিনাস কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব-বঙ্গে নৌবাহিনীর হেড কোয়ারটার স্থাপনের দাবী জানান হয় নির্বাচনী ইস্তাহারে। যুক্তফ্রণ্টের প্রচারের মূল ভিত্তি ছিল : 'পূর্ব-বঙ্গকে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি কলোনিতে পরিণত করা চলবে না'।

মুসলিম লীগের সমূল উৎপাটনের পর মৌলভী ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি, মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হাসান শহীদ সোহরাবর্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং আসরাফউদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে নিজাম-ই ইসলাম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা বর্ষীয়ান মৌলভী ফজলুল হক সাহেব দলপতি হিসেবে পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন এবং তেসরা এপ্রিল (১৯৫৪) তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় বিরাশি বছর। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার প্রায় এগার বছর পরে তিনি পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এসে বিভক্ত পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। সমগ্র পূর্ব-বঙ্গবাসীদের

সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষও এ ঘটনাকে স্বাগত ও আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন, কারণ বাঙালীমাত্রের অন্তরেই—হিন্দু-মুসলমান, পশ্চিম বা পূর্ব-বঙ্গবাসী নির্বিশেষে—হক সাহেবের জন্য একটি বিশেষ স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন পাতা ছিল।

৩০শে এপ্রিল শুক্রবার—অর্থাৎ ঢাকায় ফজলুল হক সাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সাতাশ দিন পরে—কলকাতার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি একটি সু-খবর পরিবেশন করল যে সেদিন অপরাহ্নে পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছাবেন। সংবাদে আরও জানা গেল যে তাঁর পায়ে গুরুতর এক ধরনের ব্যথায় হক সাহেব বেশ কিছুদিন ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হাঁটা-চলা করতে তাঁর খুব কষ্ট তো হয়ই, এমনকি, অনেক সময়ই তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়। তিনি তাঁর পায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসছেন। তাঁর আ-যৌবন বন্ধু ও সহযোগী পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে হক সাহেব তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো করাবেনই, এমনকি প্রয়োজনবোধে একজন সার্জেনের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করবেন। তাঁর পায়ের যন্ত্রণার বিষয়ে হক সাহেব পরে কলকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে খাজা নাজিমুদ্দিনের শাসনকালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন শোভাযাত্রীদের ওপর বহুবার পুলিশ নির্দয়ভাবে লাঠি চালনা করে। এ ধরনের একটি শোভাযাত্রায় হক সাহেব নিজেও ছিলেন এবং তিনি পায়ে গুরুতর লাঠির আঘাত পান। হক সাহেব বলেন যে তাঁর পায়ের যন্ত্রণা এই আঘাতজনিতই।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৪, শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের একটি বিমানে মৌলভী ফজলুল হক সাহেব সদলবলে দমদমে উপনীত হলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী ও দশ বছর বয়স্ক

পুত্রও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাংলার প্রিয় নেতা ফজলুল হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কলকাতায় একটি 'হক সম্বর্ধনা সমিতি' গঠিত হয়েছিল, এ সমিতির কার্যালয় ছিল ৭ নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে।

বিমান বন্দরে হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক বিপুল জনতা। তাঁরা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে হক সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে যান। অনেকে তাঁর পাদস্পর্শ করে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় হক সাহেবকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তিনি সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর পূর্ব-পরিচিত অনেককে চিনতে পারলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে দীর্ঘদিন কারাভোগ করবার পর মুক্ত শ্রীধীরেন ভৌমিক হক সাহেবকে মাল্যদান করতে গেলে তিনি তাঁকে চিনতে পারেন। হক সাহেবের পায়ের যন্ত্রণার দরুণ পাক ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব নসরুল্লার গাড়ি বিমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং জনাব হক গাড়ি করে বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জ পর্যন্ত আসেন। সেখানে তাঁকে অনেকে মাল্যভূষিত করেন এবং সমবেত সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। হক সাহেব একটি চেয়ারে বসে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁর কলকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের জবাবে জনাব হক বললেন যে তাঁর পায়ের চিকিৎসা করানই তাঁর কলকাতা ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। 'এখানে আমার পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি। এই কলকাতা শহরে ৬০ বছরেরও বেশী আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলি কাটিয়েছি। সে-সব দিনগুলির কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। সে-সব পুরানো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হলে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি। ভবিষ্যতেও আবার আসব।'

সমবেত সাংবাদিকদের কাছে একটি বিবৃতিও দিলেন হক সাহেব। বিবৃতিতে তিনি বললেন :

'আপনাদের সকলের সহৃদয় ব্যবহারে আমি এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছি যে কথা বলবার এবং মনের ভাব যথাযথ প্রকাশ করবার ক্ষমতা এখন আমার নেই। আল্লার কৃপায় আমি সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। তবে আমি এ কথা দিচ্ছি যে আমি যা-ই লাভ করে থাকি না কেন, তা আপনাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে গ্রহণ করব। যথার্থ অংশ আপনাদের দিতে কখনই কার্পণ্য করব না। দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়েও উপযুক্ত সময় আমি সব বলব। সে এক বিরাট্ কাহিনী। আমি আমার বন্ধু ডাঃ রায়ের সঙ্গেও উভয় বঙ্গের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।'

জনাব হক আরও জানান যে সম্ভবতঃ ৫ই মে বুধবার তিনি ঢাকায় ফিরবেন।

এর পরে খাজা নসরুল্লা ও পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আজিজুল হকের সঙ্গে ফজলুল হক সাহেব পার্ক সার্কাসে তাঁর কড়েয়া রোডের বাসভবনে চলে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কড়েয়া রোডের এ বাড়িটি বহুদিন হলো হস্তান্তরিত হয়েছে।

সেদিনই রাত্রে হক সাহেব আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের সময় কথাপ্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করলেন যে সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করলে অদূর ভবিষ্যতে উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের পথ বর্তমানের তুলনায় অনেক সুগম হবে।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে জনাব হক রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাঃ রায় এগিয়ে এসে দোতলার সিঁড়ির মুখে হক সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন, এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বহু সরকারী কর্মচারী তাঁদের প্রাক্তন প্রভুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। ডাঃ রায় অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হক সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন এবং

যথোপযুক্ত পরামর্শ দিলেন। ঠিক হলো যে আর. জি. কর মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে জনাব হকের রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করান হবে। হক সাহেবের চিকিৎসক বিশিষ্ট সার্জেন রায়বাহাদুর ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উভয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দুই বাংলার নানা সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হলো অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে। মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করলেন :

১। দুই বঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথা বিলোপের প্রসঙ্গ।

২। উভয় বঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৩। উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা ও যাত্রীদের কষ্ট লাঘবের জন্য থ্রু টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা।

৪। সীমান্ত ব্যবসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলির শিথিলকরণ।

৫। পূর্ব-বঙ্গের যে সব বাস্তুহারা সে সময় ভারতে ছিলেন তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যাতে আস্থা সঞ্চারিত হতে পারে, সেজন্য ঐ রাজ্যে যেসব পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাতমূলক গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে, আলোচনার সময় ডাঃ রায় হক সাহেবের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করলেন। জনাব হক ডাঃ রায়কে জানালেন যে তিনি কার্যভার গ্রহণ করবার পর ইতিমধ্যেই এ ধরনের বই বাজেয়াপ্ত করেছেন।

হক সাহেব ডাঃ রায়কে জানান যে ঢাকার বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি বাংলা একাডেমী গঠন করা হয়েছে। হক সাহেব আরও বললেন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য উভয় বঙ্গের মধ্যে বাঙালী পণ্ডিত, অধ্যাপক ও সাহিত্য-সেবীদের বিনিময় করতেও তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষ হবার পর জনাব হক রাইটার্স বিল্ডিংস-এর রোটাণ্ডাতে সমবেত সাংবাদিকদের বললেন যে : 'দুই বাংলার মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতা আমি বুঝি না। দুই দেশের মধ্যে এই ব্যবধান কৃত্রিম। দুই বঙ্গের মধ্যে অবাধ যোগাযোগের সব বাধা-নিষেধ অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং আমি আমার এ প্রচেষ্টায় আমার বন্ধু বিধানবাবুর সহযোগিতা কামনা করি।'

পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে হক সাহেব বললেন যে তিনি তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি অবিলম্বে বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে দুজনকে তাঁর মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করবেন ও পরে আরও দুজন হিন্দুকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করবার পরিকল্পনা তাঁর আছে।

জনাব হক আরও বললেন যে তিনি সারা জীবন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ও কৃষককুলের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাদের দু-মুঠো অন্ন ও বস্ত্র যোগানই হলো তাঁর জীবনের ব্রত।

হক সাহেব যখন রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বিদায় নিলেন, ডাঃ রায় নীচে এসে গাড়ি পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনকেই অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। হক সাহেব গাড়িতে ওঠবার আগে ডাঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, 'ঢাকায় যাওনের আগে আপনার লগে আবার দেখা হইব।' ডাঃ রায় সহাস্যে জবাব দিলেন : 'নিশ্চয়ই।'

অশীতিপর নেতা শনিবার দিনটি অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত করেন। বহু পুরানো বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিত ব্যক্তি কড়েয়া রোডে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে আসেন। দুটি সম্বর্ধনা

সভায়ও তিনি যোগ দেন, তার মধ্যে একটি ময়দানে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তাঁবুতে।

রবিবারও কলিকাতায় ফজলুল হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভাতেই তিনি উভয় বঙ্গের মধ্যে ভিসা প্রত্যাহার, সীমান্তের উভয় দিকের বাস্তু-হারাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সুদৃঢ় করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় গঠিত শান্তিসেনা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মিডলটন রোডে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল।

এই সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে এক আবেগময় ভাষণে জনাব হক বললেন যে, 'জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তাঁর আর কোনো আশা বা আকাঙ্ক্ষা নেই—উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হয়েছে তা অপসারিত করবার কাজ যদি তিনি আরম্ভ করে যেতে পারেন, তাহলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। বৃদ্ধ ফজলুল হক ভাবাকুল কণ্ঠে বলে চললেন: 'দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতাল্লার দরবারে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করতে পারেন। আমার এই আকাঙ্ক্ষা যাতে পূরণ হয় সেজন্য আপনারা আমাকে দোয়া করুন।' জনাব হক আরও বললেন যে, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে সংগঠিত শান্তিসেনার বাণী পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এও তাঁর কামনা।

সেদিনই অর্থাৎ রবিবার খিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমানদের একটি মিলিত সম্বর্ধনা সভায় জনাব হক আবার বললেন যে,—'বাঙালীরা পূর্বে বা পশ্চিমে যে-যেখানেই থাকুক না কেন তাঁরা অখণ্ড এবং তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে। জনাব হক

আরও বললেন : 'বাংলা দেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু-ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গে কোনো ফারাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু'ভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন পারবেন না।' হক সাহেব বললেন যে, 'জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি যেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সম্ভাব প্রতিষ্ঠার ব্রতে অতিবাহিত করতে পারেন এই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি এই আবেদন জানালেন যে, তাঁরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে প্রকৃত ভাই-ভাইয়ের মত মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করেন।'

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মৃণালকান্তি বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-প্রতিনিধিদের একটি সভায় জনাব হক জানালেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে যে সব পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ দিয়ে সুমধুর বাংলা ভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে সেগুলি বাতিল করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি ইতিমধ্যেই অবলম্বন করেছেন।

পরদিন সোমবার ৩রা মে সকালে কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে জনাব হকের ভাষণ প্রথম পৃষ্ঠায় সবিস্তারে প্রকাশিত হলো।

'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা শিরোনামা দিলেন : 'Huq Hopes to End Artificial Barrier.'

'আনন্দবাজার পত্রিকা' শিরোনামা দিলেন : 'উভয় বঙ্গের মধ্যে মিথ্যার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলার সংকল্প, সম্বর্ধনা সভায় মিঃ হকের ভাষণ।'

'যুগান্তর' পত্রিকা 'হক-যোগ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব ফজলুল হকের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে লিখলেন :

'রাজনৈতিক জীবনের বহু বৈচিত্র্য, বহু বাধা-বিপত্তি অতিবাহিত করিয়া অবিভক্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক সাহেব

আবার দীর্ঘকাল পরে পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। উভয় বঙ্গে হক সাহেবের অনুরাগী ও গুণগ্রাহীর অভাব নাই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক আকর্ষণই জনসাধারণকে চিরকাল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। এখনও সে অবস্থার বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় নাই,—পূর্ব-বঙ্গের বিগত সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার বিপুল জয় ও পশ্চিম-বঙ্গে আগমন উপলক্ষে তাঁহার বিরাট সম্বর্ধনাই উহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই উপলক্ষে পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরাও আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। ভারত বিভাগের পর পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব-বঙ্গের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হওয়ায় তৎসম্পর্কে সকলের মনেই নূতন আশা জাগিয়াছে।

…হক সাহেব উভয় বঙ্গের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক করিয়া তুলুন, দুই ভাগের অধিবাসীদের মধ্যে যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহার অবসান করুন, আমাদের শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।'

৩রা মে, এলগিন রোডে নেতাজী ভবনের সভায় যোগ দিতে এসে জনাব হকের মনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের স্মৃতি এবং অতীতের নানা ঘটনার কথা জেগে উঠল। তিনি স্মৃতিচারণ করে বললেন যে, 'এই ভবনে অতীতে তিনি কত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভারতের এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ কর্মের প্রেরণা লাভ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার দানবের ঊর্ধ্বে ওঠবার মত শক্তি তিনি তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অর্জন করেছেন। তিনি সুভাষবাবু ও শরৎবাবু এই মহান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে এই সত্যই শিক্ষা করেছিলেন যে জাতি হিসেবে বাঙালী দল এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে।' আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ফজলুল হক সাহেব বলতে থাকেন যে, 'একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান'—এই দুটি

বিভেদার্থক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এই সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে তারা দেশের দুষমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না,—এই শব্দটি বিভ্রান্তি সূচনা করবার ও স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থামাত্র।'

জনাব হক আরও বললেন যে, এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের এ ধরনের চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছে যে, তারা যেন আসমান থেকে কিছু পেয়ে গিয়েছে এবং প্রতিবেশীদের জন্য তাদের কিছুই করবার নেই, 'কিন্তু', জনাব হক বলে চললেন, 'আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি না। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এই সংকীর্ণ ভাবধারার উর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করব। আমি আশা করি যে, জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বছরে আমি দেখাতে পারব যে, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের সেবায় ব্রতী হলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আমাকে ভারতের ইতিহাস গঠন করতে হচ্ছে। আশা করি ভারত কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি ভারত-এর দ্বারা পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয় অংশকেই বুঝিয়েছি। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের প্রায় এগার বছর পর আমি আপনাদের আশীর্বাদে আবার শাসনক্ষমতা লাভ করেছি,—এই সময়ের মধ্যে পাক-ভারত রাজনীতির ঘটনাস্রোত অথবা ভারতের প্রতি পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা আমার ছিল না। আবার আমি কাজ আরম্ভ করলাম এবং ভারত-পাকিস্তানের যুক্ত ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কর্তব্য বিষয় আমি সর্বদা সচেতন থাকব। সারা পৃথিবী জুড়ে যে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে ভারতকে যদি তাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হয় তবে, আল্লা যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, আমি ভারতের এই অংশের নেতাদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে ভারতকে—অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই মিলিত ভূখণ্ডকে—বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট

স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।' জনাব হক পরিশেষে বলেন যে, 'পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নন, তাঁদের অধিকাংশ দরিদ্র ও অজ্ঞ, কিন্তু তাঁদের মন ও দিল খোলা। তাঁরা পশ্চিম-বঙ্গের তাঁদের বাঙালী ভাইদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে ও মৈত্রীতে বাস করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম প্রধান কর্তব্য হবে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সাম্প্রদায়িকতার নির্বাসন এবং দুই বাংলার মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন।'

হক সাহেব আরও বলেন যে, 'শ্রীঅমিয়নাথ বসু তাঁকে নেতাজী ভবনে আহ্বান জানিয়ে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালন করেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, শরৎ বসু একাডেমী যে-কোনো প্রয়োজনে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার কাজে তখনই হাজির হবেন।'

সেদিনই, অর্থাৎ সোমবার সকালে, বালিগঞ্জে ৬৭নং সাদার্ন এভিনিউতে আইনজীবী শ্রীঅজিত দত্তের বাসভবনে 'ভারত-পাক মৈত্রী সমিতি' জনাব ফজলুল হক সাহেবকে একটি সম্বর্ধনা জানান। এ সম্বর্ধনার উত্তরেও জনাব হক উভয় বঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, 'সমগ্রভাবে দেখলে ধান, পাট ও কয়লা ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুই বাংলার মধ্যে রাজনৈতিক বিভাগ যাই থাকুক না কেন, উভয় অংশের জনসাধারণ ও সরকার যদি পরস্পরেরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সহযোগিতা করেন তবে এ সব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর কোনো অভাব কখনও ঘটতে পারে না।'

জনাব হক আরও বললেন যে, 'বাঙালী অখণ্ড এক জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের আদর্শ এক, জীবনের উদ্দেশ্য এক এবং জীবন ধারণের পদ্ধতিও এক। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও দুই বাংলা মিলিতভাবে অনেক বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।'

হক সাহেব আরও বললেন যে, 'তাঁর রক্তে সাম্প্রদায়িকতার

লেশমাত্র নেই এবং তিনি সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসও করেন না। উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের দীন ভৃত্য বলেই তিনি নিজেকে মনে করেন।"

পাক-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীধীরেন ভৌমিক জনাব হককে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি মানপত্র অর্পণ করলেন। এই মানপত্রে জনাব হককে 'বাংলার ইতিহাসস্রষ্টা পুরুষ' এবং 'গরীবের রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে, 'মৌলভী হক বাংলার কৃষকের বন্ধু।'

এই দিনই অর্থাৎ ৩রা মে অপরাহ্নে হক সাহেব সস্ত্রীক চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরীফের দরগায় তাঁদের পারিবারিক মানত পালনের জন্য যান।

৪ঠা মে মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকাও 'মিথ্যার প্রাচীর' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব ফজলুল হককে অভিনন্দিত করলেন।

৪ঠা মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'ফজলুল হক সম্বর্ধনা সমিতি'র উদ্যোগে গ্র্যাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস হলে হক সাহেবের সম্মানে একটি প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনসভার সদস্য, মন্ত্রী, কূটনীতিক প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নাগরিক যোগদান করেন। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। সমিতির পক্ষ থেকে হক সাহেবকে মাল্যভূষিত করা হয়। হক সাহেবের বয়স অনুসারে ঐ মালাটি বিরাশিটি চাঁপা ফুলে গাঁথা হয়। একটি রম্য আধারে একটি সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র এবং কৃষক-প্রজা পার্টির আদর্শের প্রতীকস্বরূপ রৌপ-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র আকারের লাঙ্গল জনাব হককে উপহার দেওয়া হয়।

জনাব হক অভিনন্দন বাণীর উত্তরে বলেন যে, 'সমবেত সুধীবৃন্দের কেউ কেউ তাঁকে ইংরাজীতে, আবার কেউ কেউ বাংলায় তাঁর ভাষণ

দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রাণের ভাষা বাংলাতেই কথা বলবেন।’

গ্র্যাণ্ড হোটেলের এই সভায় জনাব হক বললেন যে, ‘কলকাতায় আসবার আগে তিনি কেবল এ কথাই ভেবেছেন যে, যাঁরা চিরকাল তাঁকে স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন, দুঃসময়ে সাহায্য করেছেন, নিরাশার সময় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই তিনি যাচ্ছেন এবং তাঁদের প্রীতি তিনি নিশ্চয় লাভ করবেন ; কিন্তু তিনি যে এরূপ বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁর অতি প্রিয় কলকাতা শহরে, যেখানে কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি অতিবাহিত করেছেন, সেখানে তিনি যে সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত।’

পরিশেষে সমবেত জনমণ্ডলীর অন্তর স্পর্শ করে হক সাহেব বললেন :

‘কলকাতা শহরের প্রতি, আপনাদের প্রতি আমার যে ঋণ তা আমি কোনোদিন পরিশোধ করতে পারব না। আপনাদের সেবা, আপনাদের খেদমতই আমার লক্ষ্য ! বাংলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙালী জাতির উন্নতিই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সত্য পথে, ন্যায়ের পথে আমি যাতে চলতে পারি, আপনারা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন, দোয়া করুন এবং বিশ্বাস করুন যে আমি আপনাদের চৌকিদার হয়েই পূর্ব-বঙ্গে আছি।’

জনাব হকের এই মর্মস্পর্শী ভাষণে অনেকেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং মুহুর্মুহু করতালির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দন জানান হয়। সভান্তে অনেকে তাঁকে আলিঙ্গন করেন।

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের গাওয়া ‘সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ এই গানটি দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সেদিনই ‘বঙ্গীয় প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি’র আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় জনাব হক বলেন যে, পূর্ব-বঙ্গে বাংলা ভাষার জন্য

উৎসাহ ও দরদ পশ্চিম-বঙ্গের চেয়েও বেশী। এমনকি, পূর্ব-বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শিশুও বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তিনি সমবেত সংবাদপত্রসেবীদের আবেদন জানিয়ে বললেন: 'আসুন, আমরা রাজনীতি ভুলে আমাদের মহান্ সংহতি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করি।'

কমিটির পক্ষ থেকে একটি মানপত্রে বলা হলো: 'আপনি অতীতে যে সব জনকল্যাণমূলক কার্য করিয়াছেন এবং বর্তমানে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উভয় বঙ্গের সম্পর্কে উন্নতির আশা জাগিয়াছে।'

মঙ্গলবার সকালে ক্লাইভ রো-তে 'মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স' জনাব হককে একটি প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। রাত্রে তিনি রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নৈশ-ভোজ করেন।

৫ই মে বুধবার সকালে জনাব হক প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা পশ্চিম-বঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উভয় বঙ্গের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিকেলে ৫২নং বিডন স্ট্রীটে সাধনা ঔষধালয়ের কলকাতা শাখা এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জনাব ফজলুল হককে সম্বর্ধনা জানালেন। সম্বর্ধনার উত্তরে জনাব হক বললেন, 'দেশের অবস্থার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি,···আজ আর কিছু বলব না। সাধনার ঔষধগুলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই তৈরী হয়, বিরাশি বছরেও আমার মাথায় যে কাঁচা চুল দেখছেন তা সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ মাখার ফল বলেই মনে করি।'

বুধবার ৫ই মে থেকেই জনাব হক 'দেশের অবস্থার সম্বন্ধে' আর বিশেষ কোনো কথা প্রকাশ্যে বলেননি, কারণ ইতিমধ্যেই ঢাকা ও করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল মহলে তাঁর কলকাতা-ভাষণগুলির মর্মার্থ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল, এবং তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক',

'পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের শত্রু' ইত্যাদি অবমাননাকর আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছিল। কলকাতায় হক সাহেবের কানে সে সংবাদ পৌঁছেছিল।

৬ই মে বৃহস্পতিবার সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা করলেন। কলকাতার আসবার পর ডাঃ রায়ের সঙ্গে এই তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁরা নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বিরাশি বছরের হক সাহেব তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সের বন্ধু বিধানবাবুর থেকে বিদায় নিলেন। যদিও তাঁরা দুজনেই নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার তাঁদের দেখা হবে এই আশা প্রকাশ করলেন, কিন্তু ইহজগতে তাঁদের মধ্যে আর কোনোদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি।

কলকাতায় স্মরণীয় একটি সপ্তাহ কাটিয়ে সেদিনই ফজলুল হক সাহেব ঢাকায় ফিরলেন, কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি একটি বিদায় বাণীতে বললেন: 'বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তরে কলকাতায় আমার অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমি বহুবার বলেছি যে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমি প্রথম কলকাতায় আসি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই মহানগরীতেই অতিবাহিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐতিহ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগসূত্র এতই গভীর ও দৃঢ় যে রাজনৈতিক বিভাগ তা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কলকাতায় আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে আমি খোলাখুলি মন নিয়েই আমার অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি।

আমি অবশ্য একথা শুনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইনি যে ঢাকায় একদল লোক, বিশেষ করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আমার কথার কদর্থ করে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আর

তাঁদের সমালোচনার কোন জবাব দিতে চাই না, শুধু বলব আমার দলের কাছে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তাঁদের মুখে জনসাধারণের প্রতিনিধি সেজে কথা বলা সাজে না।

...আমি অবশ্যই একজন পাকিস্তানী, এবং আমি নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম লীগপন্থীর থেকে উৎকৃষ্ট পাকিস্তানী। কিন্তু আমি একজন পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যেন কোনো রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়নি এমন ভেবে, তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার চেষ্টায় কোনো দোষ দেখতে পাই না।

আমার এই বিবৃতি শেষ করবার আগে আমি পুনরায় কলকাতার অধিবাসীদের তাঁদের সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে দুই বাংলা মিলেমিশে কাজ করে তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি ও সুখের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে।'

১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিছক ভোটের লড়াই ছিল না। সাত বছর ধরে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-বঙ্গের ওপর যে নির্মম শাসন ও শোষণ চালিয়েছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তার সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পেল।

এই নির্বাচনের তাৎপর্য করাচী-লাহোর নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহীরূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে পূর্ব-বঙ্গে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রীত্ব গঠন করবার সুযোগ দেওয়া হলে পূর্ব-বাংলা বিদ্রোহ করবে এবং পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পূর্ব-বঙ্গ থেকে পঞ্জাবী ও অবাঙালী অফিসাররা অনবরত রিপোর্ট পাঠাতে থাকে যে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রীত্ব গঠন করবার সুযোগ দিলে ব্যাপক অরাজকতা সুরু হবে, আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, অবাঙালীদের জীবন ও জীবিকার কোন নিরাপত্তা থাকবে না।

করাচী থেকে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ পূর্ব-বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অবিভক্ত ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লীগনেতা কেন্দ্রের এই পরামর্শকে যথাযথ মনে করতে পারেননি। তিনি যুক্তফ্রণ্টের নেতা ফজলুল হক সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা জেলে বাঙালী ও অবাঙালী ওয়ার্ডারদের মধ্যে এক সংঘর্ষ বেঁধে গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার জন্য আবার পূর্ব-বঙ্গের আমলাতন্ত্র কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পাঠায়। পূর্ব-বঙ্গের অবাঙালী আমলাতন্ত্র যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার কাজ বানচাল করার জন্য নানাভাবে মন্ত্রীদের আদেশ ও নির্দেশ অমান্য করে, সরাসরি কেন্দ্রের কাছে নানা মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রসূত রিপোর্ট পাঠিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিল।

পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেই অজুহাতে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্র শিল্পক্ষেত্রকেই বেছে নিল। পূর্ব-বঙ্গের পঞ্জাবী ও অবাঙালী শাসকগোষ্ঠী এবং আদমজী মিলের অবাঙালী কর্তৃপক্ষ এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে গেল। অবাঙালী মিল কর্তৃপক্ষ অবাঙালী শ্রমিকদের লাঠি, তরবারি এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে বাঙালী শ্রমিকদের আক্রমণ করার জন্য উসকিয়ে দিয়েছিল। এই দাঙ্গায় প্রায় শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়, বহু নারী ও শিশুর মৃতদেহ শীতলক্ষা নদীর জলে ভাসতে দেখা যায়। আদমজী জুট মিলে প্রধানতঃ বাঙালী শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন ছিল তার সভাপতি ছিলেন মৌলানা ভাসানী সাহেব। সাধারণ নির্বাচনের সময় এই ইউনিয়নভুক্ত সদস্যরা যুক্তফ্রণ্টের

প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিলেন। সেজন্য মালিকপক্ষ আগে থেকেই তাদের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের পর তারা যখন কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্রের উস্কানি পেল, তখন বাঙালী শ্রমিকদের 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেবার জন্য তারা এগিয়ে এল। তার ফলেই এ হাঙ্গামা।

আদমজী জুট মিলে দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের করাচী শাখা জিগির তুলল: পূর্ব-বাংলায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে! সেখানে কারও জানমান আর নিরাপদ নয়। সেখানে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসন চালু কর।

কোন রকম তদন্তের আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ফতোয়া জারী করলেন: এ হাঙ্গামার জন্য দায়ী কম্যুনিস্ট ও একশ্রেণীর দেশদ্রোহী। কম্যুনিস্টদের পাকড়াও করো। সীমান্তে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের দিকে নজর রাখো।

এই সময়কার ঘটনাপ্রবাহের দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে যে পূর্ব-বাংলার নবজাত মন্ত্রিসভাকে খতম করবার উদ্দেশ্যে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পশ্চিম-পাকিস্তানী সাঙাতের দল কি অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিলেন।

আদমজী জুটমিলের ঘটনায় তৎক্ষণাৎ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী যার নাম ইষ্ট-পাকিস্তান রাইফেল তাকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে এনে তার মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হোল পূর্ব-বঙ্গের পঞ্জাবী জি-ও-সি-কে অর্থাৎ সামরিক কর্তৃপক্ষকে। পূর্ব-বঙ্গ সরকারের হোমরা-চোমরা অবাঙালী দু-হাজারি-চার-হাজারি অফিসাররা প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এ সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চললেন। তাদের কাছ থেকে মদৎ পেয়ে কোন কোন থানার দারোগা পর্যন্ত মন্ত্রিসভার নির্দেশকে অমান্য করে চললেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগওয়ালাদের মালিকানায় পরিচালিত (পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রই তখন এদের খপ্পরে) সংবাদ-পত্রগুলি যুক্তফ্রণ্ট-সরকারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে এমন জোরে গলা ফাটাতে লাগল যে পারলে তারা তখনই যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে শূলে চড়িয়ে দেয়।

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে চারিদিকে যখন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছিল সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় এলেন। হক সাহেবের কলকাতা সফরের কাহিনী আগেই শুনিয়েছি।

ফজলুল হক কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে যাবার কয়েকদিন পরেই গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী তাঁকে করাচীতে জরুরী তলব করলেন। হক সাহেব ২১শে মে শুক্রবার করাচীতে উপস্থিত হলেন। গভর্নর জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে জনাব হকের সপ্তাহব্যাপী বাগ-বিতণ্ডাময় আলোচনা হোল। শের-ই-বাঙ্গাল ফজলুল হক পূর্ব-বঙ্গের জন্য স্বায়ত্ত শাসন দাবী করলেন। ৩১শে মে রবিবার গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জনাব ফজলুল হক ও তাঁর যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে পর্ব-পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত করলেন। জবরদস্ত সেনাপতি সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মিরজাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান হোল। তৎকালীন গভর্নর বৃদ্ধ চৌধুরী খালিকুজ্জামান অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ইস্কান্দার মিরজার সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী করে নিয়ে এলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ সিভিলিয়ান জনাব নিয়াজ মহম্মদ খানকে (এন. এম্. খান নামে কুখ্যাত এই পঞ্জাবী আই-সি-এস অফিসার অবিভক্ত বাংলায় নানা জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন)।

৩০শে মে সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে প্রধান

মন্ত্রী মহম্মদ আলী জনাব ফজলুল হককে পাকিস্তানের শত্রু ও পূর্ব-বঙ্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন। করাচী থেকে ঘটা করে প্রচার করা হোল যে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-বঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাই পাকিস্তানকে অন্তর্ঘাতীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই পূর্ব-বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হলেন।

পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব ৩০শে মে সকাল সওয়া নটা নাগাদ করাচী থেকে ঢাকা ফেরবার পথে ঘণ্টা খানেক তাঁর বিমানটি দমদম বিমানঘাঁটিতে থেমেছিল। হক সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তার মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—জনাব আজিজুল হক, জনাব আতাউর রহমান খান, যিনি পরে কিছুদিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং শেখ মুজিবর রহমান খান (সে সময় তরুণ নেতা বর্তমানে পাকিস্তানের রাজনীতির অন্যতম নায়ক)।

যথারীতি সমবেত সাংবাদিকরা হক সাহেবকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে স্থরু করলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন ও পরিশ্রান্ত জনাব হক কিছু বলতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি শুধু বললেন: 'আমার কাছে এসে আর কোন লাভ নেই। আমি কিছুই বলতে পারব না। আমার মুখ বন্ধ।'

করাচীর সঙ্গে হক সাহেবের রাজনৈতিক লড়াই-এর খবর কলকাতার সাংবাদিকরা পেয়েছিলেন—স্থতরাং তাঁরা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। প্রবীন নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ঠিক বেলা ১০টা বেজে ১৫ মিনিটে ফজলুল হক সাহেবের বিমান দমদমের মাটি ছেড়ে, কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। তাঁর প্রিয় কলকাতার মাটিতে শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের পা আর কোন দিন পড়েনি। ঢাকায় ফিরে তিনি হলেন অন্তরীণ, কিন্তু তিনি চিরদিন অমর হয়ে আছেন হিন্দু-মুসলমান পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালীর অন্তরে।

অন্তরীণ হবার পর প্রায় ছ-মাস জনাব ফজলুল হক ঢাকায় তাঁর কে. এম. দাস লেনের বাড়ির বাইরে পা ফেলেননি। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কারও তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ছিল না। হক সাহেবের বাড়ির বাইরে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সশস্ত্র প্রহরী বসান হয়েছিল—এ ছাড়াও গোয়েন্দা পুলিশ ও ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলস্-এর অফিসাররা তাঁর বাসভবনের একতলাটা প্রায় দখল করেই রেখেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন সব সময় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি আগলে বসে থাকত যাতে কেউ হক সাহেবের ঘরে যেতে না পারে। এমন কি ৩রা জুন ঈদের জমায়েতে নমাজ পড়তে ফজলুল হক সাহেবকে যেতে দেওয়া হোল না। তিনি বোধহয় জীবনে এই প্রথম বাড়িতে ঈদের প্রার্থনা করলেন।

পূর্ব-বঙ্গের যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, যিনি তিন যুগ ধরে বাংলা দেশের কৃষক সমাজের সেবা করেছেন, যাঁকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি এবং বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁর জনপ্রিয়তা কায়েদ-ই-আজমের চেয়েও কম ছিল না। বাংলা দেশের সেই প্রবীণতম জননেতাকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিতে করাচীর সাম্রাজ্যবাদীরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। করাচীর নেতাদের এই আচরণে পূর্ব-বাংলার জনগণ সেদিন ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। মৌলানা ভাসানী তখন লণ্ডনে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন যে যুক্তফ্রণ্টের নেতারা যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তা হলে পূর্ব-বাংলার শতকরা ৯৫ ভাগ লোকই 'বিশ্বাসঘাতক'—কারণ তারা ব্যাপকভাবে যুক্তফ্রণ্টকে সমর্থন জানিয়েছে।

৩১শে মে গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন: 'আমার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করলেও তা বরদাস্ত করা হবে না। দরকার হলে আমি জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করব। পাকিস্তানের

অখণ্ডতা রক্ষা করবার জন্য যদি দশ-বিশ হাজার মানুষকেও হত্যা করতে হয়, তা হলেও আমি পিছ-পা হব না।'

সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র দলন সুরু হোল। সংবাদপত্রের অফিসে অফিসে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর পাহারা বসল। সরকারের অন্ধ সমর্থক মর্নিং নিউজ আর আজাদ ছাড়া অন্যান্য সব সংবাদপত্রের উপর আদেশ জারী হোল যে সেন্সর ছাড়া কোন সম্পাদকীয় এমন কি সংবাদও প্রকাশ করা চলবে না।

পূর্ব-বাংলায় ইস্কান্দার ও এন. এম. খাঁন-শাহী চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে ধরে নিয়ে কারারুদ্ধ করা হোল। এঁদের অনেকে মুসলিম লীগ আমলেও জেলে ছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু এই মুক্তি মাত্র এক মাসের বেশী স্থায়ী হোল না। এঁরা ইস্কান্দারী রোষের বলি হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান, গণতন্ত্রী দলের সম্পাদক মহম্মদ আলি এবং আরও অনেক প্রগতিশীল যুব নেতা। এ সময় পূর্ব-বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা বরিশালের সতীন সেন কারাগারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জেলের অত্যাচারে ও অযত্নে তার দেহ দ্রুত ভেঙ্গে পড়তে লাগল এবং তাঁকে প্রথমে বরিশাল জেল থেকে রংপুর জেলে এবং পরে ঢাকার মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোল। কিন্তু তখন তাঁর অন্তিম অবস্থা। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পর এই মহান বিপ্লবী নেতা যিনি জীবনের প্রায় ২৬ বছর ইংরেজের কারাগারে কাটিয়েছেন এবং পাকিস্তানের জেলেও বন্দী থেকেছেন দীর্ঘদিন তাঁর দেহাবশেষটি পর্যন্ত বেওয়ারিশ মৃতদেহের সঙ্গে মর্গের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

পূর্ব-বাংলার সর্বত্র সভা, শোভাযাত্রা, সম্মেলন অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমস্ত অধিকার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোল। যুক্তফ্রণ্টের

নেতারা একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে অবস্থা পর্যালোচনার চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানেও উপস্থিত হয়ে সেই ঘরোয়া বৈঠকটিও ভেঙ্গে দিল।

সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারকে চূর্ণ করে সারা বাংলায় কায়েম হোল পঞ্জাবী সন্ত্রাসবাদের এক চরম বিভীষিকা।

পঞ্জাবী স্বার্থচক্রের বিরুদ্ধে যে শুধু পূর্ব-বঙ্গই রুখে দাঁড়ানর চেষ্টা করেছিল তাই নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও পঞ্জাবী আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। সিন্ধি, বেলুচি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশী পশ্চিম-পাকিস্তানের অপঞ্জাবী সব রাজ্যের মানুষই পণ করলেন যে পঞ্জাবীদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য অবাধ শোষণ তাঁরা প্রতিহত করবেন। কিন্তু পঞ্জাবী গোলাম মহম্মদ ও তাঁর সাঙ্গাতরা এই আন্দোলনের নাম দিলেন প্রাদেশিকতা। বললেন এ হোল ইসলাম-বিরোধী সঙ্কীর্ণতা। পাকিস্তানকে যদি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হয় তবে এ ধরনের বিপদ্‌জনক স্বাতন্ত্র্যের বুলি ছাড়তে হবে। গোটা পশ্চিম-পাকিস্তানকে এক হতে হবে। অর্থাৎ সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পশ্চিম-পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের পশ্চিম ভূখণ্ডে এক-ইউনিট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তিনি করলেনও তাই। লাহোর হোল পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী। ১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব এক-ইউনিটের অর্থাৎ পঞ্জাবীচক্রের কব্জায় এল। পঞ্জাবী ভূস্বামী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা মিঞা মমতাজ দৌলতানা খোলাখুলিই বললেন যে 'এক ইউনিট হয়ে পঞ্জাবীদের কপাল খুলে গেল। লাহোর ও করাচীর ক্ষমতায় এবার থেকে পঞ্জাবীরাই বসবে।' মিঞা সাহেব আরও বললেন যে 'এই এক ইউনিট কায়েম হলে পশ্চিম-পাকিস্তান আরও ভালোভাবে আরও শক্ত হাতে কেন্দ্রের হালটা ধরতে পারবে।'

পঞ্জাবী মিঞা মমতাজ দৌলতানার মুখ থেকে সত্যি কথাটাই বেরিয়ে এসেছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠনের উদ্দেশ্যই হোল পূর্ব-বাংলাকে জব্দ করা, কোণঠাসা করান ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করা। এর পরে আমরা দেখতে পাব যে পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যার আধিক্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য প্যারিটি বা সমতার কুখ্যাত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। অর্থাৎ গণপরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সম-সংখ্যক সদস্য থাকবে যদিও পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনেক বেশী এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদে তাদের সদস্য সংখ্যারও আধিক্য থাকা উচিত। এই প্যারিটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সুস্পষ্ট—পূর্ব-পাকিস্তানীদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্ব অর্জন করতে না দেওয়া। পাকিস্তান শাসনতন্ত্র পরিষদে দাঁড়িয়ে পূর্ব-বাংলার সদস্য জনাব আবতুল মনসুর আমেদ তাই সত্যদ্রষ্টার মতই বলেছিলেন: 'এক ইউনিটের উদ্দেশ্য হোল পূর্ব-বাংলাকে কোণঠাসা করা।'

পূর্ব-বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয় ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে আর পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে এক ইউনিট প্রবর্তন করা হয় ১৯৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবর। এই মধ্যবর্তী চোদ্দ মাসের ইতিহাস অনেকটা ক্ষমতা নিয়ে খাওয়া-খাওয়ির ইতিহাস। এ ক্ষমতার লড়াই যেমন চলে কেন্দ্রে, তেমনি চলে পশ্চিম-পাকিস্তানে ও পূর্ব-বাংলায়।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ১৯৫৪ সালে অসুস্থতার জন্য কিছুদিন করাচীর বাইরে থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী তার ক্ষমতা খর্ব করার একটি চক্রান্তে লিপ্ত হন। পঞ্জাবী আমলাতন্ত্র ও নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে খবর পেয়ে গোলাম মহম্মদ রাতারাতি করাচী ফিরে এসে সারা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। এ ঘটনা ঘটল ১৯৫৪

সালের ২৪শে অক্টোবর সকালে। সেদিনই অপরাহ্ণে তিনি বগুড়ার মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। গোলাম মহম্মদ এই নতুন মন্ত্রিসভার নাম দিলেন 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্টস' বা গুণধর মন্ত্রীসভা। এই গুণধর মন্ত্রিসভায় তুই গুণধর হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আয়ুব খান এবং পূর্ব-বাংলার গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। এঁদের ওপর যথাক্রমে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতর ভার দেওয়া হোল। ইংরেজ আমলের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মচারী চৌধুরী মহম্মদ আলী নিযুক্ত হলেন অর্থমন্ত্রী। বলা বাহুল্য ইনিও একজন পঞ্জাব তনয়।

আরও একজন গুণধর স্থান পেলেন গোলাম মহম্মদের নবগঠিত মন্ত্রিসভায়। ইনি হলেন স্বনামধন্য জনাব শহীদ সোহরাবর্দী। অবিভক্ত বাংলার শেষ 'প্রধানমন্ত্রী'। তিনি তখন সুইজারল্যাণ্ডে জুরিখের হাঁসপাতালে হার্টের অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করছিলেন। গোলাম মহম্মদের আহ্বান পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি করাচী এসে হাজির হলেন। পেলেন আইন দফতরটি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহম্মদ আলী জিন্না এই বহু বিতর্কিত রাজনীতিবিদ্‌কে কোন পাত্তা দেননি। প্রকৃত পক্ষে সুরাবর্দী সাহেব দেশবিভাগের পরও বেশ কিছুদিন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—পরে তিনি ঢাকায় গিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসর জমিয়ে বসেছিলেন।

পাকিস্তানে এসব ওলট্‌-পালটের সময় পূর্ব-বঙ্গের গণনেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লণ্ডনে। গোলাম মহম্মদের এই নতুন মন্ত্রিসভায় শহীদ সোহরাবর্দীর যোগদানে বৃদ্ধ ভাসানী তীব্র আপত্তি জানালেন। তিনি শহীদ সাহেবকে জানালেন: অখণ্ড বাংলার তুমি যখন মুখ্যমন্ত্রী সে সময় তুমি বগুড়ার মহম্মদ আলীকে তোমার কেবিনেটে নিয়েছিলে—আর আজ তুমি তার মন্ত্রিসভায় তারই অধীনে আইনমন্ত্রী হবে কি করে? কিন্তু সোহরাবর্দিকে তখন

রাজনীতির নেশা ও মন্ত্রীত্বের লোভ পেয়ে বসেছে। তিনি গুণধর মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন।

গোলাম মহম্মদ তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের আরও পরিচয় দিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের বেপরোয়া পাঠানদের শায়েস্তা করবার জন্য এবং সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফফার খানের পাখতুন আন্দোলনে ফাটল ধরাবার উদ্দেশ্যে গফফার খানের ভাই ডাক্তার খান সাহেবকে—(ইনি অবিভক্ত ভারতে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন)—তিনি এই মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করলেন। ডাঃ খান সাহেবকে তিনি কারামুক্ত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই খান আবদুল গফফর খানের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হলেন। পরে গোলাম মহম্মদ ডাঃ খান সাহেবের সাহায্যে পঞ্জাবে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করান এবং এক ইউনিট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর তাঁকে পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ যে পাখতুনরা স্বতন্ত্র পাখতুনিস্তান গঠন করবার জন্য সংগ্রামরত ছিল তাদের অন্যতম নেতা বিভিন্ন প্রদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে এক ইউনিট চালু করবার পক্ষে বড় মুরব্বী হলেন।

১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল গোলাম মহম্মদ পাকিস্তানের উভয় খণ্ড থেকে ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করলেন অর্থাৎ পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের বাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন গণপরিষদে সে পশ্চিম-পাকিস্তানের সমান আসন পেল। কুখ্যাত 'প্যারটি' বা 'সমতা' প্রথার সূত্রপাত হোল। পাকিস্তানে পশ্চিমা বিশেষ করে পঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভুত্ব কায়েম হবার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা হোল যার প্রভাব পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এ ঘটনার হোতাও ছিলেন গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ।

গোলাম মহম্মদ জেনারেল ইসকান্দর মির্জা ও জেনারেল আয়ুব খান-সহ প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীকে আমেরিকায় পাঠিয়ে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ভিত্তি রচনা করলেন। পরে গোলাম মহম্মদ নিজেও প্রেসিডেণ্ট আইশেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করে মার্কিন সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা পাকা করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী আড়াইলক্ষ পাকিস্তানী ফৌজকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম কিস্তিতে ১০০ কোটি টাকা সাহায্য দেয় এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে একটি বিমান-ঘাঁটি তৈরী করার সুযোগ পায়। ১৯৫৪ সালে এই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সিয়াটো (South East Asia Organisation) এবং তার অল্প কিছুদিন পরেই বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করেন।

পূর্ব-বঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের অভ্যুদয় এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে পূর্ব-বঙ্গের গণসংহতি পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সামনে প্রচণ্ড বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে যুক্তফ্রণ্টের চ্যালেঞ্জ যদি রোধ করা সম্ভব না হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যতে হয় পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে নয়ত অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব-বঙ্গে রক্তাক্ত বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে।

এই অবস্থায় পূর্ব-বঙ্গে নির্মম দমননীতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়াও যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিকের মধ্যে ফাটল ধরাবার কূটনৈতিক তৎপরতাতেও লিপ্ত হলেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পঞ্জাবী-গোষ্ঠী।

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইস্কান্দার মির্জা নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে যোগদান করবার পর ঝানু রাজনীতিবিদ্ খাজা শাহাবুদ্দিনকে পূর্ব-বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান হোল। খাজা শাহাবুদ্দিন পূর্ব-বঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী কট্টর মুসলিম লীগ-পন্থী

খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সহোদর। পূর্ব-বঙ্গের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর জানা। খাজা শাহাবুদ্দিন ঢাকায় এসেই যুক্তফ্রণ্টের দুই বড় শরিক আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাতে সুরু করলেন। ইতিমধ্যে নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত বহু মুসলিম লীগ নেতা এই দুটি দলে যোগ দিয়েছিলেন—খাজা শাহাবুদ্দিন এঁদেরকে তাঁর এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে সুরু করলেন।

পূর্ব-বাংলার যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে বিবাদ, নানা বিষয়ে মতানৈক্য ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব-বঙ্গের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানের অসহনীয় নির্যাতনে যুক্তফ্রণ্টের বহু নেতারই মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। সংগ্রামের পথ ছেড়ে আপোষবাদের পথে পূর্ব-বাংলার জন্য যতটুকু সুবিধা অর্জন করা যায় তাই করা উচিত এ মনোভাব ক্রমশঃ যুক্তফ্রণ্টের একদল নেতার মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এখানে মনে রাখতে হবে যে পূর্ব-বঙ্গের প্রবীণ মুসলমান নেতাদের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে তাঁদের জীবনে ত্যাগ, দুঃখ বা লাঞ্ছনা বরণের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বরাবরই তাঁরা ছিলেন আপোষপন্থী ও ক্ষমতাকাঙ্খী।

যুক্তফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে বিবাদ ও অন্তরদ্বন্দ্বের এই পটভূমিকায় গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ঢাকায় উড়ে এলেন। কৃষক-শ্রমিক-প্রজা দলের নেতা জনাব ফজলুল হক ও আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান খান দুজনেই বিমান বন্দরে গিয়ে গভর্নর-জেনারেলকে মাল্যদান করলেন। যাঁকে ছ-মাস আগেও বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে অন্তরীণ করা হয়েছিল সেই ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে প্রকাশ্যে দহরম-মহরম করতে গোলাম মহম্মদের বাধেনি। আবার আওয়ামী নেতা আতাউর রহমানকেও তিনি তেল দিতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩রা জুন করাচী থেকে ফরমান জারী করা হোল যে পূর্ব-বাংলার বুক থেকে গভর্নর-শাসন তুলে নেওয়া

হোল। ফজলুল হক সাহেব ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে না পারায় তাঁরই মনোনীত জনাব আবুহোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। জনাব ফজলুল হক ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা হোল। এইভাবে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হোল এবং পূর্ব-বঙ্গে গঠিত হোল কৃষক-শ্রমিক দল ও নিজামে ইসলাম পার্টির কোয়ালিশন সরকার।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদের ভেদের ফলা যুক্তফ্রন্ট নায়কদের ক্ষমতা লোলুপতা ও অনৈক্য যুক্তফ্রন্টকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুটি স্তম্ভ আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক দলের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল। পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান যুক্তফ্রন্ট এই ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল। দুর্বল হোল আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকামী পূর্ব-বাংলার মানুষের সঙ্ঘশক্তি। যুক্তফ্রন্টের এই কোন্দলের ইতিহাস নিঃসন্দেহে পূর্ব-বাংলার কলঙ্কের ইতিহাস। স্বার্থলোলুপ নেতৃত্বের স্বার্থ-পরায়ণতার ইতিহাস। সাময়িকভাবে হলেও যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক একুশ দফার এইভাবে অপমৃত্যু ঘটল।

ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ বগুড়ার মহম্মদ আলীকে অপসারণ করে পঞ্জাবী চৌধুরী মহম্মদ আলীকে প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও অনেক দিন ধরে ভেঙ্গে পড়েছিল তিনি তাঁর প্রচণ্ড মানসিক শক্তিবলে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন্ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যেতে হোল। গোলাম মহম্মদ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন। কিন্তু ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তাঁর পক্ষে এই উচ্চপদ আর দখল করা সম্ভব হয়নি। রোগজীর্ণ দেহে এই পঞ্জাবী আমলাকে চিরদিনের জন্য রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হোল। ১৯৬৬ সালের আগস্ট

মাসে উচ্চাকাঙ্খী ও ফৌজী ব্যুরোক্রাট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। এবার তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানী চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেলের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করবার কাজ সমাপ্ত করার দিকে—উদ্দেশ্য পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়ে গেলে তিনি হবেন পাক রাষ্ট্রের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপতি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের বিপুল জনসমর্থন লাভের মূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা এবং পূর্ব-বঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী। পূর্ব-বঙ্গের ওপর পশ্চিম-পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ছাড়া পূর্ব-বঙ্গের মুক্তি নেই এই ছিল পূর্ব-বঙ্গের কোটি কোটি জনতার বক্তব্য।

জাতীয় ঐক্যের নামে পূর্ব-বঙ্গকে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ১৯৫৫ সালে পূর্ব-বঙ্গে ব্যাপক গণআন্দোলন স্বুরু করল। 'কেন পূর্ববঙ্গের অটোনমী চাই'—সে বিষয় জনমতকে আরও জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী দল ১৯৫৫ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করল। এই পুস্তিকায় বলা হোল ঃ

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মৌলিক 'প্যাটার্নে'র পটভূমিতে ভূগোলের দিক দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের অটোনমীর দাবীকে স্বীকার না করে উপায় নেই। পাকিস্তান একটি অখণ্ড ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। এই রাষ্ট্রের দুটির বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বিমান পথে ১,০০০ এবং জলপথে ৩,০০০ ব্যবধানে অবস্থিত। ক্যানাডা ও বৃটেনের মধ্যে যে ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের ব্যবধান তার চেয়েও বেশি।'

'বাস্তবক্ষেত্রে করাচী সরকারের কাছে পূর্ব-বঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোন গুরুত্ব নেই। ১,০০০ মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ব-বঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের

পক্ষে পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।'

'অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদন ব্যবহার ভিন্ন প্রকৃতি এবং মূল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের পারস্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।'

'পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ব-বঙ্গের মধ্যে ১৪০০ মাইলের ভারতীয় ভূখণ্ড অবস্থিত। স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। বিমান বা স্থলপথে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম পশ্চিম-পাকিস্তানে পূর্ব-বঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানী করা হয় এবং তারপরে আবার রপ্তানী করা হয় পূর্ব-বঙ্গে। তার ফলে, পশ্চিম-পাকিস্তানের রপ্তানীকারীরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়, —পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে মাল রপ্তানী করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সেজন্য বৈদেশিক জিনিসপত্রের দামই যে পূর্ব-বঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় বলে পূর্ব-বঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিক্রি হয়।'

রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগে সবদেশেই সরকারী কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়। ৩,০০০ মাইল দূর থেকে পূর্ব-বঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতিরক্ষা করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাষ্ট্রে সমস্ত কাজকর্ম 'ইউনিটারী' বা ঐকিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন

প্রদেশের মধ্যে কতখানি ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে? জোর জুলুম করে অথবা পিস্তল দেখিয়ে কোন দেশে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়।'

'পূর্ব-বঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জনসাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। এই অর্থ থেকে পূর্ব-বঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটেনি। পাকিস্তান গঠনের পরে এই রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে। মিলিটারী কলেজ, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরীর সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানে ও করাচীতে। এরূপ কাজে অথবা এরূপ সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে পূর্ব-বঙ্গ কোন অংশই পায়নি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০-৭০ কোটি টাকা পূর্ব-বঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু তার প্রায় সবই ব্যয় করা হয় পশ্চিম-পাকিস্তানে। এরূপ এবং অন্যান্য শোষণের ফলে পূর্ব-বঙ্গের সর্বশ্রেণীর জনজীবন আজ এক শোচনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন। পূর্ব ও পশ্চিম পাক ভূখণ্ড দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় পূর্ব-বঙ্গের পুঁজি পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

'পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য ও আমদানির ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে তার ফলে পূর্ব-বঙ্গের জনজীবন গুরুতরভাবে বিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব-বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে ব্যবসা বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানীর সুযোগ পশ্চিম-পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যে তারফলে আমদানীর প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানে। এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য পূর্ব-বঙ্গের বাজারে জিনিসপত্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অগ্নিমূল্যও বটে। বর্তমানে পূর্ব-বঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপত্র আমদানী করতে হয় করাচী থেকে এবং তারফলে

প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ব-বঙ্গকে ৫০ শতাংশ বেশি দাম দিতে হয়। এইভাবেও পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-বঙ্গের পুঁজি নিয়মিতভাবে শোষণ করে নিচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে কিভাবে পূর্ব-বঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের কুক্ষিগত কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত কর্মচারীদের আঞ্চলিক বণ্টনের তথ্যে তা অতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট

ডিপার্টমেণ্ট	পশ্চিম-পাকিস্তান	পূর্ব-বঙ্গ
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট	৬৯২	৪২
শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন	১৩২	৩
রেডিও	৯৮	১৪
সাপ্লাই ও ডেভেলপমেণ্ট	১৬৪	১৫
রেলওয়ে	১৫৮	১৪
পোস্ট ও টেলিগ্রাফ	২৭৯	৫০
কৃষি-অর্থনীতি করপোরেশন	৩৮	১০
সার্ভে	৬৪	২
বিমানবাহিনী	১,০২৫	৭৫

শিক্ষা-ক্ষেত্রে এবং মেডিকেল সংগঠনেও পূর্ববঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয়। যথা :

বিষয়	পশ্চিম-পাকিস্তান	পূর্ব-বঙ্গ
নতুন কলেজ	১	০
মেডিক্যাল কলেজ	৬	১
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৩	১
ইউনিভার্সিটি	৪	২
কলেজ	৭৬	৫৬
প্রাইমারী স্কুল	৬,২৪৬	২,২১৭
হাসপাতালের বেড-সংখ্যা	১৭,৬১৪	৫,৫৮৯
ডাক্তার	৮,৫০০	৩,৩৯৩
মেটারনিটি হাসপাতাল	১১৮	২২

কিভাবে পশ্চিম-পাকিস্তান—পূর্ব-বাংলাকে শোষণ করে একটি কলোনিতে পরিণত করেছে এই পুস্তিকায় তার একটি নির্মম চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পাকিস্তান গণ-পরিষদে যখন পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র রচিত হচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগ আইন সভার বাইরে এবং ভিতরে পূর্ব-বাংলার পূর্ণ অটোনমীর স্বপক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। নানা জায়গায় সভা, শোভাযাত্রা ও সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলার অটোনমির দাবী উত্থাপিত করা হয়েছিল। গণপরিষদের মধ্যেও আওয়ামী লীগ ও পূর্ব-বাংলার সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনার কাজে পদে পদে বাধা দেন এবং বহুবার সরকারী নীতির প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে আসেন।

কিন্তু পূর্ব-বাংলার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালে গৃহীত প্রথম পাকিস্তান সংবিধানে পূর্ব-বঙ্গের অটোনমির দাবী প্রত্যাখ্যাত হোল এবং পূর্ব-বাংলা নামটি পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে রূপান্তরিত করা হোল।

এছাড়া এই সংবিধানে আরও স্থির হোল যে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার অধিকার থাকবে না, এবং পাকিস্তান একটি ইসলামিক রিপাবলিক হিসাবে আখ্যায়িত হবে।

পূর্ব-বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব-পাকিস্তান নাম রাখার পেছনে যে সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছিল আধুনিক জগতের ইতিহাসে সংস্কৃতি-হননের এ ধরনের নিষ্ঠুর নিদর্শন বেশী দেখা যায় না। পূর্ব-বাংলার জীবন থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করাচীর শাসকচক্র করেছিল, তারা উর্দু ভাষা ও আরবী হরফ চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তাদের এ চেষ্টা শুধু ব্যর্থই হয়নি, বাংলা ভাষা আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ আরও প্রবল

ভাবে জেগে উঠেছিল পূর্ব-বঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নির্মূল করবার চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর পশ্চিম-পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকচক্র ১৯৬৬ সালের গঠনতন্ত্রে বাংলা দেশের নামটিকে হত্যা করে হয়ত খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। পশ্চিম-পাকিস্তানীরা মনে করেছিল যে বাংলা দেশের নামটি ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে বাংলা ভাষার আবেদনের উৎসও এক সময় শুকিয়ে যাবে এবং সেই সময় একদিকে গোটা বাংলা ভাষার উপর আরবী হরফ চাপিয়ে দেওয়া এবং অপরদিকে উর্দু ভাষা প্রবর্তন করা সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

১৯৬৩ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানে ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হোল এবং জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা হলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট। মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর কোন দিন কোন সংস্রব ছিল না, জীবনে যিনি কোন দিন দেশের হিতার্থে কোন কাজ করেছেন বলে শোনা যায় না, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর বিন্দুমাত্র সংস্রব কখনও ছিল না, যিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের একজন বশংবদ কর্মচারী, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা, লাভ, লোভ ও ভোগ যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—এরকম একজন পাক্কা ব্যুরোক্রাট হলেন পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা দলের প্রতি ইস্কান্দার মির্জার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কৃষক-শ্রমিক দলকে পূর্ব-বঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ দিয়ে ও কেন্দ্রে এই দলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রিত্বে বসিয়ে (যেমন জনাব ফজলুল হক সাহেবকে) এই দলের নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র হননের ব্যবস্থা ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হিসাবে করেছিলেন। এবার প্রেসিডেন্ট পদগ্রহণের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল আওয়ামী লীগের ওপর। পূর্ব-বঙ্গের আওয়ামী লীগ ছিল বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক এবং পশ্চিম-পাকিস্তানীদের বিভীষিকা।

ইসকান্দার মির্জা তাঁর আওয়ামী লীগ তোষণের প্রথম পদক্ষেপ্ হিসাবে এই দলের নেতা শহীদ সোহরাবর্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী করে দিলেন এবং পূর্ব-পাকিস্তানেও কৃষক-শ্রমিকদলের আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে আওয়ামীনেতা আতাউর রহমানকে দিয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান—আজকের পূর্ব-বঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। প্রেসিডেণ্ট মির্জা জানতেন যে তাঁর প্রধান শক্তি অবাঙালী আমলা-তন্ত্র ও পঞ্জাবী ফৌজ। তাই আওয়ামী লীগের অটোনমির দাবীতে তিনি মোটেই ভীত হননি। প্রেসিডেণ্ট মির্জার কূটনীতি ছিল এই যে আওয়ামী লীগকে একবার ক্ষমতার আসনে টেনে আনতে পারলেই প্রথমে কৃষক-প্রজা পার্টি এবং যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য শরিক-দলগুলির সঙ্গে তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যাবে এবং ক্রমে এই বিষ ছড়িয়ে পড়বে আওয়ালী লীগের নিজের নেতৃত্ব ও সংগঠনেও। ইসকান্দার মির্জার স্ট্র্যাটেজি আশ্চর্যজনকভাবে সফল হোল—তাঁর মোক্ষম চালে আওয়ামী লীগ কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

প্রেসিডেণ্ট মির্জা যা চেয়েছিলেন যা ভেবেছিলেন তাই হোল—আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ও কৃষক-শ্রমিক দলের মধ্যে চরম বিবাদ বেধে গেল। যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে পূর্ব-বঙ্গে যে গণ-ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। গৃহবিবাদ পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করে তুলল। শুধু তাই নয়—আওয়ামী লীগের মধ্যেই অন্তরদ্বন্দ্ব সুরু হয়ে গেল।

আওয়ামী লীগ জনসাধারণকে বার বার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এই দল পাক-মার্কিন চুক্তির বিরোধিতা করবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাক-মার্কিন চুক্তিকে ধিক্কার জানিয়ে পূর্ব-বঙ্গে বহু

সভা, শোভাযাত্রা এবং সম্মেলনও হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই শহীদ সোহরাবর্দী দলের এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে পাক-মার্কিন চুক্তিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। এর ফলে সুরু হলো ভাসানী-সোহরাবর্দী দ্বন্দ্ব। আওয়ামী লীগের দুই মোড়ল মৌলানা ভাসানী ও সোহরাবর্দীর কলহ এমন সময় এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছাল যে তাঁদের কথাবলা এমন কি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। চতুর সোহরাবর্দী গদিআঁটা নেতাদের বেশীর ভাগকে হাত করলেও জনতা ছিল মৌলানা ভাসানীর পক্ষে।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর-এ মৌলানা ভাসানী স্থির করলেন যে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর স্বগ্রাম ময়মনসিংহের কাগমারিতে একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন। মূলত এটি একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন হলেও এখানেই হবে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী-নায়ক সোহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি ঘোষণায় মৌলানা ভাসানী কাগমারির পথের ইঙ্গিত দিলেন—একটি ঘোষণায় তিনি বললেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে অসংখ্য পূর্ব-বঙ্গবাসী তাঁর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধানতঃ ছিল :

(ক) যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক একুশ দফার অন্যতম দাবী পূর্ব-বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী সরকার চেষ্টা করছে না কেন, (খ) বাঙালীদের উপেক্ষা করে কেন শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানিদের বিদেশে দূত করে পাঠান হচ্ছে, (গ) সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র চারজন।

আগেই বলেছি যে মৌলানা ভাসানী কাগমারিতে জনাব সোহরাবর্দীর সঙ্গে শেষ পাঞ্জা কষবার আয়োজন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ যাতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের সঙ্গে বিদেশী দূতাবাসগুলিকেও

মৌলানা ভাসানী এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর এই সম্মেলনের তিনি নাম করণ করেছিলেন আফ্রো-এশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সামগ্রিকভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি যে কোন রকমের যুদ্ধ জোটের বিরোধী। অথচ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাবর্দী যুদ্ধ-জোটের পক্ষে ওকালতির একজন বড় কৌঁশুলী। রাজনীতির ক্ষেত্রে সোহরাবর্দীকে নাস্তানাবুদ করতে হলে তাঁকে এরকমই একটি আসরে এনে নামিয়ে দিতে হয়। কাগমারি সম্মেলনের নাম আফ্রো-এশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার পিছনে মৌলানা ভাসানীর তেমনি একটা উদ্দেশ্য হয়ত ছিল।

তবে ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনে মৌলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারে স্পষ্ট। এখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-বিদ্বেষ-ঘৃণার উর্ধ্বে দাঁড়ানো মানবতাবাদী নায়ক। যে সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, কাগমারির ভাসানী যেন সেই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

এই মানবতাবাদী, এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই টাঙ্গাইল থেকে কাগমারি পর্যন্ত সড়কের উপর যে সব তোরণ নির্মিত হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, হাকিম আজমল খান, লেলিন, সেক্সপীয়র, আব্রাহাম লিংকন প্রভৃতির নাম যুক্ত করেছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। শোনা যায় যে পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, অখণ্ড বাংলার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামেও তিনি একটি তোরণের নামকরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উপদেষ্টাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মৌলানা ভাসানী এ সংকল্প ত্যাগ করেন।

মৌলানা ভাসানী নিজেই এই সম্মেলনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—কাগমারির সড়ক,—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম-বাংলা থেকেও একটি

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল কাগমারি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম-বাংলার অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীহুমায়ুন কবীর ইত্যাদি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের দিকপালরা।

ভারতের এই প্রতিনিধিদল যার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বাঙালী পূর্ব-পাকিস্তানে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেন। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে এসে অভিভূতকণ্ঠে সাংবাদিকদের তাঁদের পূর্ব-বঙ্গ সফরের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেন: 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখেছি তা আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে এ জন্য আমরা গর্ব অনুভব করেছি। কাগমারি ও ঢাকায় আমাদের স্বল্প অবস্থান কালে আমরা পূর্ব-বঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের এক বিস্ময়কর প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। পূর্ব-বঙ্গের মানুষ যে বাংলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন গঠন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। বাংলা বই পড়বার জন্য বাঙালী লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আমরা যে আগ্রহ দেখেছি তা আমাদের অভিভূত করেছে। পূর্ব-বঙ্গে আমাদের পরম আত্মীয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মূল সম্মেলন স্থান থেকে কিছুটা তফাতে যেখানে আমেরিকান, ব্রিটিশ, মিশরী, সিরিয়ান প্রভৃতি বিদেশী প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধি-দলকে সেখানে স্থান না দিয়ে একেবারে আওয়ামী লীগকর্মীদের সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। পাকা ঘরের তুলনায় তাঁবুতে বাসের অসুবিধা জেনেও আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা ভাসানী এবং অন্যান্য কর্মীরা ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে কখনও নিজেদের সঙ্গ ছাড়া করতে চাননি। তাঁবুতে

থেকে সাধারণ মানুষের যে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য আমরা লাভ করেছি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত গৃহে থাকলেও তা আমরা পেতাম না।'

কাগমারি সম্মেলনের উদ্যোক্তা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে তারাশঙ্করবাবু বলেন যে মৌলানা ভাসানীর মধ্যে এক অদ্ভুত মানুষকে তিনি লক্ষ্য করে এসেছেন যিনি একাল ও সেকাল এবং পূর্ব-বঙ্গের মাটির মানুষ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন।

মুসলিম লীগের ডন, মর্নিং নিউজ, মৌলানা আক্রাম খাঁর আজাদ, এমন কি সোহরাবর্দী ঘেঁষা আওয়ামী মুখপত্র দৈনিক ইত্তেফাকও ওদের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে বলল যে মৌলানা ভাসানী হিন্দুস্থানের দালাল—হিন্দুস্থানের পয়সাতেই তিনি নাকি কাগমারি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কাগমারিতে স্থানীয় কোন এক হিন্দু মহারাজার নাটমন্দিরে আওয়ামী সদস্যদের বৈঠক বসল। মৌলানা ভাসানী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমি আমার জান দিয়ে যুদ্ধ জোটের বিরোধীতা করব। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে এ চুক্তি মানিয়ে নিতে চান তবে আমি কবর থেকেও চেঁচিয়ে বলে উঠব: না, না, না ওই সর্বনেশে যুদ্ধ জোটের পক্ষে আমি নই।'

মৌলানা ভাসানী যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন বিদেশী পোশাকে সজ্জিত প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাবর্দী অদূরে বসেছিলেন—মুখ চিন্তামগ্ন, ভ্রূকুঞ্চিত।

মৌলানা ভাসানী এবার সোহরাবর্দীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আওয়ামী লীগের সমবেত প্রতিনিধিদের বললেন: 'আপনারা যাঁরা দলের মেরুদণ্ড, শরীরের রক্ত জল করে যাঁরা দল গড়েছেন তাঁরা বড়, না বড় এই ভদ্রলোকটি? আপনারা শহীদকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন—তাই তিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আপনারা

তাঁর পেছন থেকে সরে গেলে এ ভদ্রলোককেও সরে যেতে হবে। তাই আপনাদের নির্দেশ পার্টি সদস্য হিসাবে এঁকে মানতেই হবে।'

মৌলানা ভাসানী বললেন: 'পূর্ব-বাংলার আওয়ামী লীগ যুদ্ধ জোটের বিরোধীতা করে ১৯৫৩ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারপর প্রতি বছর প্রতি অধিবেশনে সে প্রস্তাবের প্রতি জানিয়েছে দলের গভীর শ্রদ্ধা। আওয়ামী লীগ আজ তাই সে প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না।'

জনাব সোহরাবর্দীর প্রতি একবার বক্রদৃষ্টি হেনে বৃদ্ধ মৌলানা আবার বললেন: 'এই ভদ্রলোক প্রচার করছেন যে তাঁর হাতে পড়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-নীতি নাকি অনেকখানি সফল হয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নটিকে তিনি নাকি আবার তাজা করে তুলেছেন। কথার উপর ট্যাকস্ নেই। অনেক লোক অনেক কথা বলতে পারেন, তার জন্য ট্যাকসের কড়ি লাগে না। এই ভদ্রলোকও তেমনি বাক্য ব্যয় করছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ শক্তিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আফ্রো-এশিয়ান জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাস হারানোর নাম কি পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য? নিজের ভাবনা, নিজের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে পরের ডিকটেশনে চলার নাম কি প্রগতি? এই ভদ্রলোক কি নিজের বুকে হাত দিয়ে সে কথা বলতে পারেন?'

ভদ্রলোক বলছেন, 'কাশ্মীর প্রশ্নটিকে তিনি আবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। তার উত্তরে আমি যদি বলি যে এদেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে কাশ্মীর সমস্যার নাম করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন—আমার পাশেবসা ভদ্রলোক তার কি জবাব দেবেন? সে জবাব তার কাছ থেকে আপনারা দাবী করুন।'

জনাব সোহরাবর্দীর হাতে ছিল একটি চিরকূট আর একটি টেলিগ্রাম। এই দুটি বস্তু হাতে নিয়েই তিনি মৌলানা ভাসানীকে কাবু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌলানাকে আদালত পর্যন্ত টেনে আনার হিম্মৎ তাঁর হয়নি। তাঁর ঝানু ব্যারিস্টারি বুদ্ধি এ কথাটা

অন্ততঃ তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে ও দুটি বস্তু হাতে নিয়ে সভা গরম করা গেলেও আদালতের বিচারপতিকে টলানো যাবে না। কারণ ও দুটি বস্তুই পাকিস্তান গুপ্তচর বিভাগের তৈরী। মৌলানা ভাসানির সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই।

পাকিস্তানী গুপ্তচর বিভাগ তাদের একজন লোককে কলকাতায় পাঠিয়েছিল হিন্দু মহাসভার জনৈক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। লোকটি মৌলানা ভাসানীর নামে লেখা একটি জাল চিঠি তাঁর হাতে দেয়। ঐ চিঠিতে একটি আবেদন ছিল যে মৌলানা ভাসানীর "অখণ্ড ভারত" গঠনের সংগ্রামে হিন্দু মহাসভা যেন তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা সহজ বিশ্বাসে মৌলানাকে দেবার জন্য এর একটি উত্তর লিখে সেই গুপ্তচরটির হাতে দেন। তাতে অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ছিল।

সোহরাবর্দীর দ্বিতীয় প্রমাণ একটি টেলিগ্রাম। মুসলিম লীগের আমলে মৌলানা ভাসানী যখন যুদ্ধজোট বিরোধী আন্দোলন করছিলেন তখন কে যেন ঢাকার সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিসে তাঁর নামে একটি টেলিগ্রাম পেশ করে। টেলিগ্রামটি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্দেশ্যে পাঠান। যুদ্ধ জোট সম্পর্কে তাঁদের কি করা কর্তব্য সে ব্যাপারে পণ্ডিত নেহেরুর পরামর্শের জন্যই যেন মৌলানা ভাসানী ঐ টেলিগ্রামটি করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিস থেকে তারবার্তাটি "সিজ" করে উপযুক্ত সময়ে কাজে লাগানোর জন্যে হাতে রাখেন।

এই চিরকূট আর এই টেলিগ্রামই ছিল মৌলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাবর্দীর মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু মাথায় যাঁদের সামান্য বুদ্ধি-সুদ্ধিও আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে বৃদ্ধ মৌলানাকে গারদে ঢোকাবার জন্য করাচীর নির্দেশে পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগ যে সব চক্রান্ত করছিল এই চিরকূট ও টেলিগ্রাম তারই দুটি নিদর্শন।

কিন্তু জনাব সোহরাবর্দীর এ অস্ত্র কোন কাজে লাগল না। তীর তূণেই রয়ে গেল।

মৌলানা ভাসানীর তীব্র কষাঘাতে বিপর্যস্ত জনাব সোহরাবর্দী তখন তাঁর তূণের মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। বললেন : 'পদত্যাগ করব।'

একমাত্র শেখ মুজিবর রহমান লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সার আপনাকে আমরা ছাড়ব না, ছাড়তে পারি না।'

মৌলানা ভাসানীকে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গ ছাড়তে হোল যদিও তিনি ছিলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি। তিনি পার্টির সম্পাদক শেখ মুজিবরকে জানালেন যে কেন্দ্রে ও পূর্ব-বঙ্গে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী দলের নেতারা বিশেষ করে শহীদ সোহরাবর্দী দলের আদর্শ ও একশ দফার কার্যসূচি বার বার লঙ্ঘন করে চলেছেন—বিদেশী শক্তির সঙ্গে দেশের গাঁটছড়া বেঁধে ছিচ্ছেন।

১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকার সদরঘাটে একটি সিনেমা হলে সারা পাকিস্তান গণতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। এতে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের দুই অংশের প্রায় বার-শো প্রতিনিধি যাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান।

এই সম্মেলনে আওয়ামী লীগ দু-খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। মৌলানা ভাসানীর অনুগামীরা গঠন করলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের তরুণ ও আদর্শবান কর্মীরা আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই দুটি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

পূর্ব-বঙ্গের আদর্শবান যুবকদের আগ্রহে ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম একটি বিরোধী সংগঠন গড়ে ওঠে যুব-লীগ নামে। ১৯৪৯ সালে নারায়ণগঞ্জে সৃষ্টি হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র—এই নতুন দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এই আওয়ামী মুসলিম লীগই পরবর্তী কালের আওয়ামী লীগ যা ১৯৫৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চরিত্র বুঝতে হলে, পাকিস্তানের

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা অনুধাবন করা কিঞ্চিৎ প্রয়োজন। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করবার প্রথম প্রচেষ্টার গৌরব অবশ্য পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রাপ্য। কিন্তু সে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিসাধ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে বেআইনী। কাজেই, একথা অনস্বীকার্য যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে, স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে, ব্যাপকতর গণ-সমর্থনের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে প্রথম যে বিরোধীদল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা হচ্ছে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হাসান শহীদ সোহরাবর্দী সাহেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ। অতঃপর, আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গণচেতনার মান উন্নত হওয়ায় কালক্রমে এই আওয়ামী মুসলিম লীগই সাম্প্রদায়িক নাম পরিহার করে আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের তৎকালীন দুই প্রধান মওলানা ভাসানী ও সোহরাবর্দী সাহেবের রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল খুবই গভীর। কাজেই, পরবর্তীকালে, গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া ও আন্দোলনকে যতই ইতিবাচক এবং সুস্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, সেই রাজনৈতিক মতপার্থক্য দিনকে দিন ততই বড় হয়ে দেখা দিতে থাকল। অবশেষে গত ১৯৫৭ সালে, সোহরাবর্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বে আওয়ামী লীগ যখন সাময়িকভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হল, তখন এই মতপার্থক্য উৎকট আকারে দেখা দিল। দেখা দিল বিশেষ করে, 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি' এবং আঞ্চলিক 'স্বায়ত্তশাসন'-এর মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে। সেন্টো, সিয়াটো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ পাকিস্তান! স্বভাবতই তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন মওলানা সাহেব ও তাঁর সমর্থকগণ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-এর আওতা থেকে পাকিস্তানকে বের করে আনবার জন্যে ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের সপক্ষে প্রবলভাবে দাবি উত্থাপন করতে সুরু

করলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারায় দীক্ষিত সোহ্‌রাবর্দী সাহেব বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মিলেমিশে চলার পক্ষপাতী। সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান-এর পৃথক পৃথক এলাকাগুলো ভেঙে চুরে ইতিপূর্বেই সারা পশ্চিম-পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' গঠন চক্রান্ত হাসিল করা হয়ে গেছে। স্বভাবতই, 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন'-এর অকুণ্ঠ সমর্থক হিসাবে মওলানা সাহেব ও তাঁর অনুগামীরা পশ্চিম-পাকিস্তানের 'এক ইউনিট' ভেঙে দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সহ পাকিস্তানের সর্বত্র ভাষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের স্বপক্ষে সবলকণ্ঠে আওয়াজ তুললেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী সোহ্‌রাবর্দী সাহেব, চাপে পড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবিটা একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাগজে-কলমে মেনে নিলেও 'এক ইউনিট বিরোধী' প্রস্তাবকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিলেন। সোহ্‌রাবর্দী সাহেবের গোঁয়ার্তুমির ফলে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বিপুল সংখ্যক কর্মীর সমর্থনে মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপ 'ন্যাপ' গঠিত হল। সাম্রাজ্যবাদী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত কট্টর আমলাতান্ত্রিকচক্র কর্তৃক বিতাড়িত না হওয়া অবধি আওয়ামী লীগনেতা সোহ্‌রাবর্দী সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব আঁকড়ে রইলেন।

সে যাই হোক একথা সেজন্যে সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অকুণ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রথম তুলে ধরবার গৌরব 'ন্যাপ'-এরই প্রাপ্য।

পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী। অবশ্য, এখানে সকলেই অনুমান করে থাকেন যে, কমিউনিস্ট কর্মী ও তাঁদের অনুগামীরা আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং শ্রমিক পরিষদ, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠমের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জার চক্রান্ত আশাতীতভাবে সফল

হোল। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি যে শুধু বিভিন্ন দলের পরস্পরের বিবাদে কলঙ্কিত হোল তাই নয়—আওয়ামী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দ্বন্দ্বেও পূর্ব-বঙ্গের মানুষ ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত ও অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অবশ্য এই দুঃসময়ের মধ্যেও আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অন্তত একটি মূল বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট রাখার চেষ্টায় তৎপর থাকে। এই দুটি বামপন্থী দল অবিরত বলতে থাকে যে ১৯৫৬ সালের পাক-শাসনতন্ত্রে পূর্ব-বঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে, পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে এবং পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী অস্বীকৃত হয়েছে।

পূর্ব-বঙ্গের গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠনের মেরুদণ্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক-ইউনিট বিরোধী প্রবল বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দিতে কৃতসংকল্প ইস্কান্দার মির্জা একটির পর আরেকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে বহাল ও বরখাস্ত করতে সুরু করলেন। ১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর তিনি সোহরাবর্দী সাহেবকে বিতাড়িত করে জনাব চুন্দ্রীগড়কে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসালেন। তের মাস গদিতে থাকার পর শহীদ সোহরাবর্দীর পতন ঘটল। সোহরাবর্দীর বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট মির্জা একটি অভিযোগ খাড়া করলেন যে তিনি নাকি প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছিল এবং পশ্চিম-পাকিস্তান আইন সভার অধিকাংশ সদস্য এক-ইউনিট ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-সম্মত পদ্ধতিতে গৃহীত এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে দিলেন প্রেসিডেণ্ট মির্জা।

এইভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশেই রাজনৈতিক সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামরিক এক নায়কত্ব আসন্ন হয়ে এসেছে এই কানাঘুষো ক্রমশ প্রবল হতে থাকে।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের জনসাধারণের অনাস্থা ভাজন এবং হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের ডিকটেটারি শাসন কায়েম করবার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেণ্ট মির্জা। পূর্ব-বঙ্গে কৃষক-শ্রমিক দলের জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিত্বকালে একবার এবং পরে আওয়ামী লীগের জনাব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিত্বের সময় আরেকবার খাদ্য সরবরাহ ও সীমান্তের চোরাকারবার রোধের নামে পূর্ব-বঙ্গের শাসন ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা সর্বশক্তিমান প্রেসিডেণ্টের হাতের পুতুল মাত্র।

প্রেসিডেণ্ট মির্জার এ ধরনের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখে মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব আবদুল কায়ুম খান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন: 'আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট যে দেখছি সব ব্যাপারেই মাথা গলান।' পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সমস্বরে জনপ্রিয় আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমান খানও তীব্র শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করলেন: 'আজকের দিনে পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সমস্যা হলেন স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা।'

ইতিমধ্যে জনাব চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন পঞ্জাবী জমিদার-নন্দন এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মালিক ফিরোজ খান নুন।

১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটির পর আরেকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগল। এ ধরনের রাজনৈতিক উথাল-পাথালের নজির সারা পৃথিবীর পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসে মেলা দুষ্কর।

৩১শে মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন রাজ্যপাল জনাব ফজলুল হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে কৃষক-প্রজা দলের নেতা জনাব আবু হোসেন সরকারকে (ইনি ইতিপূর্বেও কিছুদিন পূর্ব-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন)—মুখ্যমন্ত্রী

নিযুক্ত করলেন। আওয়ামী মন্ত্রিসভার আকস্মিক পদচ্যুতিতে ক্ষুব্ধ শহীদ সোহরাবর্দী সেদিনই গভীর রাত্রে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে টেলিফোন করে ভয় দেখালেন যে আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি যদি ফজলুল হক সাহেবকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে না সরান তবে তিনি কেন্দ্রে আওয়ামী দলের সদস্যদের নির্দেশ দেবেন যে তাঁরা যেন নুন মন্ত্রিসভাকে আর সমর্থন না করেন। মালিক নুন জনাব সোহরাবর্দীর ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করতে পারলেন না, কারণ তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে আওয়ামী সদস্যদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার অর্থ হোল তাঁর পতন। তাই মালিক নুন উপায়ন্তর না দেখে জনাব সোহরাবর্দীর দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি শহীদ সাহেবের টেলিফোন পাবার চার ঘণ্টার মধ্যে জনাব ফজলুল হককে পদচ্যুত করলেন। চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলি অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হলেন।

পরদিনই অর্থাৎ ১লা এপ্রিল জনাব হামিদ আলী মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। আবু হোসেন সরকারের বারো ঘণ্টার মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো—শুধু ৩১শে মার্চ রাত্রিটুকু তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এত ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রিসভার কথা ইতিপূর্বে আর কেউ শুনেছেন কিনা জানি না।

এরপরই অস্থায়ী রাজ্যপাল জনাব হামিদ আলী পুনরায় জনাব আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর হৃত মুখ্যমন্ত্রিত্ব ফিরে পেলেন। ঠিক যেন আরব্য রজনীর আর একটি কাহিনী!

কিন্তু ১৮ই জুন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আবার সংকট ঘনিয়ে এলো। পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভায় সরকার-পক্ষের আনা একটি প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হোল—পরদিন অর্থাৎ ১৯শে জুন আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। নয়া গভর্নর জনাব সুলতান-

উদ্দিন-আহমেদ্—(ইনি ইতিমধ্যে অস্থায়ী রাজ্যপাল জনাব হামিদ আলীর জায়গায় স্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন)—কৃষক-প্রজাদলের জনাব আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। রংপুরের কংগ্রেসী নেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী, ও সিলেটের ব্রীফলেস্ ব্যারিস্টার জনাব আবদুল হামিদকে নিয়ে জনাব সরকার তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

কিন্তু এই নতুন মন্ত্রিসভার তিন দিনও অতিবাহিত হয়নি—২২শে জুন শেখ মুজিবর রহমান জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। ১৫৬—১৪২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল। ভোটাভুটির সময় বিধানসভায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হোল—হাতাহাতি, পচা ডিম ছোড়াছুঁড়ি অবাধে চলল।

পরদিন ২৩শে জুন জনাব আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করলেন।

২৫শে জুন প্রেসিডেন্ট মির্জা পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভাকে সাময়িকভাবে বাতিল করে পূর্ব-বঙ্গে গভর্নরের শাসন চালু করলেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজনীতি ঘোরাল হয়ে উঠছিল। ৯ই মে সকালে পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব তাঁর ঘরে বসে প্রভাতী সংবাদপত্র পাঠ করছিলেন সেই সময় আতা মহম্মদ নামে ৩৮ বছর বয়স্ক একজন যুবক ছুরিকাঘাত করে তাঁকে হত্যা করল। আতা মহম্মদ এই ঘটনার কিছুদিন আগে সরকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিল—সে নাকি চাকরিতে তাকে পুনর্বহাল করার দাবী নিয়ে ডাঃ খান সাহেবের কাছে এসেছিল। যদিও পঞ্জাব পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ঘোষণা করল যে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা নেই, তবুও পাকিস্তানে এবং বিদেশেও অনেকের ধারণা যে এটি একটি রাজনৈতিক খুন। এ সময় পশ্চিম-পাকিস্তানে শীর্ষস্থানীয় বহু নেতাই তাঁদের হত্যা করবার

ভীতি প্রদর্শন করে বেনামী চিঠি পেতে লাগলেন। তাঁরা প্রাণভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট আবছুল কায়ুম খান এ সময় সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন। জনাব শহীদ সোহরাবর্দীর সঙ্গে সর্বদা একজন পাঠান দেহরক্ষীকে দেখা যেত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এ সময় প্রেসিডেণ্ট মির্জাকে জানালেন যে তাঁদের গোপন সংবাদ অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন নেতাদের অনেককে হত্যা করবার একটা ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে। প্রেসিডেণ্ট মির্জা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিলেন। নয়াদিল্লীর পুলিশ শহরের একটি সরাইখানায় হানা দিয়ে কয়েকজন পাকিস্তানীকে গ্রেফতার করল। এদের কাছে বহু ছোরা ও লাইসেন্সহীন পিস্তল পাওয়া গেল। এরা কোন পাশপোর্ট ভিসা ছাড়াই বে-আইনীভাবে ভারতে এসেছিল।

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্টের শাসন চালু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবী উত্থাপন করলেন যে পরিষদীয় গণতন্ত্র অবিলম্বে পুনপ্রতিষ্ঠিত হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

মুসলিম লীগ সভাপতি খান আবছুল কায়ুম খান প্রেসিডেণ্ট মির্জাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে যদি সাধারণ নির্বাচন শীগগিরই অনুষ্ঠিত না হয়, তবে দেশে তাঁরা রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাবেন।

জনাব সোহরাবর্দী ৬ই জুলাই, ১৯৫৮, নারায়ণগঞ্জে একটি জনসভায় বললেন: 'আজাদী লাভের পর ১১ বছরের মধ্যে ভারতে হুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানে নির্বাচনের কোন চিহ্নই নেই।'

অবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হোল। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান মুন ঘোষণা করলেন যে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন

করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী আওয়ামী নেতা জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর মন্ত্রিসভা—(১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে এটি পূর্ব-বঙ্গের নবম মন্ত্রিসভা)—গঠন করলেন।

এই মন্ত্রিসভা গঠন ও গভর্নরের শাসন প্রত্যাহার করে নেবার আগে প্রধানমন্ত্রী নুনের পরামর্শে প্রাদেশিক গভর্নর জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ পরিষদীয় বিভিন্ন দল নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন তাঁদের সমর্থকদের সশরীরে রাজভবনে হাজির করে দলগত শক্তির প্রমাণ দেন। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন।

এদিকে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব-পাকিস্তান বিধান সভায় এমন একটি লজ্জাকর ও শোচনীয় ঘটনা ঘটলো যা পাকিস্তানে পরিষদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে দিল।

পূর্ব-পাকিস্তান ক্ষমতাসীন আওয়ামী দল বিধানসভার স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। জনাব হাকিম স্পীকার নির্বাচিত হবার আগে কৃষক-শ্রমিক পার্টিভুক্ত একজন রাজনীতিবিদ্ ছিলেন, কিন্তু আওয়ামী নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে স্পীকারের নিরপেক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি নির্লজ্জভাবে বিরোধী দল কৃষক প্রজা-পার্টির হয়ে পক্ষপাতিত্ব করে যাচ্ছেন। বিরোধী দল কৃষক-প্রজা-পার্টিও কৃত সংকল্প হলেন যে তাঁরা বিধানসভায় এমন বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করবেন যাতে অ্যাসেম্বলীর কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং পূর্ব-বঙ্গে প্রেসিডেন্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিধানসভার অধিবেশন বসলো। পবিত্র কোরান থেকে অংশবিশেষ পাঠ করবার পর সভার কাজ সুরু হোল। স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন সকলে উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি তাকে সম্মান প্রদর্শনও করলেন।

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভা-কক্ষের আবহাওয়া উত্তপ্ত

হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ দলের জনাব হাশেমুদ্দিন আহমদ ছ-জন আওয়ামী সদস্যের প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে তাঁদের সভাগৃহে থাকবার কোন অধিকার নেই—তাই স্পীকারের অবিলম্বে তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া উচিত। আসল ঘটনা হোল এই ছ-জন আওয়ামী সদস্য সরকারী উকিল বা পাবলিক প্রসিকিউটর-এর পদে কর্মরত ছিলেন বলে নির্বাচনী কমিশন তাঁদের নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জনাব শহীদ সোহরাবর্দীর পীড়া-পীড়িতে প্রধানমন্ত্রী জনাব ফিরোজ খান নুন একটি অর্ডিনান্স জারী করে নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেন এবং উপরোক্ত ছ-জন আওয়ামী নেতাকে পূর্ব-পাকিস্তানে বিধানসভায় তাঁদের সদস্য-পদে পুনর্বহাল করেন।

জনাব সোহরাবর্দীর কথা না মেনে জনাব নুনের কোন উপায়ান্তর ছিল না, কারণ কেন্দ্রীয় পরিষদে সোহরাবর্দীর প্রভাবাধীন আওয়ামী সদস্যরা যদি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতেন তবে নুন-মন্ত্রিসভার তৎক্ষণাৎ পতন ঘটতো। যাই হোক স্পীকার জনাব আবতুল হাকিম বললেন যে তিনি ২৩শে, সেপ্টেম্বর জনাব হাশেমুদ্দিন আহমদ যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন সে বিষয়ে তাঁর রুলিং দেবেন।

কিন্তু স্পীকার যখন এই ঘোষণা করছিলেন সে সময় বিধানসভায় প্রচণ্ড হৈ-চৈ সুরু হয়ে গেল। স্পীকার কয়েকজন সদস্যকে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে সমানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগলেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্য জনাব দেওয়ান মেহবুব আলি অকস্মাৎ স্পীকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। কিন্তু স্পীকার আবতুল হাকিম তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল সদস্য ক্রুদ্ধভাবে স্পীকারের আসনের দিকে ধাবিত হলেন—তাঁরা উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন যে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে অতএব

কালবিলম্ব না করে জনাব হাকিমকে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে বিধানসভার কর্মচারীরা স্পীকারকে রক্ষা করতে সমবেতভাবে এগিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গে সদস্যদের হাতাহাতি সুরু হয়ে গেল। বিধানসভার মধ্যে যেন দাঙ্গা বেঁধে গেল। হাতের সামনে যে-যা পেলেন পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন—যেমন চেয়ার, টেবিল, স্পীকারের দণ্ড, কালির দোয়াত ইত্যাদি। মাইকগুলিকে বিধানসভার যুযুধান সদস্যরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করলেন না। শেখ মুজিবর রহমান এই সংঘর্ষে আহত হলেন। পরে দেখা গেল যে বিধানসভার ভেতরের এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় বহু বহিরাগত অংশ নিয়েছে। তাদের কেউ কেউ দর্শকদের গ্যালারি থেকে আর বাকীরা বাইরে থেকে এসে বিবাদমান সদস্যদের সঙ্গে মিশে গেছে।

বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়ে স্পীকার আবদুল হাকিম সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী স্পীকারের আসনের দিকে এগিয়ে এলেন কিন্তু পরে কি ভেবে তিনি আর অগ্রসর হলেন না—তিনি মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সভার কাজ চালাতে লাগলেন। কংগ্রেস সদস্য শ্রী পিটার পল গোমেজ স্পীকার আবদুল হাকিমকে 'বদ্ধ উন্মাদ' ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব আনিলেন—অধিকাংশ সদস্যর ভোটে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হোল। এর পরেই ডেপুটি স্পীকার যখন ঘোষণা করলেন যে বিধান সভা পরদিন বেলা চারটার সময় আবার বসবে তখন প্রচণ্ড কোলাহলে সভাকক্ষ আবার ফেটে পড়ল। ফরিদপুরের স্বনামখ্যাত জননেতা কৃষক-প্রজা দলের জনাব ইয়ুসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া নামে বেশী পরিচিত) জনাব শাহেদ আলির দিকে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকার-তরফের সদস্যরা জনাব মোহন মিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মোহন মিয়া সাহেব টাল সামলাতে না পেরে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে একটি চার্জশীট দাখিল করলেন—এতে জনাব হাকিম সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হোল।

পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বর স্পীকারের প্যানেলভুক্ত সৈয়দ আজিজুল হক সভার কাজ পরিচালনা করলেন—সেদিন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার দুজনেই ছিলেন অনুপস্থিত। বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে যতদিন না তাঁরা একজন নতুন স্পীকার নির্বাচিত করতে সক্ষম হবেন ততদিন স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম ও ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী কেউই অ্যাসেম্বলী-তে আসবেন না। কিন্তু সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও বিরোধী পক্ষ কৃষক-প্রজা-পার্টি নতুন স্পীকার নির্বাচন বিষয়ে মতৈক্যে আসতে ব্যর্থ হলো। তাঁরা এখন ২৩শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনের জন্য আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হতে লাগলো। বিরোধী কৃষক-প্রজা-পার্টি তাদের দলীয় শক্তি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলো যে আপাততঃ বিধান সভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কোন আশা নেই। তাই তারা স্থির করলো যে ২৩শে তারিখে বিধানসভায় তারা এমন তুলকালাম অবস্থার সৃষ্টি করবে যে সাংবিধানিক সংকটের সৃষ্টি হবে এবং প্রেসিডেন্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। তাদের আওয়ামী বিদ্বেষ এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তারা আওয়ামী দলের গভর্নমেন্টের চেয়ে প্রেসিডেন্টের শাসন শ্রেয়তর মনে করেছিল।

কৃষক-প্রজা দল তাদের একটি গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিল যে প্রথমেই তারা স্পীকারের আসন গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে তাদের সংগ্রামের সূত্রপাত করবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের পরিস্থিতি থমথমে হয়ে উঠল। বিধান সভায় সেদিন কি হয় সবারই মুখে এই একই কথা। শহরের সাধারণ মানুষের চোখে মুখে উদ্বেগের সুস্পষ্ট চিহ্ন। বিধানসভার প্রাঙ্গণে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস্-এর পঞ্চাশ জন সৈনিক-কে ও

তাদের অফিসারদের তৈরী রাখা হোল। এ ছাড়া ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ইসমাইল সাহেব (ইনি আবুল হাসানত নামে কয়েকটি যৌন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকের সুপরিচিত লেখক)-কে সতর্ক করে দেওয়া হোল যে প্রয়োজন হলে যেন মুহূর্তের মধ্যে যেন পুলিশী বাহিনী এগিয়ে আসে।

বেলা তিনটের সময় বিধান সভার অধিবেশন বসলো। নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি। সেদিন বাইরের কোন দর্শককে ভেতরে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলি সাংবাদিকদের ভীতি প্রদর্শন করছিলেন—তাই তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করবার অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ঢাকার প্রেস ক্লাবে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে স্থির করেছিলেন যে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিধানসভার অধিবেশন তাঁরা বয়কট করবেন। তাই সেদিন ঢাকা বিধানসভার প্রেস গ্যালারি ছিল শূন্য।

বেলা ঠিক চারটের সময়ে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী সভাকক্ষে প্রবেশ করে স্পীকারের আসনে উপবেশন করলেন। সরকারপক্ষ তাঁকে সেদিনের অধিবেশনের সভাপতি বা Acting Speaker হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। জনাব মোহন মিয়া, নানা মিয়া, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুল মতিন, গোলাম সারোয়ার, মহম্মদ-উন-নবী চৌধুরী প্রভৃতি বিরোধী দলীয় সদস্যরা সমস্বরে দাবী জানালেন যে জনাব শাহেদ আলী যেন কালবিলম্ব না করে স্পীকারের আসন ত্যাগ করেন। প্রাক্তন কৃষক-প্রজা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে তিনি তাঁর সব স্থৈর্য ও ভদ্রতাবোধ হারিয়ে ডেপুটি স্পীকারের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে উঠলেন: 'আপনি যদি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না যান তবে

করে জনাব হামিতুল হক চৌধুরী-কে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। অথচ সে সময় অর্থমন্ত্রী ছিলেন সৈয়দ আমজাদ আলী। আলী সাহেব ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যানাডার মনট্রিলে কমনওয়েলথ্ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাঁর দফতরেরও কোন পরিবর্তন করা হোল না অর্থাৎ সে সময় পাকিস্তানের একই সঙ্গে দু-জন অর্থমন্ত্রী!

৭ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নুন দু-বার তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে নতুন করে গড়লেন—সেদিন তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের এক নিদারুণ সঙ্কটাকীর্ণ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। এক সত্যিকারের ক্রাইসিস্। একই দিনে দু-দুবার মন্ত্রিসভার রদবদল করে জনাব নুন সাময়িকভাবে বিপদকে ঠেকা দিলেন মাত্র, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।

৭ই অক্টোবর কয়েকজন আওয়ামী সদস্যকে মন্ত্রিসভায় নেবার জন্য জনাব নুন-কে প্রথমে তাঁর ক্যাবিনেট 'reshuffle' করতে হোল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নুন সেদিনই কয়েকঘণ্টার মধ্যে যে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তাতে আওয়ামী সদস্যরা বাদ পড়লেন। আওয়ামী লীগ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তারা নুন মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলো না, কারণ তাদের গভীর আশঙ্কা হোল যে নুন মন্ত্রিসভারও যদি পতন ঘটে তবে তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটবে।

প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার মির্জা ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় নুন-মন্ত্রিসভার নব-নিযুক্ত সদস্যদের আপ্যায়ণের জন্য তাঁর করাচী বাসভবনে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। পার্টি বেশ জমে উঠেছিল—নানা তরল পানীয়ের মদিরায় সমবেত অতিথিরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে উঠছিল—রাজধানী করাচীর জন-কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছিল—পথে শুধু নিশাচরীদের আনাগোনা। কিন্তু অতিথিদের ঘরে ফেরার কোন তাড়াই যেন নেই। তাঁরা তখন নতুন করে তাঁদের পানপাত্র পূর্ণ করতে ব্যস্ত। প্রেসিডেণ্ট মির্জা কিন্তু

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন—ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন তাঁরা অন্যান্যদের, যাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন একদিন-কা-উজির, একরকম টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলেন।

সেদিনই মধ্য রাত্রি অতিক্রম হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক যান-বাহন ও মিলিটারি বুটের আওয়াজ ঢাকা ও করাচীর সুপ্তিমগ্ন রজনীর নিস্তব্ধতাকে অকস্মাৎ খান খান করে ভেঙ্গে দিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রের দফতরের রাতজাগা কর্মচারীরা হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁদের সামনে সামরিক অফিসাররা দাঁড়িয়ে পরদিন প্রভাতী সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করবার জন্য এক বিশেষ বিষয়বস্তু তাঁদের দিচ্ছেন। মুসলিম লীগ ও ঐ একই গোষ্ঠির কয়েকটি দল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থার নেতাদের নিদ্রা ভঙ্গ করলেন মিলিটারি অফিসাররা—তাঁদের বাড়িতে করল তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাশী। কিন্তু কেন এই তল্লাশী তা তাঁদের কাছে খুলে কেউ বললেন না, এমন কি তাঁদের টেলিফোনও গৃহস্বামীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হোল না। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর তাঁদের কেউ কেউ ভাবলেন যে বোধহয় প্রেসিডেন্টের শাসন চালু হয়েছে—তাই পুলিশ ও মিলিটারি কর্তৃপক্ষের এত তৎপরতা।

কিন্তু ৭ই অক্টোবরের নিশাবসানের পর যখন ৮ই অক্টোবরের প্রভাতী সূর্যের উদয় হোল তখন চমকিত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেশবাসী দেখলো যে সেদিনের সবচেয়ে বড় চাঞ্চল্যকর সংবাদ হোল: 'MARTIAL LAW PROCLAIMED THROUGH-OUT PAKISTAN'—সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে।

অর্থাৎ দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা আর নেই-গণতন্ত্রও আর নেই।

প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা শুধু সামরিক আইনই দেশের ওপর চাপিয়ে দিলেন না, তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিকে

ভেঙ্গে দিলেন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিলেন।

তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত করলেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের গৃহ-বন্দী করে রাখা হোল এবং পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশই হলেন কারারুদ্ধ। পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর G. O. C. মেজর জেনারেল উমরাও খান এ অঞ্চলের মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হলেন। সেই কুখ্যাত সিভিলিয়ন (প্রাক্তন I. C. S.) জনাব আজিজ আহ্‌মেদ যিনি পূর্ব-বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী থাকার সময় সদর্পে বলেছিলেন 'চীফ মিনিস্টার বুঝি না—আমিই গভর্নমেণ্ট' সেই ব্যুরোক্রেটটি হলেন কেন্দ্রের ডেপুটি চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

৮ই অক্টোবর সকাল থেকেই ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের বাইরে একটি নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে লেখা ছিল যে একমাত্র সাদা ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠান যাবে অর্থাৎ কেন কোডে টেলিগ্রাম পাঠান চলবে না। ঢাকা-কলকাতা টেলিফোন লাইনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হোল। বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রের যে প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে ছিলেন তাঁরা বেশ কয়েকদিন চুপ-চাপ বসে রইলেন কারণ ভারতে কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠানর উপায় তাঁদের ছিল না। চিঠিপত্রের ওপর কঠোর censorship বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল।

সামরিক শাসনের দাপট সুরু হয়ে গেছে। এই সময় ৮ই অক্টোবর খুব ভোরে একটি ছোট নৌকা ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মির্জাপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি খালের ধারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। তখন আকাশে ছিল পেঁজা তুলোর মত শরৎকালীন মেঘ, আবহাওয়ায় শারদ-স্নিগ্ধতার আমেজ আর বইছিল মৃদুমন্দ শরৎ-সমীরণ। নৌকার ছইর ভেতরে লুঙ্গি ও খদ্দরের জামা

পরিহিত শুভ্র পক্ককেশ ও শ্মশ্রু-মণ্ডিত ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধ পশ্চিমাভিমুখী হয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। ইনি পূর্ব-বঙ্গের ও একদা আসামের কৃষক আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সূর্য আরেকটু উঠলো, বেলা আরেকটু বাড়ল, খালের নিস্তরঙ্গ জলের ওপর রবির কণক-কিরণ চিকচিক করতে লাগল। মির্জাপুরে রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহার অতিথি-ভবন থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক মৌলানা ভাসানী সহ সন্তর্পণে নৌকায় এসে উঠলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জনাব সৌকত আলী খান। ইনি একজন ব্যারিস্টার ও একটি বর্ধিষ্ণু জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইনি মৌলানা ভাসানীকে পীর-জ্ঞানে ভক্তি করতেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভাসানীর মত সৎ ও আদর্শবান মুসলমান রাজনীতিবিদ পাকিস্তানে আর দ্বিতীয় নেই। জনাব সৌকত আলী তাঁর গুরুকে এক ঝুড়ি ফল দিলেন। মৌলানা ভাসানীর শরীর সে সময় ভাল যাচ্ছিল না—তিনি উচ্চ রক্তচাপে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি নৌকা-বিহার করে খানিকটা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ লাভ করার প্রয়াস পেতেন। এর পরে আরও কয়েক ব্যক্তি এলেন। তাঁরা দেশে সামরিক শাসনের সংবাদ মৌলানার গোচরীভূত করলেন। তাদের গভীর আশঙ্কা হোল যে ইস্কান্দার মির্জার মিলিটারী সরকার হয়ত অচিরেই ভাসানীকে গ্রেফতার করবে—তাই তাঁরা মৌলানাকে আত্মগোপন করবার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু নির্ভীক ও তেজী এই বৃদ্ধ গণনেতা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন যে মিলিটারীর ভয়ে তিনি ভীত নন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। মৌলানা তাঁর স্বাভাবিক আবেগের সঙ্গে আরও বললেন: 'আমি আত্মগোপন করব কার থেকে—দেশের মানুষের থেকে? তা কখনই হতে পারে না—আমি তার চেয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অনেক বেশী শ্রেয় মনে করি।' মৌলানার কথা শেষ হয়নি এমন সময় একদল

পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করল। ভাসানীকে প্রথমে কিছুদিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হোল—তারপরে ধানমণ্ডীতে একটি বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ব্যাপক পুলিশ প্রহরার মধ্যে তিনি হলেন গৃহবন্দী।

পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের একটি সুপার-কনস্টেলেশান বিমান ৭ই অক্টোবর রাত্রে করাচী ছেড়ে সারা রাত ধরে উড়ে ৮ই ভোরে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে এসে নামলো। এই বিমানটির যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তিনি আগের দিন সন্ধ্যায় করাচীতে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের নৈশ-পার্টিতে যোগ দিয়ে ঢাকায় ফিরলেন।

P. I. A.-এর এই সুপার কনস্টেলেশানটির যাত্রীরা ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রি-তে যখন করাচী বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল তার বিন্দুবিসর্গও আঁচ করতে পারেননি। প্লেনটি যখন তেজগাঁও-এ অবতরণ করলো তখন যাত্রীরা লক্ষ্য করলেন যে বিমান-ঘাঁটি সেনা পরিবেষ্টিত। শেখ মুজিবরের কয়েকজন সহকর্মী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন—তাঁরা বিমর্ষ-বদনে শেখ সাহেবকে সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র দেখালেন। শেখ মুজিবর সামরিক আইনের খবর পেয়ে হতবাক হয়ে পড়লেন—কিছুক্ষণ তাঁর বাক্য স্ফুরণ হোল না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠবার পর শেখ মুজিবরের আশঙ্কা হোল যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ হবার আগে তিনি তাঁর নিকট পরিজনদের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষী হলেন—তিনি কালবিলম্ব না করে ফরিদপুর জেলায় তাঁর স্বগ্রাম গোপালগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পাকিস্তানে যে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হতে পারে একথা দেশের সাধারণ মানুষ কেন—ঝানু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও পূর্বাহ্ণে

অনুমান করতে পারেননি। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট মির্জা অকল্পনীয় গোপনতা অবলম্বন করেছিলেন—সেই সঙ্গে তিনি কিছুটা নাটকীয় পরিবেশেরও অবতারণা করেছিলেন সন্দেহ নেই। মার্শাল ল জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, ৭ই অক্টোবর রাত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে করাচী, লাহোর ও ঢাকার রাজপথে মিলিটারীর টহল দিতে সুরু করার আদেশ বিভিন্ন সামরিক দফতরে চলে গেছে—এক কথায় সামরিক শাসন চালু করবার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন নেহাত কৌতুকভরেই সেদিনই অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মির্জা জনাব ফিরোজ খান নুনের ছুটি মন্ত্রিসভাকে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শপথ গ্রহণ করালেন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় নব-নিযুক্ত মন্ত্রিদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য জমজমাট এক পার্টির আয়োজন করলেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনে প্রেসিডেন্ট মির্জার প্রধান সহায়ক ও সহযোগী জেনারেল আয়ুব খান নিজেও নাকি ৭ই অক্টোবর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জানতেন না যে ঠিক সেদিনই মার্শাল ল জারী করা হবে যদিও প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ঢাকায় প্রেস্ ট্রাস্ট্ অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীজ্যোতি সেনগুপ্ত, জনাব শহীদ সোহরাবর্দী, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী প্রভৃতি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা পাকিস্তানে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ প্রবর্তিত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে কি ভাবছেন। তাঁরা কিন্তু এ ধরনের কোন সম্ভাবনার কথা উড়িয়েই দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে সবাইকে দেশের শাসনতন্ত্র মেনে চলতে হবে এবং সে শাসনতন্ত্রে 'মিলিটারি ডিকটেটরশিপে'র কোন স্থান নেই।

পাকিস্তানে মার্শাল ল জারী হবার অল্প-কদিন আগেই ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে সেনাবাহিনী শাসনক্ষমতা দখল করেছিল—কিন্তু সে সময় পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি গণতন্ত্র বাতিল করে এ ধরনের মিলিটারী ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠার নিন্দাবাদে মুখর

হয়ে উঠেছিলেন। তাই নিজেদের দেশে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি দিলেও তাঁরা পাকিস্তানে সত্যিসত্যিই যে কখনও মার্শাল ল আসতে পারে একথা ভাবতে পারেনি।

আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানে সামরিক শাসন নির্বাধেই এসেছিল—অন্ততঃ ঠিক সে সময় মার্শাল ল-র বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন প্রকাশ্য বিক্ষোভ দেখা যায়নি। প্রেসিডেণ্ট মির্জা সোল্লাসে বললেন: পাকিস্তানে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জেনারেল আয়ুব খান বললেন: দেশে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল কিন্তু একটা বন্দুকও ছুঁড়তে হোল না। কিন্তু কয়েকের মধ্যেই লণ্ডনের ডেইলি মেলে-র পাকিস্তান-স্থিত সংবাদ-দাতা একটি বিশেষ ডেসপ্যাচে জানালেন যে ক্ষমতা দখল করো (Seize power) জেনারেল আয়ুবের এই আদেশ পালন করতে অপারগ হবার অপরাধে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর কয়েকজন অফিসার-কে তিনি গুলি করে হত্যা করার আদেশ দেন। এই অফিসাররা মূলত দুটি কারণে জেনারেল আয়ুবের Seize power আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন—(১) তাঁরা রাজনীতিতে সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপ সুনজরে দেখেননি, (২) প্রেসিডেণ্ট মির্জার কতৃত্বে ও আধিপত্যে এ ধরনের কোন পরিবর্তন আসুক এ তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাঁদের ইচ্ছা ছিল যে মির্জার মত দূর্নীতিগ্রস্ত ও জনপ্রিয়তা-হীন ব্যক্তিকেও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিতাড়িত করা উচিত।

বেলুচিস্তানের অগ্রগণ্য নেতা সর্দার আতাউল্লা খান অভিযোগ করলেন যে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হবার সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১৫০০০ জওয়ান বালুচ-দের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে—রাইফেল ও কামান দাগা, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ ইত্যাদি নৃশংস কোন পন্থা অবলম্বন করতেই তারা পেছপাও হয়নি। ফলে অসংখ্য ব্যক্তি প্রাণ হারায় এবং গ্রেফতার করা হয় শত শত ব্যক্তিকে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবীর পক্ষে লড়াই করে আসছিলেন—যে কোন ধরনের এক নায়কতন্ত্রের তাঁরা ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং দেশে আকস্মিক সামরিক শাসনের অভ্যুদয় তাঁদের শঙ্কিত ও হতাশ করে তুলল। তাঁরা অনুমান করলেন সামরিক শাসনে প্রদেশের কোন অধিকারই রক্ষিত হবে না, বরঞ্চ সামরিক শাসনের মাধ্যমে পূর্ব-বঙ্গের উপর পশ্চিমাঞ্চলের বজ্রমুষ্টি আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। প্রগতিশীল যে কোন মতবাদ বা রাজনৈতিক সংগঠনকে ধ্বংস করবার আপ্রাণ চেষ্টা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক চক্র করবে :

পাকিস্তানের নয়া সামরিক প্রশাসন একাধিক সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিদের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, আবুল মনসুর আহম্মদ, আবদুল খালেক প্রমুখ প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তানী কেন্দ্রীর উজিররা।

ঢাকায় কয়েকজন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকেও গ্রেফতার করা হোল। এঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব আসগর আলী শাহ, সি. এস. পি (শিল্প দফতরের সেক্রেটারী), জনাব আমিনুল ইসলাম সি. এস. পি (বাণিজ্য দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারী), জনাব এম. এ. জব্বর (পূর্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার)।

পশ্চিম-পাকিস্তানে পাখতুন-নেতা খান আবদুল গফফার খান এবং পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান কারারুদ্ধ হলেন।

মার্শাল-ল প্রশাসনে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রধান সহযোগী হলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের অফিসার-রা।

পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর জনাব সুলতান-উদ্দিন আহমেদ-কে অপসারণ করা হোল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জেনারেল আয়ুব খানের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি জনাব জাকির হোসেন। জনাব সুলতান-উদ্দিন

আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি আওয়ামী দলের সমর্থক এবং জনাব শহীদ সোহ্‌রাবর্দীর সঙ্গে তাঁর বড় দোস্তি।

পুলিশের ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল জনাব ইসমাইল-কে দীর্ঘ ছুটি নিতে বাধ্য করা হোল—জনাব আনওয়ারুল হক (ইনি পরে আয়ুব ক্যাবিনেটে শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আয়ুবশাহীর শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নতুন আই-জি নিযুক্ত হলেন।

চীফ-সেক্রেটারী জনাব আজিজ আহমেদ তাঁর বাঙালী-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী নানা কীর্তিকলাপের ইনাম হিসাবে ডেপুটি চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিসট্রেটরের পদ লাভ করে করাচী চলে গেলেন—ঢাকায় নতুন চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন জনাব মহম্মদ আজফর—ইনি বিহার থেকে আসা একজন প্রাক্তন I. C. S.

ফৌজী শাসনের প্রথম পর্যায়ে শাসকচক্র শুধু কঠোর নয়—অতি কঠোর নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। প্রেসের উপর চাপানো হোল নির্মম সেনসরশিপ—যার নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করলে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাত বছরের মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতো। রাজনৈতিক দলের নেতারা হয় অন্তরীণ হলেন, নয়তো গেলেন কারাবাসে—অনেকে আত্মগোপন করলেন। বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গের কারাগারগুলি আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ছাত্র ও যুব কর্মী দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। রেহাই পেলেন মুসলিম লীগ ও এ দলের নেতারা। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে জনাব গোলাম মহম্মদ ১৯৫৩ সালে পদচ্যুত করার পর থেকে তিনি অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। সামরিক শাসনের সুযোগে তিনি আবার কেউ-কেটা হবার ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগলেন।

মুসলিম লীগের আরেকজন নিষ্ঠাবান কর্মী জনাব নুরুল আমিন (পূর্ব-বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) ফৌজি শাসন-কে কোনভাবেই সমর্থন করতে পারলেন না—এমন কি পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হবার একটি অফারও তিনি নাকি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মার্শাল ল প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোল। সাময়িকভাবে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম কমলো। রাস্তায় সামান্য এক টুকরো কাগজ ফেলবার অপরাধে সাত বছর কারাদণ্ড দেবার নির্দেশ দেওয়া হোল। সাময়িকভাবে পথঘাটের চেহারা পরিচ্ছন্ন হোল। সাধারণ মানুষও সাময়িকভাবে ফৌজী কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতায় সপ্রশংস হোল—কিন্তু সবই হোল ঐ সাময়িকভাবেই। কদিনের মধ্যেই আবার সব পুনর্মূষিকোভব !!

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৮ প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দর মির্জা ১২ জন ব্যক্তির একটি মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে ক্রমে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে আসবার এ হোল প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এই মন্ত্রিসভার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান। তিনি সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষের পদেও বহাল রইলেন এবং কাশ্মীর ও প্রতিরক্ষা দফতরের ভার পেলেন।

আপাত দৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্ট মির্জাই এ সময়ে পাকিস্তানের সর্বেসর্বা, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যাঁদের তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে প্রেসিডেণ্ট মির্জার মনে নাকি শান্তির লেশমাত্র ছিল না—তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতি সেনাবাহিনীর কোন আনুগত্য নেই। কাজেই তাঁর পক্ষে কোন ফৌজী প্রশাসনের কর্ণধার হয়ে দীর্ঘ দিন রাজত্ব চালানো সম্ভব নয়। তাই তিনি নাকি যত শীঘ্র সম্ভব মার্শাল ল উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তন করার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। ৭ই অক্টোবর ফৌজী শাসন চালু হবার মাত্র দু-দিন পরেই অর্থাৎ ৯ই অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট মির্জা নাকি পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে দেখা করে নানা রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য কৌতূহলী বন্ধুদের তিনি বলেছিলেন

যে মালিক নুন তাঁর মেয়ের বিয়েদিতে লাহোরে চলে যাচ্ছিলেন—তাই তাঁর আশীর্বাদ জানাতে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এ সময় পাকিস্তানে লণ্ডনের ডেইলি মেলে-র বিশেষ প্রতিনিধি প্রেসিডেণ্ট মির্জা ও জেনারেল আয়ুব তুজনেরই সঙ্গেই দেখা করে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তিনি লণ্ডনে পাঠানো একটি বিশেষ বার্তায় জানালেন: আমার অনুমান যে মির্জা আর বেশীদিন প্রেসিডেণ্ট থাকছেন না। আয়ুব খানের হাতেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং প্রেসিডেণ্ট মির্জার উচ্ছেদ আসন্ন প্রায়।

ঝানু এই ব্রিটিশ সাংবাদিকটির পূর্বাভাষ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

২৭শে অক্টোবর সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান ও তাঁর মন্ত্রিসভা প্রেসিডেণ্ট মির্জার কাছে শপথ গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিকদের সামনে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে অনেক হাসি ঠাট্টা হোল, তু-জনে বেশ প্রসন্ন বদনে বিদেশী চলচ্চিত্র ও টেলিভিসনের ক্যামেরায় ছবি তুললেন। প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দর মির্জা তখনও জানতেন না যে সেদিনই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চরমতম তুর্দৈব ঘনিয়ে আসছে। মাত্র তু-ঘণ্টা পরেই জেনারেল আয়ুব এক সশস্ত্র পরোয়ানা পাঠালেন প্রেসিডেণ্ট মির্জার কাছে। তিনি অতি সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রেসিডেণ্টকে জানিয়ে দিলেন যে পাকিস্তানের তক্ত-তাউসে একসঙ্গে তু-জন ব্যক্তির কোন স্থান নেই। এ ছাড়া জেনারেল আয়ুব প্রেসিডেণ্টের কাছে পাঠালেন একটি ঘোষণাপত্র—সঙ্গে হুকুমনামা যে এটি অবিলম্বে দস্তখত করতে হবে। বিবৃতি এমনভাবে রচিত হয়েছিল যে এতে প্রেসিডেণ্ট মির্জা যেন ঘোষণা করছেন যে তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে স্বেচ্ছায় প্রেসিডেণ্টের গদি ত্যাগ করলেন কারণ দেশে ও বিদেশে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি ও জেনারেল আয়ুব হয়ত রাষ্ট্রের

নানা ব্যাপারে সর্বদা একমত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করতে সক্ষম হবেন না—তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর মতে দেশের পক্ষে এ ধরনের যৌথ নেতৃত্ব বিপদজনক।

জেনারেল আয়ুব খান পৃথক একটি বিবৃতিতে বললেন যে প্রেসিডেন্ট মির্জার বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত এবং প্রেসিডেন্ট যা করলেন তা পাকিস্তানের পক্ষে শুভকরই হবে।

জেনারেল আয়ুব খান সেদিনই গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা ও তাঁর বেগম সাহেবা-কে বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে পাঠিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে সেনা-পরিবৃত কোয়েটার সার্কিট হাউসে তাঁরা প্রায় বন্দী হয়ে রইলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা সম্পর্কে নানা গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি নাকি অসদুপায়ে অর্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের নানা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত করেছেন। যে-সব পন্থায় তিনি এ অর্থ উপার্জন করেছিলেন সে বিষয়ে বলা হোল যে বিদেশ থেকে পাকিস্তানের জন্য প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করে তার ওপর তিনি 'দালালী' বা 'ব্রোকারেজ' আদায় করতেন। 'দালালী'র টাকাটা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা পড়তো। এছাড়া তিনি নাকি বিভিন্ন প্রতিরক্ষা চুক্তিতে পাকিস্তান-কে আবদ্ধ করে উৎকোচ হিসেবে এ সব চুক্তির প্রণেতা ও উদ্যোক্তা পাশ্চাত্য শক্তিগুলির থেকে অপরিমিত অর্থ নিতেন। জেনারেল মির্জা চিরদিনের মত পাকিস্তান ত্যাগ করে লণ্ডনে চলে যান—তিনি এখনও সেখানে বসবাস করছেন, কিন্তু জেনারেল আয়ুব দ্বারা তাঁর বিতাড়ণ-পর্ব সম্পর্কে তিনি কখনও মুখ খোলেননি। শোনা যায় জেনারেল আয়ুব ইসকান্দার মির্জাকে কড়া হুমকি দিয়েছিলেন যে তিনি যদি পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে চিরতরে বিদায় না নেন বা কখনও ঘুণাক্ষরেও আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে কিছু উচ্চারণ করেন তবে তাঁর নানা কীর্তি-কলাপের কথা তিনি ফাঁস করে দেবেন।

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবরের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে—অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার মির্জার বিদায় ও সেখানে জেনারেল আয়ুব খানের প্রবেশের নাটকীয় পরিস্থিতিকে—ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু পাকিস্তানের রাজনীতির 'আমূল পরিবর্তন' (a hundred percent change in Pakistan) বলে বর্ণনা করেছিলেন।

পণ্ডিত নেহেরু যথার্থ উক্তিই করেছিলেন নিঃসন্দেহে—১৯৫৮-র অক্টোবর থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ মাস পর্যন্ত এই দশ বছর পাঁচ মাস-ব্যাপী আয়ুব-শাহী পাকিস্তানের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তনের যুগ—যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫৮-র ২৭শে অক্টোবর ফৌজী-সেনাপতি আয়ুব খানের সে দেশের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনীতিতে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে।

সামরিক সমর্থনে শক্তিশালী মদমত্ত জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ও স্থল-জল ও বিমান-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা সুপ্রীম কমাণ্ডার বলে ঘোষণা করলেন। সেনাবাহিনীতে তাঁর অতি বিশ্বস্ত অফিসার লেফটানেণ্ট-জেনারেল মুসাকে তিনি প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদে উন্নীত করলেন। যদিও সিনিওরিটির দিক দিয়ে মুসা অন্যান্য কয়েকজন জেনারেল-এর নীচে ছিলেন। নিজের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ ও সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সেনাবাহিনীতে তাঁর সহকর্মী উচ্চপদস্থ বহু অফিসারকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। যে তরুণ অফিসার জেনারেল আয়ুবের হয়ে এই সামরিক 'ক্যু'-র পরিকল্পনা করেছিলেন সেই বিশ্বস্ত ব্রিগেডিয়ার ফজলুলের ওপরও তাঁর খড়্গহস্ত নেমে এলো। সান্ত্বনা-হিসেবে তাঁদের নামের আগে লেফটানেণ্ট-জেনারেল বা মেজর-জেনারেল পদবী ব্যবহারের অনুমতি আয়ুব দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেককে কোন আধা-সরকারী কমিশন বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান-এর মত নির্বিরোধী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

কয়েকজনকে রাষ্ট্রদূতের পদ দিয়ে একেবারে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব আরও ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্রপতিই হবেন দেশের শাসন-ব্যবস্থার কর্ণধার—ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ হবে বিলুপ্ত। ২৭শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মির্জা যাঁদের মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের নিয়েই প্রেসিডেন্ট আয়ুব একদিন পরে অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রিসভায় পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী যাঁরা স্থান পেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জনাব আবুল কাশিম খান, জনাব হবিবুর রহমান, জনাব হাফিজুর রহমান ও মৌলভী মহম্মদ ইব্রাহিম।

এর পরই নয়া প্রেসিডেন্টের প্রধান কাজ হোল পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা যাতে দূর-ভবিষ্যতেও আর কোনদিন তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন। তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলিকে যে শুধু নিষিদ্ধ করে দিলেন তাই নয়, সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা এবং ছাত্র বা শ্রমিকদের ধর্মঘট করার সমস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করে নিলেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি ছাড়া সংবাদপত্রে পাক-রাজনীতির সমস্ত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। যে কোন ধরনের ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের শিল্প-পতি এবং তাঁদের বিদেশী মুরব্বীরা প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সুশাসনের ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। পশ্চিমী দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলি আয়ুবের নয়া জমানার প্রশস্তিতে হয়ে উঠলেন পঞ্চমুখ। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ৭ই নভেম্বর নয়া দিল্লীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন: পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্র-মহল যেভাবে পাকিস্তানের বর্তমান ঘটনাবলীকে সে দেশের 'জনগণের মুক্তি' বলে চিত্রিত করবার চেষ্টা করছে তা রাজনীতির দিক থেকে শুধু বিস্ময়করই নয়, গুরুত্বব্যঞ্জকও বটে।

সামরিক বাহিনী আদ্যোপান্ত 'পার্জ' বা ছাঁটাই এবং নিজের বশংবদ ও ব্যক্তিত্ব-বিহীন অফিসারদের দ্বারা আমূল পুর্ণবিন্যাস করেও

প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের ক্ষমতা-চ্যুতির আতঙ্ক দূর হোল না। মোগল আমলের বাদশাহরা যেমন সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যে রাজধানী স্থাপন করে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতেন তিনিও তেমনি করাচী থেকে রাজধানী পাকিস্তানের ফৌজী হেড কোয়ার্টার্স পঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করলেন এবং সামরিক সদর-দফতরের কাছাকাছি অবস্থান করে পাক-ফৌজের ওপর নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করলেন। প্রায় ৬৩ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের তিন বছরের বার্ষিক বাজেটের সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে পাকিস্তানের নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। ধর্মপ্রাণ সরল মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই নতুন রাজধানীর নাম হোল ইসলামাবাদ। বলাই বাহুল্য পঞ্জাবের বুকে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় পঞ্জাবী ফৌজী-বাহিনী, আমলাতন্ত্র, ধনবান ভূস্বামী-গোষ্ঠী ও পুঁজিপতিরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন এবং নয়া প্রেসিডেণ্টকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। একথা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্জাবী-চক্রকে তুষ্ট করা ও রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করার পেছনে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সাড়ম্বরে প্রচার করেছিলেন যে রাওয়ালপিণ্ডির আবহাওয়া অত্যন্ত প্রীতিপদ—তাই তিনি রাজধানী সেখানে সরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু কোন পাকিস্তানী বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানী সে কথা বিশ্বাস করেননি। বরঞ্চ পূর্ব-বঙ্গে ব্যাপক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল—সেখানকার ক্ষুব্ধ মানুষ বললেন যেহেতু পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন নাগরিক পূর্ব-পাকিস্তানের বাসিন্দা সেহেতু ঢাকা শহরেই পাকিস্তানের নয়া রাজধানী স্থাপিত হওয়া উচিত। আয়ুব ক্যাবিনেটের বাঙালী মন্ত্রী ডঃ ইব্রাহিম—(ইনি একসময় ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন)—

রাওয়ালপিণ্ডিতে রাজধানী স্থানান্তিকরণের তীব্র বিরোধিতা করে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন।

এর বেশ কয়েক বছর পরে নানা বৈষম্য ও অবিচার বিক্ষুব্ধ পূর্ব-পাকিস্তানীদের কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়ের কাহিনীতে এখনও আমি আসিনি কিন্তু রাজধানী প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন এ ব্যাপারে আগে-ভাগেই কিছু তথ্য জানানো হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পূর্ত ও কৃষি উজির—জনাব শামসুদ্দোহা (পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন ইনস্‌পেকটর জেনারেল অব পুলিশ ছিলেন ও দেশ বিভাগের ঠিক আগে ছিলেন কলকাতায় পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার) ইসলামাবাদে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে ঢাকা শহরের সন্নিকটে পাকিস্তানের যে দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে উঠছে তার নামকরণ করা হবে আয়ুবনগর।

জনাব দোহা আরও জানান যে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণের কাজ সুরু হওয়ার পরই এর নাম আয়ুব-নগর বা আয়ুবাবাদ কি রাখা যায় সে প্রশ্ন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এ প্রস্তাব অনুমোদন করার পূর্বে নাকি লজ্জারুণ বদনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের এ নামে কোন আপত্তি নেই তো? অতঃপর প্রেসিডেণ্ট সাহেবের অনুরোধে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা কাউন্সিলগুলি আয়ুব-নগর নামকরণের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে—সারা প্রদেশ জুড়েও নাকি এ প্রস্তাব গণ-সমাদর লাভ করেছিল, অভিনন্দিত হয়েছিল। এর পরে অবশ্য প্রস্তাবটির পিছনে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ সমর্থন

প্রতিফলিত হয়েছে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মহামান্য প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

কিন্তু দোহা সাহেব ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের পদলেহীদের বলগাহীন চাটুবাদ সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা এই ছিল যে নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় রাজধানীর আয়ুব-নগর নামকরণে পূর্ব-বঙ্গের জনমনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল—এই নামের বিরোধিতা করে পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

একটি নজির স্বরূপ ঢাকার ইত্তেহাদুল ওলামার মত একটি কট্টর ঐসলামিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব জুলফিকার আহমদ কিসমতীর একটি পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ('আবার আয়ুব-নগর'—দৈনিক সংবাদ ৭ই জুলাই, ১৯৬৭) : 'পূর্ব-পাকিস্তানীরা সাধারণভাবে আয়ুব-নগর প্রস্তাবের প্রতি অভিনন্দন জানানো তো দূরের কথা, তাঁরা এই প্রস্তাবকে খোশামোদে মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলে ধিকৃকৃত করেছেন।'

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা একটি বিবৃতি প্রচার করে বলেন যে পূর্ব-বঙ্গের মানুষ যেখানে দীর্ঘ দিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছে যে জনদরদী নেতা পরলোকগত ফজলুল হক সাহেবের স্মৃতিতে দ্বিতীয় রাজধানীর নামাঙ্কিত হোক, সেখানে আয়ুব-নগর নামটি অতীব দুঃখজনক।

এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র-লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনওয়ার উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলীম লীগ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম প্রভৃতি পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা দ্বিতীয় রাজধানীর আয়ুব-নগর নামকরণ পূর্ব-পাকিস্তান বাসীরা বিশেষ করে ঢাকার নাগরিকরা সানন্দে সম্মতি জানিয়েছেন—জনাব দোহার এই উক্তিকে অবিশ্বাস্য এক প্রলাপোক্তি বলে মন্তব্য করেন। তাঁরা আরো বলেন : জনাব দোহা সম্ভবতঃ বিস্মৃত হয়েছেন যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের

লেজুড়ধারী মন্ত্রিসভা ও বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের কুক্ষিগত পৌর কর্তৃপক্ষ যখন আয়ুব-নগর নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন প্রদেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণের ব্যাপারে প্রদেশবাসীর মতামত কিছুমাত্র যাচাই করা হয়নি—বরঞ্চ তা পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এক শ্রেণীর নির্লজ্জ চাটুকার তাদের প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট হলেও তাদের প্রচেষ্টার পিছনে বিন্দুমাত্রও জনসমর্থন নেই।

বিভিন্ন বিরোধী দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত P. D. M. (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ম্যুভমেণ্ট)-এর নেতারা এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের ইচ্ছা ও দাবী অনুসারেই এ নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রচার করে উজির-সাহেব তাঁর স্বদেশবাসীকে যে ভাবে বিদ্রূপ করেছেন তাতে তাঁরা কর্তৃপক্ষকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামে যখন দেশে কোন শহরের নাম রাখা হয়নি তখন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের নামে দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ চরম ধৃষ্টতারই পরিচায়ক।

ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "পূর্বদেশের" 'কালপেঁচার ডায়েরী'-তে লেখক 'বকলম' সুতীব্র ব্যঙ্গাত্মক একটি সরস রচনাতে আয়ুব-নগরের কেচ্ছা-কাহিনী বিবৃত করেন: 'আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, পাছে তিনি রাজী না হন।'

'তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, ঢাকা শহরের বুকে ঢাক পিটাইয়া আমরা (আমরা আবার কে, নিমিত্ত মাত্র) অর্থাৎ তিনি যে দ্বিতীয় রাজধানী পত্তন করিয়াছেন তাহার নাম তিনি নিজের নামানুসারে রাখিতে রাজী হইয়াছেন। এহেন সুখের সংবাদ আর সম্ভব নহে। আমাদের সত্যই ভয় হইয়াছিল, হয়ত চক্ষুলজ্জার চোটে তিনি ইহাতে রাজী হইবেন না। হয়ত ভাবিবেন, লোকে কি বলিবে। নিজের হাতে সবচাইতে বড় খেতাবটা বানাইয়া নিজেই পরিয়াছেন। নয়া

রাজধানী ইসলামাবাদে এক বিশাল স্বর্গীয় উদ্যানের নামও নিজ নামেই হইয়াছে, আবার আর-একটা গোটা শহরই তাঁহার নামে হইবে—ইহা হয়ত তিনি চাহিতে ইতস্ততঃ বোধ করিবেন।

ইতস্ততঃ বোধ করিয়াছেন। একেবারে না করিলেও অত্যন্ত খারাপ দেখায়। ইতস্ততঃ করিয়াছেন, বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—লোকে কিছু বলিবে না ত?

আমরা কহিয়াছি—না হুজুর, বলিবে না। এবং পূর্ব-পাকিস্তানের বেবাক লোক আপনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, আপনি কখন রাজী হইয়া যান তাহা শুনিতে। পূর্ব-পাকিস্তানের লোকেরা অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের এই সাধের রাজধানী—জন্মজন্মের সাধনার ফল, শেষে না নামহীন হইয়া শুধু দ্বিতীয় রাজধানী হইয়া থাকিয়া যায়।

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কি করিয়া বোঝ যে সকল পূর্ব-পাকিস্তানই আমার নামে ঐ শহরের নাম রাখিতে চায়!

ইহার জবাব দেওয়া সহজ হয় নাই। আল্লাহ্‌র কুদরত। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি একটি প্রস্তাব একসময় কোনক্রমে পাস করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাই প্রমাণ হিসাবে পেশ করিলাম। কহিলাম—এই যে হুজুর একখানা জবরদস্ত প্রমাণ। এই যে বেসিক ডেমোক্রেসীর লোকেরা প্রস্তাব পাস করিয়াছে, দেখুন।

হুজুর তো বেসিক ডেমোক্রেসীর বাপজান, তিনি খুব খুশী হইলেন এবং প্রমাণ গ্রহণ করিলেন এবং রাজী হইলেন।

রাজী হইয়াও একেবারে মচকাইলেন না। কহিলেন—প্রজা সাধারণের কাছে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা খুশী কিনা।

আমরা কহিলাম—খুশী, হুজুর। খুশী।

হুজুর কহিলেন—তোমরা যে খুশী তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তাহারাও যে খুশী তাহা জানিতে চাহি।

জানিতে চাওয়া কিছু অসম্ভব কর্ম নহে। কিন্তু যদি

মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে এই প্রমাণের জন্য যাচাই করিতে হয়, তাহা হইলে জান এবং কাপড়চোপড় খারাপ হইয়া যাইতে পারে।'

সে সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সুধী-সমাবেশে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল: অতঃপর পাকিস্তানের নামও কি আয়ুবীস্তানে রূপান্তরিত হবে?

শুধু রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে আর রাজনৈতিক কর্মীদের বন্দী করেই প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কোন স্তরের নির্বাচনে বিরোধী কোন দল বা নেতা যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে আয়ুব-শাহীকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে তার জন্য প্রেসিডেন্ট 'পোডো' (Public Office Disqualification Order—PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order—EBDO) জারী করে পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের 'রাজনৈতিক জবাই' করার ব্যবস্থা করলেন। এই দুটি আদেশের দ্বারা পাকিস্তানের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হবার বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হবার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হোল। প্রেসিডেন্ট আয়ুব ধরেই নিয়েছিলেন যে ১৯৬৬ সালের মধ্যে পাকিস্তানের বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিবিদ-দের মধ্যে অনেকে বয়সের স্বাভাবিক ধর্মে পরলোক-গমন করবেন। বাস্তবে হয়েও ছিল তাই। পূর্ব-পাকিস্তানের জনাব শহীদ সোহরাবর্দী, জনাব ফজলুল হক, মৌলবী তমিজুদ্দিন খান (করাচীতে জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার), প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলী ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মিয়া ইফতিকার উদ্দিন, রাজা গজনফার আলী খান ১৯৬৬ সালের আগেই ইন্তেকাল করলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রীরা প্রায় সবাই PODO ও EBDOর কবলে পড়ে "Political Outcast"-এ বা "রাজনৈতিক

অচ্ছুতে" পর্যবসিত হলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মূলতঃ অভিযোগ ছিল : জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি। কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে কোন দিনও দুর্নীতির অপবাদ কেউ দিতে পারেননি এমন ব্যক্তিরাও বিশেষ করে তিনি যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে থাকেন, আয়ুবের আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না। যেমন সিলেটের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কংগ্রেস-নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস।

দেশ শাসনের জন্য কোন না কোন শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। ১৯৫৮-র অক্টোবরে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা দখল করার সাড়ে-তিন বছর পর ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ আয়ুব খান তাঁর শাসনতন্ত্র দেশকে উপহার দিলেন। গণতন্ত্রের নিয়ম এই যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়, কিন্তু আয়ুবতন্ত্রের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এই যে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতাসীন আয়ুবের নির্দেশে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। এই শাসনতন্ত্র বা আয়ুবতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কোন প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়নি, পাকিস্তানের জনমত ও তার প্রতিনিধি-স্বরূপ কোন রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বাধীন মত উপস্থিত করার কোন সুযোগ পায়নি। আয়ুবের নির্দেশে আয়ুবতন্ত্রের কাঠামো খাড়া করার জন্য যে-এক অদ্ভুত স্ববিরোধী দলিল তৈরী করা হয়—তাই হোল আয়ুবের শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র বা কনস্টিটিউশন প্রণীত হবার পূর্বেই অবশ্য তিনি আর এক 'শাসনতান্ত্রিক' কৌশলে নিজেকেই নিজে 'আইনানুগ প্রেসিডেন্ট' করে ফেলেছিলেন। বে-আইনী ভাবে ক্ষমতা দখলের পর তিনি হুকুমনামা জারি করে (Basic Democracies Order—1959) পাকিস্তানে তথাকথিত 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' বা 'মৌলিক গণতন্ত্র' (বেসিক ডেমোক্র্যাসি) প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর তাঁর স্বেচ্ছামত অর্ডিনান্সের ভিত্তিতে নির্বাচিত "বুনিয়াদি গণতন্ত্রী"দের দ্বারা আয়ুব নিজেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করালেন। এইভাবে নিজে

আইন বানিয়ে সেই নিজের আইনেই আয়ুব খান হলেন আইনানুগ প্রেসিডেন্ট।

আইনানুগ প্রেসিডেন্ট হবার ফলে আইনের শাসন বিস্তৃত করার ঝোঁক আয়ুবের আরো বেড়ে গেল। দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দেবার ঘোষণা করলেন তিনি। কিন্তু এ বিষয়ে দেশবাসীর বা তাদের প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়াটা তাঁর কাছে অবান্তর কর্তব্য মনে হয়েছিল। তিনি সদম্ভে বলেছিলেন : ১৩০০ বছরের ইতিহাসে মুসলিমরা যা করে উঠতে পারেনি তিনি তা করতে দেবেন না— সংক্ষেপে সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার চলবে না। আয়ুব খান সুবিধেমত ভুলে গেলেন যে তিনি যে এরোপ্লেনে এদেশ-ওদেশ করেন বা ট্রেনে-মোটরে চড়েন বা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তাঁর অমূল্যবাণী ছড়িয়ে দেন তাও কিন্তু মানবসমাজের ইতিহাসে মুসলিমদের অবদান নয়। তাই তাঁর সবই চলতে পারে, কিন্তু বাতিল হোল অবশ্য গণতন্ত্রই শুধু।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই ছদ্মবেশী গণতন্ত্রে বা বুনিয়াদি গণতন্ত্রে দশ-পনেরো হাজার জনসংখ্যা নিয়ে এক একটি নির্বাচন-কেন্দ্র গঠিত হোল এবং একজনের এক ভোটের ভিত্তিতে এক-একটি নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে দশ-বারো জন মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা হোল। এই দশ-বারো জন মৌলিক গণতন্ত্রীকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হোল। এভাবে নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলি গঠন করবে জেলা কাউন্সিল। তাছাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের মৌলিক গণতন্ত্রীরা নির্বাচন করবে প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলী এবং কেন্দ্রের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী এবং প্রেসিডেন্ট। এই ইউনিয়ন কাউন্সিলের ৩০ শতাংশ সভ্য মনোনীত হবেন সরকার অর্থাৎ আয়ুব খানের দ্বারা। পাকিস্তানের এক-একটি ভূখণ্ডে চল্লিশ হাজার করে (১৯৭০ সালের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের জন্য এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ষাট হাজার করা হয়েছিল) বুনিয়াদি গণতন্ত্রী বা ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত

হবেন। বুনিয়াদি গণতন্ত্রীরা সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হবে বলা হলেও মহাজন-জোতদারদের প্রভাবে এইটুকুমাত্র ভোটাধিকারও নিজের ইচ্ছায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে গ্রামের জোতদার-মহাজন শ্রেণীর ব্যক্তি বা তাদের বশংবদ মানুষেরাই এই অভিনব গণতন্ত্রে সাধারণতঃ নির্বাচিত হন মৌল গণতন্ত্রী বা ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য এবং তাদেরই ভোটে প্রাদেশিক ও জাতীয় কাউন্সিলে প্রতিক্রিয়াশীলদের আসার পথ নির্বিঘ্ন ছিল এবং আরও নির্বিঘ্ন ছিল আয়ুব খানের প্রেসিডেন্টগিরি। বেসিক ডেমোক্র্যাসি বা বুনিয়াদি গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের নামে একটি ভাঁওতা তা ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আয়ুব খান ও কায়েদ-এ-আজমের ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ্-র নির্বাচন-দ্বন্দ্বের সময় বেশ বোঝা গিয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আলোচিত হবে। আয়ুব খানের নয়া শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অবসান ঘটার কোন কারণ ঘটেনি। মুসলিম লীগের যে সব ধনী নেতারা পাকিস্তান শাসন করতেন তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন বড় আমলারা, বড় মিলিটারী অফিসাররা এবং ধনী শিল্প-পতিরা—যাঁদের জন্মসূত্রে জমিদারদের সঙ্গে গভীর বন্ধন। আয়ুবের শাসনতন্ত্র বরং এই অবস্থাকে আরো জোরদার করে তুলল। এই শাসনতন্ত্রের চরিত্রটি কি ?

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই নতুন শাসনতন্ত্রে ফরমান দেওয়া হোল যে রাষ্ট্রপতি-কে মুসলমান হতেই হবে এবং রাষ্ট্রশাসনে যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হবেন সেই রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টই হবেন দেশের সর্বেসর্বা। কেন্দ্রে তিনি শাসন করবেন মন্ত্রিসভার সাহায্যে, যে মন্ত্রিসভা তিনি নিয়োগ করবেন নিজেই এবং তাঁরই নিযুক্ত রাজ্যপালেরা পূর্ব এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে শাসন করবেন।

রাষ্ট্রের সব খরচের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। মৌলিক গণতন্ত্রীরা জাতীয় পরিষদ গঠন করবেন কিন্তু রাষ্ট্রপতির বাজেট বা অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিলে তাঁদের কোন বক্তব্য থাকবে না। এক কথায় আয়ুবের

শাসন আর্থিক ব্যাপারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদ বা বিধান পরিষদকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন করে দিয়েছিল।

প্রেসিডেণ্টের সম্মতি না পেলে জাতীয় পরিষদে পাস হলেও কোন বিধি আইন রূপে গণ্য হবে না। প্রেসিডেণ্টের অসম্মতি (Veto) সত্ত্বেও অবশ্য বিধান পরিষদের তিন-চতুর্থাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিধিটি পাস হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রেও এটি আইনরূপে স্বীকৃত হবে এমন কোন কথা নেই। প্রেসিডেণ্ট আবার সেই বিতর্কিত বিধিটি রেফারেণ্ডাম বা গণভোটে পাঠাতে পারেন। সেই রেফারেনডাম বা গণভোট কিন্তু সর্বসাধারণের প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ভোট নয়—গণভোট নেওয়া হবে দেশের উভয় অংশের ৮০ হাজার (পরে ১ লক্ষ ২০ হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে। আয়ুবের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেবার অধিকারও রাষ্ট্রপতির—সে ক্ষেত্রে তিনি অর্ডিনান্স জারী করে দেশ শাসন করতে পারেন! আগেই বলেছি যে রাষ্ট্রপতি-কে নির্বাচন করবেন মৌল গণতন্ত্রীরা পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্যে তাঁকে সরাতে হলে যে আইনগত কাঠ-খড় পোড়াতে হবে তাতে মৌলিক গণতন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতিকে সরানো প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

আয়ুবের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, কোনো আইনসভা নিজের শাসনতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করে কোন আইন প্রণয়ন করেছে কিনা একথা বিচার করার অধিকার বিচার-বিভাগের নেই। এর ফলে কেন্দ্র থেকে যে কোন আইন যে-কোন সময়ে পূর্ব-পকিস্তানের ওপর নিক্ষেপ করা যেতে পারে, পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের যে-কোন আইন অস্বীকৃত হতে পারে কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষে তার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হবার অধিকার নেই। দ্বিতীয়তঃ আয়ুবের শাসনতন্ত্রে এও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে কোন কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে প্রাদেশিক আইনের বিরোধ বা অসঙ্গতি দেখা দিলে প্রাদেশিক আইনটি স্বতঃই নাকচ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রাদেশিক

আইন সভার নিজস্ব ক্ষেত্র বা অধিকার বলে এই অদ্ভুত শাসনতন্ত্রে কিছুই স্বীকৃতি পায়নি। এতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়-ই রাজ্যগুলির ছিল না।

শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে যেমন সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, প্রদেশেও সেই ধারা অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রিত করা হয়েছে প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের হাতে। এই সব গভর্নর বা প্রদেশপাল প্রেসিডেণ্টের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র— জনসাধারণের কেউ নয়। আয়ুবের শাসনতন্ত্রের ৮২নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর বা প্রাদেশিক মন্ত্রি-মণ্ডলীকে বাছাই করে নেবেন এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্বাচনে তাঁরা সর্বশক্তিমান প্রেসিডেণ্টের পরামর্শের দ্বারা চালিত হবেন (shall be guided by the advice of the President)। ফলে প্রদেশের মন্ত্রীদের ওপর প্রাদেশিক পরিষদের কোন ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ তো নেই-ই এমন কি প্রাদেশিক গভর্নরদেরও এ বিষয়ে সত্যিকার কোন ক্ষমতা নেই। প্রেসিডেণ্টের নিযুক্ত কর্মচারী হিসেবে প্রাদেশিক মন্ত্রিনিয়োগে প্রেসিডেণ্টের হুকুম তাঁদের মেনে চলতে হবে।

আয়ুব শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আয়ুবশাহীর যোগ্য ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এক মুখে বলা হয়েছে যে তাদের সব অধিকার সমান আবার সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে কোন অমুসলমান পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হতে পারবে না। এর মধ্যে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তাতে আয়ুব-শাহীর কিছু আসে যায় না। কারণ হাতে যদি ডাণ্ডা থাকে তাহলে যুক্তির ভুলে কিবা আসে যায়? বস্তুত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এই ধারাটি শাসনতন্ত্রে প্রবিষ্ট করার কোন দরকার ছিল না কারণ সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানের মোট জন-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগেরও কম এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে তারা নেই-ই। যা আছে প্রায় সবই পূর্ব-পাকিস্তানে। সুতরাং একজন সংখ্যালঘুর পক্ষে পাক-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব-ই।

তবু যে এরকম একটি অপমানজনক ধারা শাসনতন্ত্রে প্রবিষ্ট করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে আয়ুব-শাহী রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের জনজীবনে সংখ্যালঘুদের স্বাভাবিক অংশগ্রহণ অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছিল। যেহেতু সংখ্যালঘু বলতে মূলতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদেরই বোঝায়, সেই হেতু এইভাবে সংখ্যা-লঘুদের হেয় ও অধিকার-বঞ্চিত রেখে আয়ুব-শাহী পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি অসম্ভব করে তুলতে চেয়েছিল। আর চেয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানকে আত্মকলহে জীর্ণ ও অধিকারবঞ্চিত করে রাখতে।

আয়ুবের শাসনতন্ত্রের আলোচনা থেকে এটা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র আয়ুব খানের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। জনগণের অধিকারকে কতভাবে অস্বীকার করা যায়, এটি তার একটি জীবন্ত দলিল। আয়ুবের শাসনতন্ত্রে আর যাই থাকুক এতে মৌলিক অধিকার বা fundamental rights বলে কিছু নেই—অন্ততঃ সেগুলি আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। 'আইন প্রণয়নের নীতি' বলে কিছু কিছু স্বাধীনতার কথা এই শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে কিন্তু সেগুলি সদিচ্ছার অভিব্যক্তিমাত্র। কারণ সে-সব স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে নাগরিকদের আদালতের দ্বারস্থ হবার অধিকার নেই। এর ওপর আবার শাসনতন্ত্রের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের কোন সংস্থা বা নিযুক্ত ব্যক্তির কোন কাজ রাষ্ট্রের নীতিসঙ্গত হয়েছে কিনা তা স্থির করবে সেই সংস্থা অথবা ব্যক্তি। এর ফলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের এবং সকল স্তরের সরকারী কর্মচারীদের তাদের নিম্নস্থ ব্যক্তিদের ওপর অবাধ-আধিপত্য ফলানোর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সরকারী কর্মচারী বা মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাজ অন্যায় বা বিধি-বহির্ভূত হয়েছে কিনা তা স্থির করবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবার কোন অধিকার নীচের লোকদের নেই।

বস্তুতঃ, এই রাষ্ট্রাদর্শ ফ্যাসিজমের বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিস্তরাই প্রচার করেছিল যে নীচের থেকে উর্ধ্বতলের নিয়ন্ত্রণ চলবে না। ওপর থেকে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ফ্যুয়েরার (রাষ্ট্রপ্রধান) হিটলার বা দ্যুচে (নেতা) মুসোলিনি হবেন সকল নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে। তাঁর নিজস্ব শাসনতন্ত্রে আয়ুব যা হয়েছিলেন। আয়ুবের শাসনতন্ত্রের উদ্ভবের যেটুকু ইতিহাস আমরা দেখেছি তা থেকেই বোঝা যায় যে জনমতের ধার এ শাসনতন্ত্র ধারেনি। আয়ুবের কাছে তাঁর শাসনটাই সত্য। শাসনতন্ত্রটা মায়া।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের একনায়কত্ব তাঁর একচ্ছত্র শাসনের আওতায় কয়েক বছরের মধ্যেই এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল যেখানে 'সবার উপর আয়ুব সত্য তাহার উপর নাই' এ ধরনের এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল বলতে পারা যায়। ১৯৬৬ সালের শেষে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব জাতীয় পরিষদে তাঁর একান্ত বশংবদ মৌল গণতন্ত্রী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এমন-এক আজব বিধি পাশ করিয়ে নিলেন যার তুলনা বিশ্বের যে-কোন ধরনের শাসনতন্ত্রে বিরল।

এ অশ্রুতপূর্ব বিধি অনুযায়ী জাতীয় পরিষদে প্রেসিডেণ্ট যে ভাষণ দেবেন সে সম্পর্কে সদস্যরা কোন আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক বা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন না। ঢাকার জনপ্রিয় দৈনিক 'সংবাদ' এ বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'জাতীয় পরিষদে মৌন থাকিয়া প্রেসিডেণ্টের ভাষণ শুনিতে হইবে এবং শুনিয়া মৌন থাকিতে হইবে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর অধিবেশনে সরকার-পক্ষীয় সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন:

'আপনারা এ ধরনের বিধি প্রণয়ন করে আমাদের দেশের প্রেসিডেণ্টকে সমগ্র বিশ্বের হাসির খোরাক বানিয়ে তুলছেন।'

এই বিধির বিপক্ষে বিরোধীদলের সব যুক্তি-তর্ক নস্যাৎ করে

দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সরকারপক্ষের রথী-মহারথীরা সাফাই গাইলেন যে মহামান্য প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা বা বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। কেন নেই তার এক মনোরম যুক্তিও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের মতে যেহেতু সরকারের পলিসি নিয়ে সাধারণভাবে পরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠানের সুযোগ আছে সেহেতু অধিবেশনের প্রাক্কালে নীতি-নির্ধারণের ফিরিস্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট যে ভাষণ দেন তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যুক্তিটি অভিনবত্বে ভরা সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের বর্তমান বুনিয়াদি গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্টই সর্বক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক। তাঁর দ্বারা নিযুক্ত মন্ত্রীদের—যাঁদের পাকিস্তানে নিছক 'ভূঁইফোড়'-মাত্র বলে গণ্য করা হয়—তিনি ব্যক্তিগত মর্জিমত নিয়োগ করেন, আবার বরখাস্তও করেন, এবং তাঁরা বিশ্বস্ত কিন্তু সন্ত্রস্ত হুকুম-বরদারের মত প্রেসিডেন্টের নীতি কার্যকর করেন মাত্র। এই তথাকথিত মন্ত্রি-মণ্ডলী জাতীয় পরিষদ বা জনসাধারণ কারো কাছেই দায়ী নন—দায়ী একমাত্র পাক-ভাগ্য-বিধাতা প্রেসিডেন্টের কাছে।

পশ্চিম পাকিস্তান 'ন্যাপ'-এর (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) তরুণ নেতা জনাব আরিফ ইফতেকার এই নয়া কানুনটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেন যে প্রেসিডেন্ট মহোদয় নিশ্চয়ই আবহাওয়ার খোঁজ-খবর বলতে পরিষদে হাজির হন না—অতএব তাঁর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা সম্পর্কে আলোচনা বা বিতর্ক অনুষ্ঠান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। জনাব ইফতেকার দৃপ্ত-কণ্ঠে আরও বলেন যে পাকিস্তানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা হিন্দুস্থানের শাপান্ত না করে জলগ্রহণ করেন না, কিন্তু সে শত্রু-ভূমিতেও লোকসভায় রাষ্ট্রপতির এবং প্রতিটি প্রাদেশিক সভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর রীতিমত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তীব্র শ্লেষের সঙ্গে আরিফ ইফতেকার বলেন : কিন্তু আমরা অন্যের অনুকরণ করব কেন? দুনিয়ার যত অগণতান্ত্রিক রীতি-নীতির

সমাবেশে আমাদের দেশের বিধিগুলি অদ্বিতীয় হয়ে না উঠলে পাকিস্তানের মহান বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সার্থকতা রইল কোথায় ?

বলাবাহুল্য গণতন্ত্র-বিরোধী এ বিধিটি পাকিস্তানের সর্ব-মহলে ধিকৃকৃত হয়েছিল।

বিরোধী সদস্য ডাঃ আলীম-আল রাজী জাতীয় পরিষদে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন : 'ইসলাম ও ইসলামী নীতির কথা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মুখে অনবরতই বলে থাকেন—ক্ষমতাসীন উজির ও লাটবাহাদুরদের মুখে তো ইসলামী বয়ান প্রায় তোতা পাখীর বুলিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা কে কতটা ইসলামী আকিদা পালন করে থাকেন সে হিসাব খতিয়ে দেখতে গেলে হয়ত প্রমাণিত হবে যে তাঁদের সমস্ত বাক্যচ্ছটাই ফাঁকা বুলি।'

ডাঃ রাজী ইসলামের ইতিহাস থেকে একটি কাহিনী উপস্থাপন করে বলেন যে বহু শত বছর পূর্বে 'খোলাফায়ে রাশেদিনে'র (অর্থাৎ প্রকৃত খলিফাদের) আমলে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর একদিন নামাজে ইমামতি করতে উঠবেন এমন সময় একজন অতি সাধারণ মুসলমান প্রজা প্রশ্ন করে উঠল 'হে খলিফা, আপনি তো বায়তুল মাল (সরকারী ধনভাণ্ডার) থেকে সামান্য কয়েক দিরহাম বেতন পেয়ে থাকেন—তাহলে এই নতুন সুদৃশ্য কামিজ আপনি তৈরী করালেন কোথা থেকে ?' সামান্য এক বান্দার মুখ থেকে আকস্মিক এই প্রশ্নে সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাতিশয় বিরক্ত হলেন এবং তাঁরা প্রশ্নকর্তাকে ভৎর্সনা করতেও উদ্যত হলেন—কিন্তু খলিফা হজরত ওমর তাঁদের নিবৃত্ত করে বললেন, 'এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর প্রত্যেকটি কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।'

ঢাকার প্রগতিশীল সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ' এই কাহিনীটিই পুনরাবৃত্ত করে 'সমালোচনার অধিকার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন : 'প্রায় চৌদ্দশত বছর আগেও ইসলামী

রাষ্ট্র তার নাগরিককে রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনার যে অধিকার প্রদান করিয়াছিল, আজ এত বছর পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামধারী পাকিস্তানে সেই অধিকার হরণের ঘটনা দেখিয়া শুধু একটি প্রশ্নই আজ আমাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে—সত্যই কি ইসলামী নীতি ও ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পোষণ করি? ইসলাম ও গণতন্ত্র কোন ব্যবস্থা দ্বারাই যাহা স্বীকৃত নয় এমন অভিনব ব্যবস্থাসমূহ যদি ক্ষমতাসীন দল অনবরত পাকিস্তানে প্রচলন করিতে থাকেন তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে একটা কথা বলা সম্ভবতঃ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য—যাহা ভালো নয়, তাহার পরিণতিও কখনো ভাল হইতে পারে না।'

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের জনগণকে রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত ও জাতীয় পরিষদকে ক্ষমতা-বিহীন এক বিতর্ক-ক্লাবে পরিণত করেছিল, কিন্তু আলোচ্য নয়া বিধিটি পরিষদের অভ্যন্তরেও কথা বলার সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও সঙ্কুচিত করে। পরিষদের বাইরে ১৪৪ ধারা ও ভিতরে নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজাল জনমত প্রকাশের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

পাকিস্তানের (বুনিয়াদি) গণতন্ত্রী সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষেরই বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়ে ওঠে, যখন বিরোধী-পক্ষীয় গণনেতা জনাব মতিউর রহমান জাতীয় পরিষদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে নির্ভীককণ্ঠে বলে ওঠেন: 'বর্তমান সরকার জনসমর্থন শূন্য। এই সরকারের শক্তি বন্দুকের নলের মধ্যে নিহিত, কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কালের চাকা অবশ্যই ঘুরবে এবং সে দিন বেশী দূরে নয়।'

আয়ুবের বেসিক ডেমোক্রাসির ভাঁওতায় পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক কোন অধিকার ছিল না বললেই চলে, কিন্তু সে নিতান্ত সীমাবদ্ধ অধিকারটুকুও কিভাবে সঙ্কুচিত করা যায় সে বিষয়ে

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর সুযোগ্য সহচরদের নানা গবেষণা, নানা পরিকল্পনার অন্ত ছিল না। ১৯৬৭ সালে যখন আয়ুব-শাহীর নবম বর্ষ চলছে এবং তাঁর তথাকথিত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন আসতে আরও তিন বছর বাকী তখন পাকিস্তানের নিরক্ষর ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় কিনা তাঁরা সে কথা ভাবতে সুরু করেছিলেন। বলাবাহুল্য এ পরিকল্পনা তাঁরা কার্যে পরিণত করলে পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ ভোট দেবার অধিকার হারাতেন।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নিরক্ষরতা দূর কররার উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের ২৮শে ও ২৯শে মে ঢাকায় সরকারী উদ্যোগে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ আয়োজিত দু-দিন ব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনা-চক্রটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রাদেশিক শিক্ষা-উজির জনাব আমজাদ হোসেন।

আয়ুব-শাহী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে কয়েকটি শব্দ পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী মহলে প্রাধান্য পেয়ে আসছিল তার মধ্যে 'সেমিনার' শব্দটি অন্যতম। এছাড়া অন্য শব্দগুলির মধ্যে পরিকল্পনা, উন্নয়ন, মোহাজের (উদ্বাস্তু), তমুদ্দুন (সংস্কৃতি), প্রগতি, স্থিতিশীল সরকার, মৌলিক গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি, সংখ্যা-সাম্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিছক প্রচারের উদ্দেশ্যে সরকার আয়োজিত সেমিনারগুলিতে যা হয়ে থাকে—গলাভরা আর গালভরা বুলি বর্ষণ—এই নিরক্ষরতা-সেমিনারেও তার অভাব হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তানের ছোট-বড়-মেজো অনেক কর্তাই এই সেমিনারে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আশু প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন, যদিও এসব কথার অনেকগুলিই যে শুধু মুখের কথা—মনের কথা নয় তার বহু আভাস শ্রোতারা পেয়েছিলেন।

রাওয়ালপিণ্ডির নির্দেশে (পিণ্ডির অঙ্গুলি হেলন ছাড়া পাকিস্তানে গাছের পাতাও বোধ হয় নড়ে না) আয়োজিত এসব সেমিনারের

বাক্যচ্ছটার গুরুত্ব প্রায়শঃই একমাত্র সংবাদপত্রের রিপোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা এজাতীয় আলোচনা-চক্রের প্রতি সাধারণতঃ উদাসীন।

আলোচ্য সেমিনারটির বিষয়ে হয়ত একই কথা বলা সম্ভব হোত, কিন্তু কয়েকটি কারণে তা হয়নি।

এই সেমিনারে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন একটি মারাত্মক সুপারিশ করা হয়েছিল অবিলম্বে যার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন বলে শ্রেণী-দল-মত নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানীরা মনে করেছিলেন।

নিরক্ষরতা-সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাবগুলির একটিতে বলা হয়েছিল যে ১৯৭৪/৭৫ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানে নিরক্ষর ব্যক্তিদের ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক। বলা বাহুল্য পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষ এই সর্বনাশা প্রস্তাবটির চরম বিরোধীতা করেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রস্তাবটি যতই মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকুক না কেন এটি তাঁদের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। কেন নিরাপদ নয় সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঢাকার একটি প্রগতিশীল দৈনিক লিখেছিলেন: 'যার মাকে কুমীরে খেয়েছে সে ঢেঁকী দেখলে ভয় পায়, যেমন ভয় পায় ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে।'

'আজ আমাদের দেশে গণতন্ত্র নেই—আছে মৌলিক গণতন্ত্র। সেটা হয়ত ষোল আনা মৌলিক হতে পারে কিন্তু ষোল আনা গণতন্ত্র যে নয় এ কথা আজ আর ব্যাখ্যা করে বলার আবশ্যক নেই। আজ এই ব্যবস্থার ফলে এদেশের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা সব নাবালক কিংবা না-লায়েক হয়ে গেছে। আজ তাঁরা চল্লিশ+চল্লিশ=আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করে দিয়েই ভোট-ক্ষমতা হারিয়ে বসে আছেন। মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক নির্বাসন হয়ে যায়। দেশের এবং দশের ভালমন্দ কিছুই আর করার ক্ষমতা তাদের থাকে না।'

তাই পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠেন এই বলে যে দেশের যখন এই হাল এবং দেশে যখন শতকরা আশি জন লোক এখনও নিরক্ষর তখন আলাদিনের কোন আশ্চর্য প্রদীপের ক্ষমতা বলেও অদূর ভবিষ্যতে সবাইকে স্বাক্ষর করে তোলা আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র—কাজেই এ কথা নিশ্চিত যে যদি নিরক্ষর ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের কোটি-কোটি মানুষ যাঁরা আজ অন্ততঃ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে অধিকারী তাঁদের সে সামান্য ক্ষমতাটুকুও থাকবে না। যে সীমিত ভোটাধিকার আজ তাঁদের আছে আগামী ১৯৭৪ সালের পর তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

পাকিস্তানের মানুষ এ প্রশ্নও তুলেছিলেন যে প্রতিবেশী ভারতে যদি অধিকাংশ লোক স্বাক্ষর না হয়েও সাফল্যের সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তবে তারা নয় কেন? নিরক্ষরদের ভোটাধিকার হরণ করা হোক—এ ধরনের কোন প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা ভারতীয় গণতন্ত্রে কেউ কল্পনা করতে পারেন কি?

পূর্ব-পাকিস্তানের বঞ্চিত ও শোষিত জনতার অন্যতম মুখপত্র সান্ধ্য-দৈনিক 'আওয়াজ' তাদের ১লা জুন, ১৯৬৭ তারিখের সংখ্যায় 'নিরক্ষরতা ও ভোটাধিকার' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে লিখেছিলেন: 'আমরা আগেই বলেছি সেমিনারে আমরা গলাভরা এবং গালভরা কথা বলতে পারি। কিন্তু সেই গালভরা হাওয়াই কথায় আমাদের গাল যতখানি ফোলে, আমাদের দেশ-উন্নয়নের নৌকার পাল ততোখানি ফোলে না। সে পাল ফোলাতে হলে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে যাঁরা দেশ উদ্ধারের বড় বড় কথা বলেন—তাঁদের সকলকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নেমে আসতে হবে। আজ দেশের অবস্থা কি, সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং বাস্তব অবস্থার আলোকে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

'আজ দেশে শিক্ষার অবস্থা চরম শোচনীয়। ছাত্রদের লেখা পড়ার

ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক এবং অভিভাবকের পেটে ভাত নেই। শিক্ষা দানের ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ আজ বিলুপ্তির পথে। পাঠশালা আজ গো-শালায় পর্যবসিত।'

'এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অশিক্ষিতদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করলেই দেশের নিরক্ষরতা শনৈঃ শনৈঃ বিদূরিত হবে না। লাভের মধ্যে বহু কষ্টে রক্ষিত সীমিত ভোটাধিকারটাই হারাতে হবে। ভোটাধিকার হরণ করে নয়—শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক করে শিক্ষালাভের পথকে সহজ-সরল করে এবং সাধ্যায়ত্ব করে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করা হোক এই আমাদের দাবী।'

আগেই বলেছি যে মৌল গণতন্ত্রীদের সংখ্যা পরে ৮০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার করা হয়েছিল—অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রতি অংশে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা ২০ হাজার করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা করা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে ক্ষমতাসীন দল প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগের সুপারিশে একটি বিল পাস করিয়ে।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যসংখ্যাও যথাক্রমে ১৫৬ থেকে ২১৬ এবং ১৫৫ থেকে ২১৫-তে উন্নীত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের মুখপাত্রদের মতে দেশে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ নাকি হয়েছিল এক বিরাট পদক্ষেপ!

অবশ্য এই বিলটি যখন আলোচিত ও গৃহীত হয় সে সময় জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে বিরোধী দলীয় একজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন না। কারণ গত ১লা ডিসেম্বর স্পীকার জনাব আবদুল জব্বার খানের আদেশে বিরোধী তিন জন বিশিষ্ট সদস্য ডাঃ আলিম-আল রাজী, জনাব আবুল কাশেম ও জনাব মোখলেসুজ্জামান খানকে বলপূর্বক পরিষদ কক্ষ থেকে বহিষ্কৃত করার প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন বয়কট করে আসছিলেন।

বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবটিকে গণতন্ত্রের পথে

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও ক্ষমতাসীনদের মহানুভবতার নিদর্শন বলে জোরদার সরকারী প্রচার চলেছিল—আয়ুবের লেজুড় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীরা বলছিলেন যে দেশে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ নাকি এক বিরাট অগ্রগতি। তাঁরা সাফাই গাইছিলেন যে দেশে বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে উপযুক্ত ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য বিলটির দ্বারা তাদের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বাড়ানর ব্যবস্থা হোল—এবং এ ভাবে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটদানের অধিকার দেওয়া হবে। সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে আয়ুবী শাসনতন্ত্রের অধীনে দেশ শাসিত হচ্ছিল প্রায় সাত বছরের মত। সাত বছরে যদি মাত্র ৪০ হাজার অতিরিক্ত ব্যক্তি ভোট দেবার যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন তবে সেই হারে ১২ কোটি মানুষের দেশে সব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার লাভ করতে কত বছর সময় লাগতে পারে তা ভেবে পাকিস্তানের জনসাধারণ বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা : বর্তমান হারে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ চললে সম্ভবতঃ তাঁদের জীবিতকালে কেন, তাঁদের বংশধররাও তাঁদের জীবনে দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারবেন না। অতএব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে বলেছিলেন : প্রকৃত অবস্থা গণতন্ত্রের পথে বিরাট পদক্ষেপের ঠিক বিপরীত—বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্প্রসারণ নয়, গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর দাবীকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই এই বিলটির মূল অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে এটি একটি বিরাট ধোঁকা!

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ বিলটি নিয়ে যতই বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করে থাকুন না কেন, তাঁদের প্রচারের ধূম্রজাল ভেদ করে থলে থেকে কালো বিড়ালটি বের হয়ে পড়েছিল। বুনিয়াদি গণতন্ত্রী তথা নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির আপাত নির্দোষ ব্যবস্থার পিছনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের মতলব হাসিলের যে সুগভীর চক্রান্ত

ছিল জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সহকারী-নেতা শাহ আজিজুর রহমান তা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ এনেছিলেন যে পঞ্জাবীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির দাবী পূরণের জন্যই বেসিক-ডেমোক্রাট ও পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারের এ ব্যস্ততা।

জনাব রহমান দাবী জানান যে পশ্চিম-পাকিস্তানের ভিতর পঞ্জাব যদি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্ধিত প্রতিনিধিত্ব লাভ করে, তা হলেও পূর্ব-পাকিস্তানও সংখ্যা সদস্যর নীতি বাতিল করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৫৬টি আসন দাবী করতে পারে। বর্তমান এক ইউনিট-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় পঞ্জাবী কায়েমী-স্বার্থের দৌরাত্ম্যে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় নাভিশ্বাস উঠেছে। এর উপর পঞ্জাবীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলে তার পরিণতি যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য এর ফলাফল শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের মৌলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না—সারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিলটিকে গণতন্ত্রের নামে তামাশা বলে অভিহিত করেন। সুতীব্র মন্তব্য করে তিনি বলেন: বিষাক্ত পিঠার সঙ্গে আরও বিষ মিশিয়ে দেওয়া হোল। মিয়া দৌলতানার মন্তব্যটির মর্ম অনুধাবন করতে হলে মৌলিক গণতন্ত্রী তথা মৌলিক গণতন্ত্রের উপর দৃষ্টিপাত করা দরকার।

মৌলিক গণতন্ত্র কথাটি শুনতে যতখানি গণতন্ত্র বলে মনে হোক না কেন, তা যে গণতন্ত্র নয়—তা পাকিস্তানবাসীরা কয়েক বছরের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন। নানা ধাপে নানা নামে বিভক্ত হতে হতে সারা পাকিস্তানে মাত্র ৮০ হাজার মানুষের উপর দেশ

শাসনের ভার দেওয়ার মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা তাঁদের অনেকের কাছেই গণতন্ত্রের নামে প্রকাণ্ড এক ভাঁওতা। আর এই ভাঁওতাবাজীর ঘুঁটি হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ৪০—৪০ করে যে ৮০ হাজার মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছিল তারাই মৌলিক গণতন্ত্রী। কিন্তু পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রশ্ন: এটাই কি গণতন্ত্র? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাকিস্তানের জনসাধারণ সমালোচনা-মুখর হয়ে মন্তব্য করতেন: মৌলিক গণতন্ত্র, গণতন্ত্র হোক বা নাই হোক এযে বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি অর্থাৎ আয়ুব-শাহীর একটি মৌলিক অধিকার ও মৌলিক আবেদন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ দেশের এগার-বারো কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মাত্র ৮০ হাজার ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আজ শাসন-ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান একবার ঢাকার এক জনসভায় মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি সুন্দর সংজ্ঞা ও সুন্দরতর উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে মৌলিক গণতন্ত্রের নীচের দিকটা বহুবচন এবং উপরের অংশটি একবচন—ঠিক যেন পাজামা। নীচে দুটি অংশ কিন্তু উপরে এসে তারা একটি অংশে পরিণত হয়েছে।

ঢাকার সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ মৌলিক গণতন্ত্রের তামাশা শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেন: 'এ দেশের মানুষ যা চায় তা হোল পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্র দেশের শাসনভার দেশবাসীর হাতে অর্পণ করে, যে গণতন্ত্র দেশের মানুষকে দেশের প্রকৃত মালিকে পরিণত করে। এর কম কোন কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হবে না—এর কম কোন কিছুই তারা চায় না। বহুবার বহুভাবে তারা গণতন্ত্রের এই দাবী পেশ করেছে, করছে এবং করবে। এই দাবীর জন্য তারা অকাতরে জেল জুলুম সহ্য করেছে এবং করবে। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ গণতন্ত্রের দাবী থেকে তারা বিচ্যুত হবে না—

আর হবে না বলেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে তারা তামাশা বলেই মনে করে।'

দেশে আবার গণতান্ত্রিক প্রথা—নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক প্রথা চালু করার পূর্বে আয়ুব খান যে কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজ করা দরকার মনে করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হোল ভূমিসংস্কার যেটা নিয়ে তিনি খুবই নিজের ঢাক নিজেই পেটান। যারা চাষে উৎসাহী বা নিজেরা চাষ করবে তাদের হাতে জমি দেওয়ার যে নীতি আয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন তা হোল এইরকম: পশ্চিম-পাকিস্তানে জায়গীরদারি বা জমিদারী প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে উচ্চতম ভূমি মালিকানা বা সিলিং তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেচযুক্ত জমিতে ৫০০ একর, আর সেচবিহীন জমিতে ১০০০ একর। ৫০০ বা ১০০০ একর জমির মালিকানা সৃষ্টি করার নাম যদি ভূমি সংস্কার বা কৃষি বিপ্লব হয়, তবে সেটা একটা বিপ্লবই বটে। এতে আয়ুবের মতে পাকিস্তানে ফিউডাল বা সামন্ততন্ত্রের অবসান হোল আর ভূমি ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক প্রথার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হোল। 'লাঙ্গল যার জমি তার'—এই জাতীয় আওয়াজ-কে আয়ুব খান পাগলের চীৎকার মনে করেন। সোসালিস্ট বা কো-অপারেটিভ প্রথায় ভূমির চাষ করবে প্রকৃত চাষীরা এ জাতীয় দাবী বা বিশ্বাস প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের কাজটি তিনি কি ভাবে করলেন? একেবারে উল্টো দিকে পা বাড়িয়ে। পূর্ব-বঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা নাকি সে রাজ্যের চাষ-আবাদকে তছনছ করে দিয়েছে—আয়ুব খান এই অভিযোগ এনেছিলেন। 'ইষ্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশান অ্যাক্ট'-এর পরিবর্তন (amendment) করালেন তিনি। ১৯৫০ সালে পূর্ব-বঙ্গে জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা বা সিলিং নির্ধারিত হয়েছিল ৩৩ একরে—আয়ুব খান তা বৃদ্ধি করে দিলেন ১২০ একরে। অর্থাৎ জোতদার শ্রেণীকে আরো জোরদার করে দিলেন। পরে যখন রাজনৈতিক দিক থেকেও বেসিক

ডেমোক্রাটদের জন্ম দেওয়া হোল তখন এই জোতদার ও বুনিয়াদি গণতন্ত্রীরা একটা কায়েমী স্বার্থ হিসেবে বেশ জাঁকিয়ে বসল পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজে, চাষে-বাসে গ্রামে গ্রামে। পশ্চিম-পাকিস্তানে জায়গীরদারদের থেকে সিলিং করে যতটুকু জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে জমিদারী উচ্ছেদ আইনে কোন ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ছিল না। পূর্ব-বঙ্গে জমিদাররা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন বলে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেবার উৎসাহ কারোরই ছিল না—আর তাঁরা সবাই দেশ ত্যাগ করার ফলে তাঁদের ক্ষতিপূরণের দায়ও কারো ছিল না। কিন্তু চতুর আয়ুব খান হিন্দু জমিদারহীন পূর্ব-পাকিস্তানে জমির সিলিং ৩৩ একর থেকে ১২০ একরে উন্নীত করে দিয়ে বেনামধারীতে বহু জমি ভোগকারী মুসলমান জোতদারদের মধ্যে বেশ পুষ্ট করে দিলেন। বলা বাহুল্য যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বা মুসলিম লীগের প্রকৃত আনুগত্য আসতো চিরকাল এই মুসলমান জোতদার শ্রেণীর কাছ থেকেই। পূর্ব-বঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের হাতে মুসলিম লীগের সহসা অমন পতন-কে আয়ুব খান কখনই কোন শুভ সূচনা বলে মনে করতে পারেননি। মুসলিম লীগকে আবার জাগাতে হলে গ্রামে গ্রামে মুসলিম লীগের যে জোতদারি ভিত্তি সেটাকে শক্ত করতে হয়। তাই করলেন আয়ুব খান পূর্ব-বঙ্গে ভূমি-প্রতি বিপ্লবের সাহায্যে।

এখানে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ভূমি সংক্রান্ত চিন্তাধারার একটু নমুনা দেওয়া যাক। 'প্রভু-নয়-বন্ধু' (Friend not Master) শীর্ষক তাঁর আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: 'ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারের ওপর আমি ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলাম যাতে তারা যথা সত্বর ল্যাণ্ড রেকর্ড তৈরী করে ফেলেন এবং যাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে থাকেন। অবশ্য ততদিনে হিন্দু ভূ-স্বামীরা দেশত্যাগী হয়েছেন—তাঁরা আর ফিরেও আসতে পারছেন না এবং কোন কিছুর জন্য এক কপর্দক

ক্ষতিপূরণও দাবী করতে পারে না। ক্ষতিগ্রস্ত ভূ-স্বামীরা যাতে নতুন করে জীবন ও সংসার বাঁধতে পারেন এবং সমাজে প্রয়োজনীয় অংশীদার হিসেবে কাজ করতে পারেন সে সুযোগ তাঁদের দিতে হবে।

আর প্রত্যেককেই জমি দিতে হবে এ ধরনের ধারণার কোন অর্থ হয় না। সকলকে জমি দেবার মত এত জমি নেই। ভূমি-মালিকানা বিস্তৃত করতে পারো, কিন্তু তোমাকে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করতে হবে যারা চাষে অর্থ বিনিয়োগে সক্ষম থাকবে এবং লাভজনক ভাবে চাষবাস করতে পারবে। যদি এই শ্রেণীকে ধ্বংস করে দাও তবে হাঁসটাকেই মেরে ফেলা হবে।'

প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের মার্শাল ল জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে চোরা-কারবারী, ঘুষখোর আর ট্যাক্স ফাঁকি দিতে ওস্তাদ—এ ধরনের ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, জিনিস-পত্রের দাম কয়েকদিনের জন্য হু হু করে পড়ে গিয়েছিল। জনসাধারণ যেন কপটচারী তুর্নীতিগ্রস্তদের কব্জা থেকে মুক্তি পেল বলে কয়েকদিনের জন্য খুশি হোল কিন্তু সে ক-দিনের জন্য? যখন দেখা গেল সেই পুলিশ, সেই ব্যুরোক্রাটরাই মিলিটারী খুঁটির জোরে পেছন দিয়ে ফিরে এসেছে তখন আবার ধীরে ধীরে ঘুষখোররা নতুন কৌশলে তাদের তুর্নীতির বেসাতি চালাতে লাগল—এমন কি মিলিটারীকেও তুর্নীতির লভ্যাংশ দিয়ে হাত করতে অগ্রসর হোল। পুলিশের ঘুষের মাত্রাটা একটু বাড়াতে হোল মাত্র; কেননা পুলিশকে অতিরিক্ত ঝুঁকি (risk) নিয়ে ঘুষ নিতে হচ্ছিল তো!

চার বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে ফৌজী শাসন চালিয়ে কিন্তু মার্শাল আয়ুব মনে করেছিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মেরুদণ্ড তিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন। পূর্ব-বাংলার পক্ষে আর মাথা তুলে দাঁড়ান সম্ভব হবে না এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটি নতুন আইন করে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে

নিলেন। কিন্তু এই সব দলের নেতারা নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে গেলেন। আয়ুব খান মনে করেছিলেন যে তাঁর বিপ্লবের ফলে যে গণতন্ত্র কায়েম হবে তাকে চালু রাখার জন্য কোন পার্টির বা দলের দরকার হবে না। যে দল একদা পাকিস্তান কায়েম করেছিল সেই মুসলিম লীগকেও তিনি প্রথমে তেমন প্রয়োজনীয় মনে করেননি।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ভেবেছিলেন যে তাঁর ফৌজী বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং দুই ভূখণ্ডের আশি হাজার মৌল গণতন্ত্রীদের দিয়ে তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বে পাকিস্তানের ওপর তাঁর জঙ্গীশাহী চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একথা অনুভব করলেন যে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা সম্ভব না হলে নিজের ডিকটেটরির পেছনে কোন উৎসাহ সঞ্চার করা সম্ভবপর হবে না। শুধু হিটলার বা মুসোলিনির ডিকটেটরশিপ নয়— বর্তমান যুগেও মিশরের নাসের বা বর্মার নে-উইনের সামরিক ডিকটেটরশিপের পেছনে পর্যন্ত একটি দলের প্রয়োজন হয়েছে। এই ডিকটেটররা প্রত্যেকেই অন্ততঃ কাগজে-কলমে একটি করে আদর্শ-ভিত্তিক দল গঠন করেছিলেন বা করছেন, কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের পক্ষে অর্থনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক আদর্শের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা সম্ভব ছিল না, কারণ এই আদর্শের ভিত্তিতে দল গঠিত হলে পাকিস্তানে নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়ে উঠতো। সুচতুর আয়ুবের মনে হয়েছিল যে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব-বাংলার ওপর তিনি শাসন ও শোষণ চালাতে পারেন, একমাত্র মুসলিম জাতীয়তা এবং ইসলামী আদর্শের ছদ্মাবরণে। তাই তিনি নিজের বাড়িতে প্রাক্তন মুসলিম লীগ নেতাদের কয়েকজনকে ডেকে এনে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত করলেন এবং কিছুদিন পরে নিজেই এই নব-গঠিত মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিয়ে তার প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। এভাবে আয়ুব পাকিস্তানে

আবার ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক আদর্শকে জিয়িয়ে তুলবার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হলেন।

তাঁর আত্মচরিত 'প্রভু নয় বন্ধু'-তে প্রেসিডেন্ট আয়ুব এ বিষয়ে লিখেছেন: 'সংবিধান রচনাকালে আমি যে একটা ভুল করেছিলাম সেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। পার্টিবাজীর অত্যাচারে তিতি-বিরক্ত অন্যান্য পাকিস্তানীদের মত আমারও মনোভাব পার্টি-বিরোধী ছিল—অতএব আমি এমন একটা শাসনতন্ত্রের কথা ভাবছিলাম, যাতে পার্টি না হলেও চলতে পারে। কিন্তু সংবিধান চালু করার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে পার্টি-প্রথা ভিন্ন কোন গণতান্ত্রিক প্রথাই চলতে পারে না। আইন সভার ভিতরে বিভিন্ন সদস্যদের পরিচালিত করার জন্য পার্টির দরকার হয়। আর বাইরে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার জন্যও পার্টির দরকার হয়। তাছাড়া সরকারী নীতিসমূহ জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যও পার্টির প্রয়োজন আছে। কাজেই আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতেও পার্টির প্রয়োজন হবে। সংবিধান রচনার এক বছর পরেও যে বহু রকমের "কনফিউশান" বিরাজ করছিল তার কারণ আমাদের পক্ষে তখনও মুসলিম লীগকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।'

আয়ুব আরও লিখেছেন: 'আমি যখন পাকিস্তান মুসলিম লীগে যোগ দিলাম তখন দেশে একটা বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে এই বোঝায় যে আমারই মত দেশের অনেক লোক ভেবেছিলেন যে পার্টিবিহীন গণতন্ত্র বুঝি সম্ভব। এমন কি প্রবীণ রাজনীতিবিদ্‌রাও আমার পার্টিতে যোগ দেওয়াতে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে তাঁরা আমাকে নিঃসঙ্গ (isolated) করে রাখতে পারবেন। দেশে যদি আবার পার্টি-প্রথা চালু করে দেওয়া হয় তখন কি আমার পক্ষে সকল পার্টির বহির্ভূত হয়ে থাকা সম্ভব না উচিত?'

মোট কথা পার্টি-প্রথাকে গালাগালি দিয়েও আয়ুব খান ক্ষমতায়

এসে শেষ পর্যন্ত পার্টি এবং সেই মুসলিম লীগ পার্টিকে অবলম্বন করতেই বাধ্য হলেন। পাকিস্তানে Father Figure বা পিতৃস্থানীয় কোন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে জঙ্গী-শাসক ছাড়াও একজন রাজনীতিবিদ্ ও কূটনীতিবিদে পরিণত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আয়ুবের পন্থা অনুসরণ করে পূর্ব-পাকিস্তানে পুনর্গঠিত হোল আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের মুসলিম লীগও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রইল না : তিনি আইনসঙ্গতভাবে প্রাক্তন মুসলিম লীগের কাউন্সিলের বৈঠক ডাকেননি। লীগ নেতারা তাই খাজা নাজিমুদ্দিন-এর নেতৃত্বে গড়ে তুললেন দ্বিতীয় আরেকটি মুসলিম লীগ। ফলে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের দলের নাম হোল 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' এবং প্রাক্তন লীগ-কর্মীদের দলের নাম হোল 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'।

পূর্ব-বঙ্গের আরেকদল প্রবীণ নেতা কোন একক দল গঠন না করে সংযুক্তভাবে আয়ুব-শাহীর বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়ে 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এন্-ডি-এফ্) গঠন করলেন। এই এন্-ডি-এফ মোর্চায় যোগ দিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন, জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব আতাউর রহমান, জনাব সোহরাবর্দী, জনাব হামিদুল হক, জনাব মহম্মদ আলী, জনাব আজিজুল হক এবং অনেক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী।

রাজনীতির ওপর আইনের বেড়াজাল খানিকটা শিথিল করলেও প্রেসিডেন্ট আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তানে বহু রাজনৈতিক নেতা বিশেষতঃ বামপন্থী গণতন্ত্রবাদী নেতা, শ্রমিক, এবং কিষাণ কর্মীদের কারাদণ্ড মকুব করলেন না। বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর ওপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানাও প্রত্যাহার করা হোল না।

কিন্তু মৌলানা ভাসানী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁর কারামুক্তি হোল।

শহীদ সোহরাবর্দীকে সে বছর ১৯শে আগস্ট করাচী সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হোল। আয়ুব সরকার এক প্রেসনোটে ঘোষণা করলো যে জনাব সোহরাবর্দী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অতঃপর তিনি আর রাষ্ট্রবিরোধী বা বিভেদ-পন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। প্রেস-বিজ্ঞপ্তিটিতে আরও জানানো হোল যে শহীদ সোহরাবর্দী পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁকে পাকিস্তান সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করবার পর থেকেই প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান জনাব সোহরাবর্দীর কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সোহরাবর্দীকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি আমেরিকান দূতাবাসের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সোহরাবর্দীর দহরম মহরম পছন্দ করতেন না। আয়ুব খানের গভীর আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁর নয়া শাসনতন্ত্র তিনি যখন চালু করবেন সে সময় জনাব সোহরাবর্দী নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেন। তাই ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি সোহরাবর্দীকে গ্রেফতার করবার আদেশ দিলেন। সেদিন শহীদ সাহেব তাঁর বাড়িতে কয়েকজন আমেরিকান কূটনীতিক-কে এক সাড়ম্বর পার্টি দেবার আয়োজন করছিলেন। জীবনে এই প্রথম শহীদ সোহরাবর্দীর কারাবাসের অভিজ্ঞতা হোল। কারামুক্ত হবার পর জনাব সোহরাবর্দী 'ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্টে'র (এন্-ডি-এফ) নেতা হয়ে রাজনীতিতে আবার আসর জমানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আয়ুব-শাহীর জঙ্গী শাসনের বেড়াজালে সুবিধা করতে পারেননি। এ ছাড়া হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন—অবশেষে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশেই তাঁর শেষ-নিশ্বাস পড়ে—মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাজ্য লেবাননের রাজধানী বেইরুতের একটি সুরম্য হোটেল কক্ষে।

যদিও আন্দোলন, সভাসমিতি ও রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে বাহ্যত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোল, তথাপি বাস্তবে আয়ুব-শাহী কোন কারণেই সঙ্ঘবদ্ধ কোন আন্দোলন বা বিক্ষোভ-প্রদর্শন সহ্য করতে পারছিলো না। তুচ্ছ কারণেই নানা জায়গায় ১৪৪ ধারা জারী করা হতে লাগল এবং যে-সব গণতন্ত্রবাদীরা কৃষক ও শ্রমিকদের আইনসম্মত ভাবেই সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোল। উপরন্তু শুধুমাত্র পুলিশী অত্যাচারের হাতিয়ার দিয়ে স্বৈরাচারী সরকার বামপন্থী সভা ও আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে লাগলেন যদিও আইনতঃ ঐ ধরনের সভার বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ঢাকা শহরে নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডি আরোপ করে সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করার অধিকার এমন সঙ্কুচিত করে তুলেছিলেন যে শহরের বিভিন্ন সংস্থার বিশেষ করে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, শ্রমিক, ছাত্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির জন্য জনসভার অনুমতি তো দূরের কথা স্থান পাওয়াই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জনসভা অনুষ্ঠানের মত উপযুক্ত স্থান এমনিতেই খুব হ্রাস পেয়েছিল—তার ওপর কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধের ফলে বিষয়টি আরও সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুদিন থেকে ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের সনাতন স্থান পলটন ময়দানে—(যা বর্তমানে প্রাচীর-ঘেরা আউটডোর স্টেডিয়ামে পরিণত হয়েছে)—কোন সভা-অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া বিরোধী দলগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা মন্তব্য করে-ছিলেন: 'সাম্প্রতিক অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, জনসভা অনুষ্ঠানের প্রার্থী যদি বিরোধী দল হয় তাহা হইলে স্টেডিয়াম-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে জনসভার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন। অপর দিকে সরকার-সমর্থক দলের

জনসভার সুবিধার জন্য খেলার নির্ধারিত সময় পরিবর্তনেরও নজির রহিয়াছে।'

সাম্প্রতিক কালে পলটন ময়দানে জনসভার অনুমতি পাওয়ার অসুবিধার জন্য কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক দল বায়তুল মোকাররমের (কলকাতার নাখোদা মসজিদের অনুসরণে ঢাকায় নির্মিত সুবৃহৎ মসজিদ) সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থান জনসমাবেশের স্থান হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

কিন্তু কিছুদিন আগে ঢাকার বায়তুল মোকাররম পরিচালক কর্তৃপক্ষ আয়ুব-শাহীর নির্দেশে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাঁদের প্রাঙ্গণে 'সরকার-বিরোধী সভা-সমিতি' একেবারেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

ঢাকার 'দৈনিক সংবাদ' 'জনসভার স্থান'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন: 'বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন সরকারী শাসনযন্ত্র সভাসমিতি অনুষ্ঠানেরও সুযোগ সুবিধা মারাত্মকরূপে খর্ব করিয়া স্বাধীন জনমতের প্রকাশকে প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে সেই মুহূর্তে বায়তুল মোকাররম-কর্তৃপক্ষের এই বিজ্ঞপ্তি বিশেষ অর্থবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে বাধ্য। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে ছোট বড় প্রতিটি শহরে আজকাল বৎসরে প্রায় ছয় মাসই ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। বাদবাকী সময়েও সরকারের সংখ্যাতীত বিধি-নিষেধের প্রতিবন্ধকতা পার হইয়া জনসভা অনুষ্ঠান যে কিরূপ দুরূহ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে চিন্তা করিতে পারেন না।'

পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ 'বায়তুল মোকাররম'-কমিটির বিজ্ঞপ্তিটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করেননি। তাঁরা মন্তব্য করেন যে বিষয়টি সাধারণ বা উপেক্ষণীয় মোটেই নয়—বরঞ্চ গভীর উদ্দেশ্যমূলক এবং একে প্রতিহত করতে না পারলে বিরোধী দলগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন

এবং অন্যান্য সংগঠনগুলির পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

'বায়তুল মোকাররম' সরকার-বিরোধী জনসভা নিষিদ্ধ করে যে বিজ্ঞপ্তিটি আয়ুব-শাহী প্রচার করেছেন তার তুলনা পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী যে কোন দেশে পাওয়া ভার। যাঁরা 'বায়তুল মোকাররম' প্রাঙ্গণে যাতায়াত করেন তাঁরা বিস্ফারিত নয়নে সেখানে একটি লিখিত নির্দেশনামা দেখতে পান : 'শ্লোগান, হৈ, হুররে, রাজনৈতিক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং সরকার-বিরোধী সভাসমিতি বায়তুল মোকাররমের সীমানার মধ্যে একেবারেই নিষেধ, এছাড়া অন্য কোন সভাসমিতিও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বায়তুল মোকাররমের মধ্যে নিষিদ্ধ।' (Slogans, shoutings, political and subversive activities and anti-Government meetings are not allowed in Baitul Mukarram area. No other meeting without permission is also allowed here.)

আয়ুব-শাহীতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা যেমন স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে চলেছিল তেমনি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমশঃ হয়ে উঠছিল শোচনীয়, যদিও আয়ুবের রাজত্বে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে কথঞ্চিৎ প্রসার ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। এর কারণ সারা পাকিস্তানে মাত্র কুড়িটি ভাগ্যবান পরিবার শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগ, ইনস্যুওরেন্স কোম্পানীর শতকরা ৭৯ ভাগ এবং ব্যাঙ্কের শতকরা ৮০ ভাগের কর্তৃত্ব করতে থাকেন—এঁদের মধ্যে একটি পরিবার স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের পুত্র জনাব গওহর আয়ুবের পরিবার অর্থাৎ পরোক্ষে প্রেসিডেণ্টের নিজেরই পরিবার। পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে লগ্নী করা ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকার মালিক এই কুড়িটি পরিবার।

পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক এই বৈষম্য আরও প্রকট। এ বিষয়ে কিছু তথ্য পরে দিচ্ছি। কিন্তু

মোটের ওপর পুরো পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ অর্জন করে পূর্ব-পাকিস্তান। কিন্তু তার সবটুকুই ভোগ করে পশ্চিম-পাকিস্তান। সরকারী চাকরিতে পশ্চিম-পাকিস্তানীর সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানীদের পাঁচগুণ যদিও পূর্ব-পাকিস্তানে লোকসংখ্যা অনেক বেশী।

যাই হোক পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য মুলতবী রেখে সেই ভাগ্যবান কুড়িটি পরিবারে প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

গত বছর (১৯৬৮) পাকিস্তান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে (যার উদ্বোধনী উপলক্ষে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছিলেন) পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ মাহববুল হক হঠাৎ যে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করে দেবেন তা কেউ প্রত্যাশা করেননি। লনডন ও হারভারডে শিক্ষিত ও 'Strategy of Economic Planning in Pakistan' গ্রন্থের রচয়িতা—যে পুস্তকে তিনি আয়ুবী জমানায় শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির বহু প্রশস্তি করেছেন—ডাঃ হকের কথা কেউই হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে পারেননি—বরঞ্চ তাঁর অভিযোগগুলি দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন।

ডাঃ মাহববুল হক সখেদে বলেন যে, 'যদিও জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ছয় ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও দেশের ধনসম্পদ অধিকতর দ্রুতহারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হচ্ছে। নজির উপস্থিত করে ডাঃ হক জানান যে, পাকিস্তানের সমগ্র শিল্প-জগতে যে মূলধন খাটছে তার শতকরা ৬৬ ভাগ মাত্র কুড়িটি পরিবারের কুক্ষিগত। এই কুড়িটি পরিবার দেশের ব্যাঙ্কিং শিল্পের আশি ভাগের মালিক এবং লাইফ ইনসিওরেন্স সহ বীমা শিল্পের সাতানব্বুই ভাগের

উপরোক্ত শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে অন্যান্য দেশীয় শিল্প-পতিদের অংশ

নেহাতই নগণ্য। কুড়িটি পরিবারের সম্পত্তির বাইরে যা আছে তার অধিকাংশের মালিক বিদেশী পুঁজিপতিরা। ফলে মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পোত্যগীরা যে কস্মিনকালেও পাকিস্তানের শিল্প বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তা সুনিশ্চিত।'

জনাব মাহববুল হক আরও প্রকাশ করেন যে 'ভাগ্যবান এই কুড়িটি পরিবার পাকিস্তানে এঁরা বর্তমানে Lucky Twenty নামে পরিচিত। শুধু শিল্প ও বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছেন তাই নয় দেশের আরও নানা ব্যবসা সংস্থাও প্রত্যক্ষ বা অপ্রতক্ষভাবে এঁরা পুঁজির জোরে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন।'

করাচীর বিলাসবহুল লাকশারি হোটেলে (যেখানে ম্যানেজমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল) ডাঃ মাহববুল হকের বিবৃতি দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা সমালোচনামুখর হয়েছিলেন যে 'ভাগ্যবান কুড়িটি' পরিবারের মধ্যে আয়ুব-তনয় গওহার খান সাহেবও আছেন।

১৯৬০ সালেও দেশে কিছু জমিজমা ছাড়া আয়ুব পরিবারের বিশেষ কোন অর্থনৈতিক সংস্থান ছিল না,—কিন্তু আয়ুব-পুত্র ক্যাপটেন গওহর আয়ুব ১৯৬১ সালে সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে সহসা যেন যাতুবলে শিল্পোত্যগে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয় এবং তাঁর শ্বশুরমশাই-এর (তিনিও পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার) সঙ্গে অংশীদার হয়ে জামাতা বাবাজী অচিরে দেশের অতি উচ্চসারির শিল্পপতি হয়ে ওঠেন। আমেরিকান পুঁজিও প্রেসিডেণ্ট তনয়ের মধ্যে উপযুক্ত মুরব্বীকে খুঁজে পেয়ে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং মারকিন মুলুকের সুবৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস-এর দাক্ষিণ্যে গওহর আয়ুব গান্ধার ইনডাসস্ট্রিসকে গড়ে তোলেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫—এই চার বছরে আয়ুব পরিবারে মোট সম্পদ ২৫ কোটি টাকারও অধিক হয়েছে বলে জনশ্রুতি।

প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট জনাব হকের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতির বিষয়বস্তুকে দেশবাসী নির্ভরযোগ্য বলেই গণ্য করেন। তাই 'জঙ্গ'-এর মত উগ্র সরকার সমর্থক পত্রিকাও দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কুড়িটি পরিবারের একচেটিয়া অধিকারকে 'নির্মম ও অতীব পরিতাপজনক' বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয় তাঁরা পাকিস্তানের সরকারী পরিকল্পনাসূচীকে একান্তভাবেই ধনিক ও পুঁজিপাতি শ্রেণীর অনুকূলে প্রণীত বলে কঠোর মন্তব্য করেন।

'জঙ্গ'-এর এ মন্তব্য যে কতটা যথার্থ তার একটি প্রমাণ পূর্ব-পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন বোরডের সিদ্ধান্ত যে তাঁরা সরকারী উদ্যোগে ও অর্থে স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প ইউনিটগুলিকে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করবেন। ফলে EPDIC (ইস্ট পাকিস্তান ইনডাসট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) স্থাপিত বেশ কয়েকটি সিমেনট-বস্ত্র-মেশিনারী কারখানা শীঘ্রই ভাগ্যমন্ত কুড়িজন বা লাকি টোয়েনটির কুক্ষিগত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কৃষিক্ষেত্রেও একই অবস্থা। পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেন যে, তাঁরা ভাওয়ালপুর রাজ্যের আশেপাশে প্রচুর চাষযোগ্য উর্বরা জমি নীলামে বিক্রি করবেন—বলা বাহুল্য এই জমিও ঐ লাকি টোয়েনটির কবলিত হবার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা।

ভাগ্যমন্ত কুড়িজনের মধ্যে আদমজী ও ইসপাহানী প্রাগ্-দেশ-বিভাগ কালেও ব্যবসা জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন।

ইসপাহানী বর্তমানে প্রধানত ব্যাঙ্কি ইনসিওরেন্স ও নৌ-পরিবহণ ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং আদমজী বিশেষত পাট এবং ইনজিনিয়ারিং শিল্পে।

দাউদ শেঠ পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য জগতে আরেকটি উজ্জ্বল নাম। দেশের বস্ত্র-শিল্পের অর্ধেকের মালিকানা তাঁর। এ ছাড়া খুলনায় পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউজ প্রিণ্ট মিলের অধিকাংশ শেয়ারই তাঁর।

আরেকটি উল্লেখনীয় নাম ভালিকা-গোষ্ঠীর। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে তিনি বোম্বাই ও করাচীতে কমিশন এজেন্ট হিসাবে নানা প্রকার দালালি ব্যবসা করে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন—কিন্তু বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তম শিল্পপতিদের একজন।

পাকিস্তানে লাকি টোয়েনটির শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই পারিবারিক সম্পত্তি—ফলে এদের মালিকানা তাঁদের পরিবারভুক্ত প্রায় একশোজন ভদ্রলোক বা মহিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে দেশের সর্ব সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে থাকুক তা দেশবাসীর কাম্য নয়—তাই জনাব মাহববুল হক স্বয়ং একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন নিয়োগের কথা প্রস্তাব করেন। এই কমিশনের মূল লক্ষ্য হবে, জাতীয় সম্পদ বণ্টনে অসমতা দূর করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের সুপারিশ পেশ করা।

কিন্তু জনাব মাহববুল হকের মত বিবেকবান ব্যক্তি জাতীয় সম্পদ বণ্টনে অসাম্যের প্রতিবাদে যতই মুখর হয়ে উঠুন না কেন, ভাগ্যমন্ত কুড়িজন ব্যক্তি যাঁরা আয়ুবের বিচিত্র বুনিয়াদী গণতন্ত্রের শক্ত বুনিয়াদ, তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন বুকের পাটা পাকিস্তানে কারও ছিল কি?

প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর আজব সংবিধান চালু করে, রাজনৈতিক দলগুলিকে সক্রিয় হবার সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রের একটা মুখোস পরলেন মাত্র, কিন্তু সংবিধানের শিখণ্ডির আড়ালে তিনি প্রচণ্ডতর এক স্বৈরাচারী শাসন সুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি সংবাদপত্রগুলিকে তাঁর কব্জায় আনবার প্রচেষ্টায় তৎপর হলেন। নানা বিধি-নিষেধাজ্ঞার নাগপাশে সংবাদপত্রগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হোল। আয়ুব-সরকার পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রখ্যাত বামপন্থী রাজনীতিবিদ মিয়া ইফতিকার-উদ্দিন পরিচালিত বহুল প্রচারিত প্রগতিবাদী দৈনিক সংবাদপত্র পাকিস্তান টাইমস্-এর ওপর খাঁড়ার কোপ মেরে একটি প্রেসট্রাস্ট স্থাপন করলেন এবং এই

প্রেসট্রাস্ট ধীরে ধীরে দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলি করায়ত্ত করবার জন্য জাল বিস্তার করতে লাগল। সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ পাকিস্তান'-এর পরিচালন-ভার সরকার নিজহাতে তুলে নিলেন। ঢাকার তিনটি প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক' 'সংবাদ' এবং 'পাকিস্তান অবসারভার'—বরাবরই আয়ুব-শাহীর কোপদৃষ্টিতে ছিল। 'ইত্তেফাকের' স্বত্বাধিকারী জনাব শহীদ সোহরাবর্দীর একনিষ্ঠ অনুরাগী জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে কারারুদ্ধ করা হোল। কয়েকবছর পরে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবর রহমানের বিখ্যাত ছয়-দফা আন্দোলনের পরে 'ইত্তেফাক'-এর প্রকাশ আয়ুব-শাহী বন্ধ করে দিয়েছিলেন (প্রায় তিন বছর বাজেয়াপ্ত থেকে সম্প্রতি আয়ুবের পতনের পর ইত্তেফাক পুনঃ-প্রকাশিত হচ্ছে) এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করেছিলেন।

পাকিস্তানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন—জুরিখের আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্টে (১৯৬৬ সালের শেষে প্রকাশিত) আশঙ্কার সঙ্গে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এতে খেয়াল খুশীমত 'সাংবাদিকদের কারাগারে নিক্ষেপ' ও 'সংবাদ-পত্রের প্রকাশনা' বন্ধ করে দেবার দরুন পাকিস্তান সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

প্রায় ঐ সময়ই আই. পি. আই.-এর (International Press Institute) ঢাকা কমিটির উদ্যোগে পরিচালিত সাংবাদিকতা শিক্ষা কোর্সের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তারও সরকারের নিন্দাবাদ করে বলেন : 'চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মুক্ত-সমাজের ভিত্তি, প্রগতির শর্ত। সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আবদ্ধ করে পাকিস্তানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহীন।'

আয়ুবশাহীতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর সরকারী হামলা যে পাকিস্তানে কোন্ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল তার বড় একটি

নজির আই. পি. আই.-এর পাকিস্তান শাখার সভাপতি ও ইত্তেফাক-সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে অনির্দিষ্টকাল কারারুদ্ধ করা এবং ইত্তেফাকের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করার সরকারী নির্দেশটি হাইকোর্টের রায়ে অবৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কুখ্যাত দেশরক্ষা বিধি সংশোধন করে সরকারের নূতন ক্ষমতা গ্রহণ (যার ফলে প্রায় তিন বছর ইত্তেফাক প্রকাশ সম্ভবপর হয়নি) অন্য কোন প্রেস থেকে খর্বিত আকারে দু-পৃষ্ঠার ইত্তেফাক প্রকাশ করবার যে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল সদাশয়, সরকার তাও প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে 'ইত্তেফাক', 'ঢাকা টাইমস' ও 'পূর্বাণীর' প্রায় চারশো কর্মী মাসের পর মাস জীবিকাহীন হয়ে পড়েন।

তোফাজ্জল হোসেন সাহেব ছাড়াও পাকিস্তানের আরও বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক দেশরক্ষা আইন-বলে ছিলেন বছরের পর বছর কারারুদ্ধ। এঁদের মধ্যে ছিলেন 'সংবাদ'-পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত, শ্রীসত্যেন সেন, শ্রীরণেশ মৈত্র, জনাব হানিফ খান, শ্রীপ্রসাদ রায়, শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বার্তাজীবীরা।

রাজশাহী জেলার নওগাঁ ন্যাশনাল আওয়ামী দলের সভাপতি ও সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ মনজুর হোসেন, মুদ্রাকর ও প্রকাশক জনাব হবিবুর রহমান এবং রিপোর্টার শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসকে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল— অপরাধ : তাঁদের কাগজে 'মহাদেবপুরের তহসিলদারের দুর্ব্যবহারে গলায় গামছা' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ।

১৯৬৬ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে ডাকবাংলার সামনে সরকারী মুসলিম লীগ পার্টি আয়োজিত একটি জনসভায় প্রাদেশিক লাট বাহাদুর জনাব মোমেন খাঁ সাহেব যখন আয়ুব-স্তুতিতে আত্মমগ্ন ছিলেন তখন প্রতিবাদমুখর বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশবাহিনীর তাণ্ডব সুরু হয় এবং শান্তিরক্ষীরা তাদের কর্মতৎপরতার মাত্রা ছাড়িয়ে

সাপ্তাহিক 'জনতা'র সিরাজগঞ্জস্থ প্রতিনিধি কর্তব্যরত সাংবাদিক মির্জা মোরাতুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে—কসুর : তিনি নাকি পুলিশী-বিক্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিলেন।

উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সত্ত্বেও এঁদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করে তাঁদের কারাজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছিল। মির্জা মোরাতুজ্জামানের স্ত্রী শেফালী বেগম সিরাজগঞ্জের ধানবান্দী থেকে পাঠানো একটি পত্রে জানান যে সরকার থেকে এই বন্দীদের সহায়-সম্বলহীন ধ্বংসোন্মুখ পরিবারগুলির জন্য কোন মাসিক ভাতার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়নি।

উররন্তু সরকারী, আক্রোশ থেকে এই বন্দী সাংবাদিকদের পরিজনবর্গও রেহাই পাননি। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘকাল ধরে আটক পাবনার বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী মীরা রায় স্থানীয় সেণ্ট্রাল গার্ল'স স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণ না দেখিয়েই সরকারী চাপে এই জনপ্রিয় শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়। অপরাধ : তাঁর স্বামী আয়ুবী রোষের বলি : একজন রাজবন্দী।

কবি জসিম উদ্দীন ঢাকায় তাঁর কমলাপুরের বাসভবন থেকে একটি আবেদন প্রচার করে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন : 'এই সব সাংবাদিকদের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করুন—অবিলম্বে এঁদের মুক্তি দিন—এঁরা দেশকে ভালবাসেন।'

গ্রেপ্তার ছাড়াও সাংবাদিকদের উপর নানাভাবে পুলিশী জুলুমের অন্ত ছিল না।

১৯৬৬ সালের এপ্রিলে লাহোরের শালিমার বাগে পাকিস্তান সফররত সৌদী আরবের সুলতান ফয়সালকে প্রদত্ত এক নাগরিক সম্বর্ধনার শেষে সাংবাদিকরা যখন সভাস্থল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন পুলিশ অকস্মাৎ তাঁদের উপর সবিক্রমে লাঠি চার্জ সুরু করে। যার ফলে একাধিক প্রবীণ সাংবাদিক গুরুতর আঘাত পান। তাঁরা

স্ব-স্ব পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ লাঠি প্রয়োগের লোভ সামলাতে পারেনি।

এর কয়েকদিন আগে করাচীতেও চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ-শি-চাওর সফরের সময় পুলিশের হাতে একজন সাংবাদিক প্রহৃত হয়েছিলেন।

ঢাকার দৈনিক সংবাদ মন্তব্য করেছিলেন: 'দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়া সরকারী মুখপাত্ররা যতই গলাবাজি করুন না কেন, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি সরকারের এইরূপ প্রতিহিংসামূলক আচরণ উহার বিপরীত সত্যই প্রমাণ করে।'

পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের এক অধিবেশনে স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাতুজ্জামান খান দেশরক্ষা বিধিবলে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞার স্বরূপের খানিকটা পরিচয় দিতে গিয়ে জানান যে সরকারী আদেশে কোন সংবাদপত্র দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সরকার-সৃষ্ট বৈষম্যের সংবাদ প্রকাশ বা বৈষম্যের অবসান কামনা করে কোন অভিমত ব্যক্ত করতে পারে না। যদি করে তবে তারা শ্রেণী-বিদ্বেষ ছড়ানর অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

ছাত্র-আন্দোলন (রাজনৈতিক) সংক্রান্ত কোন খবর—এমন কি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশোজন ছাত্র-ছাত্রীও পুলিশের গুলিতে নিহত হন, তবুও সে খবর প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি নানা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনে বৈষম্য নিরপেক্ষ বা বিরোধীদলীয় কাগজগুলির অস্তিত্ব রক্ষার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, 'দৈনিক সংবাদ'-এর প্রচার সংখ্যা উগ্র সরকার-সমর্থক 'দৈনিক পয়গাম' (যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক গভর্নর মোমেন খাঁ সাহেব)-এর চেয়ে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৬ সালের ২০শে জুন থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত ২৬ দিনে 'সংবাদ' শ্রেণীভুক্ত সরকারী-বিজ্ঞাপন পেয়েছিল মাত্র ১৭ কলাম কিন্তু ১০ই জুলাই থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত ১৭ দিনে 'পয়গাম' পেয়েছিল ১০৩ কলাম।

এ বিষয়ে সরকারী নীতি কি জানতে চেয়ে প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী সদস্য জনাব আহামদুল কবির প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'সংবাদকে কেন উপযুক্ত পরিমাণে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে না ?'

উত্তরে তথ্য দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল রেজ্জাক খান সাফ জবাব দেন : 'হয়ত পত্রিকাটি সরকারী দপ্তরগুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি'।

নবতিপর বৃদ্ধ আজাদ-সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ ও জনাব নুরুল আমিন থেকে সুরু করে পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট সংবাদপত্র-সেবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে বলেন যে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণ করে, জনমতের কণ্ঠরোধ করে বড় জোর আত্ম প্রতারণা করা যায়, কিন্তু দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায় না।

এমন কি জনাব জুলফিকর আলী ভুট্টোও ঢাকার পাকিস্তান অবসারভারে 'সাংবাদিকতার জগতে আমার প্রবেশ'-শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে নানা স্থানে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ভুট্টো-সুলভ বিষোদ্গার করা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ যে কোন দেশের পক্ষে অসীম ক্ষতিকারক বলে অকপটে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন : 'ক্ষমতাসীন সরকারের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান হতাশা ও বিক্ষুব্ধ মনোভাবের উপর অহরহ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলে যে ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার প্রবাহ স্বদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের বুনিয়াদি গণতন্ত্রে যে শুধু বাক-স্বাধীনতাই নিয়ন্ত্রিত নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতাও যে কি পরিমাণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল তার জাজ্বল্যমান একটি সাম্প্রতিক নজির : '১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব-পাকিস্তান সফররত প্রেসিডেন্ট আয়ুব দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁয়ে এলে শহরের প্রবীণ আইনজীবী শ্রীবরদাভূষণ চক্রবর্তীর

ছেলের মোটর গাড়িটি প্রেসিডেণ্টের ব্যবহারের জন্য সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তলব করেন। বরদাবাবু হাকিম মহোদয়কে সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, গাড়ির চাবি তাঁর ছেলের হেফাজতে আছে, তা ছাড়া গাড়ির ড্রাইভারও ছুটিতে···সুতরাং তাঁর ছেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কি করে গাড়ি দিতে পারেন? এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পরেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং এক বিরাট পুলিশ বাহিনী-সহ বলদর্পে বরদাবাবুর বাড়িতে হাজির হয়ে গ্যারেজ ভেঙ্গে মোটর গাড়িটি একটি জীপের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যান। এছাড়া মহকুমা হাকিম সর্বসমক্ষে অকথ্যভাষায় বরদাবাবুকে গালি-গালাজ করেন এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে চালান করেন। গাড়িটি কয়েকদিন পরে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বরদাবাবুর বাড়িতে ফেরত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাঁর ছেলে খেসারত দাবী করায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা দায়ের করার হুমকি দেওয়া হয়।

বরদাবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী আশা চক্রবর্তী ঢাকা হাইকোর্টে স্বামীর মুক্তি দাবী করে যে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন পেশ করেন তার স্বপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কৌঁসুলী মির্জা গোলাম হাফিজ শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলেন: 'সমগ্র ঘটনাটির উৎপত্তি হয়েছে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের জন্য গাড়ি চাওয়াকে উপলক্ষ করে, কিন্তু বরদাবাবুর মত সম্মানিত এক নাগরিকের প্রতি তুচ্ছ কোন ব্যক্তিগত কারণে দেশরক্ষা-বিধির প্রয়োগ ক্ষমতার অবৈধ ও মদমত্ত অপব্যবহারের এক ঘৃণ্য নজির পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির মর্যাদাকে কি তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অবিবেচক অনুগামীরা সারা বিশ্বের সামনে ভূলুণ্ঠিত করে দিচ্ছেন না?'

শ্রীবরদা চক্রবর্তীর এ অবমাননা ও নির্যাতন পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে গভীর বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

প্রগতিশীল দৈনিক 'পাকিস্তান অবসারভার' পত্রিকার নির্ভীক

সম্পাদক জনাব আবদুস সালাম তার কাগজের প্রতিষ্ঠা-দিবস সংখ্যায় 'সম্পাদকের প্রত্যয়' শীর্ষক একটি বলিষ্ঠ রচনায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এই বলে: 'পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা দেশপ্রেমিক, কিন্তু তারা চায় না যে গভীর নিশীথে সবাই যখন সুপ্তিমগ্ন তখন প্রহরীরা তাদের দ্বার-প্রান্তে করাঘাত করতে থাকে আর তাদের বন্দী করে নিয়ে যায় অজানা কোনো উদ্দেশে।'

জনাব সালাম আরও বলেছিলেন: 'আমি একজন সাংবাদিক। আমি ঐশ্বর্যের আকাঙ্খা করি না, ক্ষমতার প্রতিও আমার মোহ নেই। আমি শুধু চাই নির্বাধে কথা বলবার অধিকার এবং যা সত্য, যা ন্যায় ও যা সুন্দর তা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা।'

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ক্ষমতায় এসে প্রথম থেকেই বড় গলায় প্রচার সুরু করেন যে দেশের দুই অংশ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে তাঁরা যত্নবান হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের এত সাধু সংকল্প সত্ত্বেও বৈষম্য হ্রাস পাবার পরিবর্তে সর্বক্ষেত্রে বেড়েই চলেছিল—সে সংখ্যাতত্ত্ব যথা সময়ে আলোচিত হবে। কিন্তু এ বৈষম্যের সুরু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। পাকিস্তান যখন কায়েম হয়েছিল, তখন উভয় অঞ্চলেই শিল্প প্রায় একই-রকম অনগ্রসর ছিল। পশ্চিম-পাকিস্তান, বিশেষত পশ্চিম-পঞ্জাবের শিল্প সম্ভাবনাও বিশেষ কিছু ছিল না। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্ স্পেট সাহেব পশ্চিম-পঞ্জাবের বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন: 'সুগঠিত শিল্প যা আছে তা বিশেষভাবে কৃষিকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে…এখনো পর্যন্ত পশ্চিম পঞ্জাবে অল্পই শিল্পায়ন হয়েছে এবং একমাত্র বয়নশিল্প (textiles) ছাড়া অন্য কোন শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের বিশেষ কোন সম্ভাবনা আছে বলেও দাবী করা যায় না।' কিন্তু পাকিস্তান সেন্সাসের দু-নম্বর বুলেটিনে বলা হয়েছে যে '১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে পাকিস্তান বিশেষতঃ পশ্চিম-পাকিস্তান একটি

আধা-শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে দেখা দিয়েছে।' এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করবার মত। সুরুতে পূর্ব-পাকিস্তানের মতোই পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্প ছিল না। এমন কি তার সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল না। তাহলে পশ্চিম-পাকিস্তান আধা শিল্পোন্নতই বা হোল কি করে?

শুধু আয়ুবের আমলে নয়, পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকেই পূর্ব-বাংলারই রপ্তানীর টাকায় এবং বিদেশী-সাহায্য-হিসেবে পাওয়া প্রায় সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ করে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পপতিরা নিজ অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়েছে। আর পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প-বিস্তার ব্যাহত হয়ে কৃষিজীবীদের আনুপাতিক হার বেড়ে চলেছে।

ঢাকার আগামসিহ লেনের অভিযান প্রিন্টিং হাউস থেকে প্রকাশিত জনাব আতাউর রহমান খানের লেখা 'ওজারতির দুই বছর'-শীর্ষক একটি আত্মচরিতমূলক গ্রন্থে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট জননেতা এবং সাবেক মুখ্যউজির পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পশ্চিম-পাকিস্তানের উচ্চতম পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে সুরু করে এমন কি চুনোপুঁটি দেশভক্তদের পূর্ব-বঙ্গ ও তার মানুষদের সম্পর্কে নানা ধরনের 'বিচিত্র মনোভাবে'র যে সব নজির পেয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানীদের এই মনোভাবের মধ্যেই পূর্ব-বঙ্গের ওপর তাঁদের নির্লজ্জ ও নির্মম শোষণের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

তাঁর পুস্তকের গোড়াতেই জনাব আতাউর সখেদে বলছেন যে 'আজাদী লাভের পর পাকিস্তানের মানুষ আশা করেছিল যে সমান-তালে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান কদম বাড়িয়ে চলবে—চিত্রল থেকে চাটগাঁ পর্যন্ত একই নারা ধ্বনিত হবে।' দেশের আট কোটি মানুষ একই সুরে কথা কইবে—ভৌগোলিক দূরত্ব, ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্য, ভাষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের পার্থক্য কোন প্রতিবন্ধক হবে না। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। করাচী-লাহোর-রাওলপিণ্ডিতে যাঁরা তখ্ত দখল করে বসলেন পূর্ব-বাংলার চিত্ত জয় করবার কোন চেষ্টা

তাঁরা কখনও করেননি। 'সে চিত্তে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার, তাকে ক্ষতবিক্ষত করবার চেষ্টা হয়েছে হরদম— কঠোরভাবে।'

করাচীর গণ-পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব আতাউর একাধিকবার বলেছিলেন: 'পাকিস্তানের দুই অংশকে এক করা যায় একে অপরের সুখ-দুঃখের সমভাগী করে, হিংস্র শক্তি দিয়ে নয়, বর্বর নীতি দিয়ে নয়। ন্যায্য দাবী মেনে না নিলে বেটাও বাপকে মানতে চায় না— মানে না।'

কিন্তু আতাউর সাহেবের মনে হয়েছিল: 'দুঃখের কথাগুলি বলা হয়েছিল যেন সৎ-মার কাছে।'

জনাব আতাউর মন্তব্য করেছেন: 'অসমান দুই অংশ যে এক সঙ্গে দাঁড়াতে পারে না, দুটি চাকা সমান না হলে গাড়িটাই যে অচল হয়ে যায় এ ছোট্ট কথাটি কারও মনে উদিত হয়নি। ফল দাঁড়াল বিষময়—গাড়ি প্রায় অচলই হয়ে গেল।'

লেখক আরও বলেছেন যে পশ্চিমে ওঁরা ভাবতেন যে পূর্বের মানুষরা যেন দয়ার পাত্র। ওঁরা নিজেরা আরব, ইরাণ, তুরান থেকে এসেছেন, কেউবা ভাবেন তিনি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার বাদশার বংশধর— আর বাঙালীরা নেহাতই দেশী।

পূর্ব-বঙ্গে নিযুক্ত পশ্চিম-পাকিস্তানী এক গভর্নর বাহাদুর একদিন কথাচ্ছলে আতাউর সাহেবকে বলেই ফেললেন: 'জনাব, নেহাত চাকরি করার জন্য এখানে এসেছি মনে করেন? সে তো পশ্চিমেই হতে পারত। পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছি পবিত্র এক কর্তব্য সমাধা করতে, এক মিশন নিয়ে। এসেছি এখানকার মানুষকে সত্যিকারের ইসলামী আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে—হিঁদুয়ানির যে গন্ধ এখনও তাদের গায়ে লেগে আছে তাকে দূর করতে।'

কিছুদিন পরেই লাহোরে এমনি ধরনের কয়েকজন মুরব্বির সঙ্গে জনাব আতাউরের মোলাকাত হয়েছিল। সকলে ওয়াক্তের নমাজ শেষ করে আলাপ সুরু করলেন। কিন্তু আতাউর সাহেবকে উদ্দেশ্য

করে লাহোরীদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠলেন : 'জনাব, বেশ তো নমাজ পড়েন, দেখলে মনে হয় মুসল্লি—অথচ আপনি কিনা বাংলা-বাংলা করে চীৎকার করেন। আশ্চর্য! আমরা সবাই পাকিস্তানী—এর মধ্যে কিসের বাংলা?'

ওঁদের মধ্যে জবরদস্ত এক মৌলানা, আবদুল হামেদ বদায়ুনী সাহেবও যোগ দিলেন : 'তওবা, তওবা,—বাংলা জবান—ওটা তো গয়র-ইসলামী, হিঁদুর বুলি—ইসলামী তালিম ওর মারফত হতেই পারে না। কাজেই বাংলা জবান যদি আপনারা ছেড়ে দেন তবেই মগরেবী আর মাশরকী পাকিস্তানকে মজবুত ডোরিতে বাঁধা যাবে। হিন্দু কাফরদের সঙ্গে আপনারা মহাব্বত রাখতে পারবেন না—এই ইসলামের ফরজ। ওরা আপনাদের কে? ওরা তো জিম্মী। বাংলা জবান আর হিন্দু বুলি এই দুই জলদি ছাড়ুন।'

পাকিস্তানের প্রথম উজিরে-আজম প্রবল-প্রতাপান্বিত নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান সাহেব এলেন পূর্ব-বঙ্গে। জনাব আতাউর দলবল নিয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে গেলেন।

আতাউর সাহেব লিয়াকতের দরবারে পূর্ব-পাকিস্তানের নানা অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরলেন।

বললেন : 'পূর্ব বাংলার লোকের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করুন জনাব। বড়ই আপসোসের কথা যে আপনারা আমাদের উপর এত বেজার। এমন কি আমাদের দেশাত্মবোধের প্রতিও আপনারা ঘোর সন্দিহান—আমরা মুসলমান কিনা তাও সন্দেহ করেন। আপনাদের এ ধরনের মনোবৃত্তি কোনো ইমানদার পূর্ব-পাকিস্তানীই বরদাস্ত করতে পারে না।'

চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ শুনলেন জনাব লিয়াকৎ। বললেন : 'তোমরা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে চাও না।'

এর পরে চলল আতাউর-লিয়াকতের মধ্যে উত্তপ্ত কথা-কাটাকাটি—

আতাউর : 'পূর্ব-বাংলার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করেছেন আপনারা।

ছোট-তরফ বড়-তরফ ভাগাভাগি করে বড়-তরফের কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন আপনারা।'

লিয়াকৎ: 'এটাই তোমাদের দোষ। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে তোমাদের নজর। বৃহত্তর স্বার্থ তোমাদের চোখেই পড়ে না।'

আতাউর: 'জনাব, অবাস্তব দার্শনিক উদারতা হয়ত আমাদের নেই। এইটুকু শুধু বুঝি যে উভয় অঞ্চল যদি একই মাত্রায় উন্নতি লাভ না করে তাহলে গোটা পাকিস্তানের প্রগতি ব্যাহত হবে।'

লিয়াকৎ: 'যুক্তি নয়, এটা ভাব-প্রবণতা।'

১৯৬২ সালে শহীদ সোহরাবর্দী তখনও রাজবন্দী হিসেবে জেলে···এমন সময় ২৭শে এপ্রিল পূর্ব-বঙ্গের মানুষের একান্ত আপন জন তাদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক পরিণত বয়সে (৯০) লোকান্তরিত হলেন। বাংলা ও বাঙালীর খুব কাছের মানুষ ফজলুল হক-কে তাঁর অনুরাগীরা বলত শেরে-বাংলা অর্থাৎ বাংলার বাঘ। অনেক মুসলমানের নামের শেষে 'হক' কথাটা থাকে। যেমন 'শামসুল হক', 'লুৎফল হক' ইত্যাদি—তাঁদেরও হক সাহেব বলে ডাকেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক মুসলমান প্রধান গ্রামে এরকম দু-একজন হক সাহেব আছেন। কিন্তু একদা অবিভক্ত সারা বাংলা দেশে হক সাহেব বলতে শুধু একজন ব্যক্তিকেই বোঝাত। তিনিই সনামধন্য এ. কে. ফজলুল হক। বাংলাদেশের বিগত অর্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী রাজনীতিতে ফজলুল হক একদিকে যেমন ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক পুরুষ, অপর দিকে তেমনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার বলেছিলেন—পায়ের নখের আগা থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত ফজলুল হক বাঙালী—আবার তিনি খাঁটি মুসলমানও বটে। শেরে-বাংলা ফজলুল হকের জীবন বাঙালী জাতির প্রায় এক শতাব্দীর ইতিহাস।

কিন্তু শুনলে আশ্চর্য মনে হতে পারে যে অতুল জনপ্রিয়তার অধিকারী শেরে বাংলা ফজলুল হকের এন্তেকালের পর সাত বছর অতিক্রান্ত হলেও তাঁর মাজার এখনও পর্যন্ত অনাদর ও অবহেলার রিক্ততা নিয়ে পড়ে আছে। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে যে শেরে-বাংলার মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই জননেতার স্মৃতি-রক্ষার একটি বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আয়ুব-সরকার বাধা দিয়েছিলেন। অবশেষে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে চেয়ারম্যান করে সরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে 'শেরে-বাংলা স্মৃতিরক্ষা' কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এঁরা সাত বছরে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা শেরে বাংলা স্মৃতিরক্ষা তহবিলে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এমন কি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত 'শেরে-বাংলা স্মৃতি-রক্ষা কমিটি'র অস্তিত্ব বহুদিন জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেছেন যে সরকারী কমিটির নিষ্ক্রিয়তার ফলেই 'শেরে-বাংলা স্মৃতিরক্ষা তহবিলে' এত কম টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাদের মতে কমিটি এ ব্যাপারে একটু উৎসাহ প্রদর্শন করলে বহুপূর্বেই শেরে বাংলার কবরের ওপর স্মৃতি-সৌধের নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হোত।

বাঁশের খুঁটির ওপর কোন রকমে একটি টিনের চালা, ভগ্নপ্রায় বাঁশের বেড়া—এই পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার মাজারের বর্তমান অবস্থা। সন্ধ্যায় কবরে বাতি জ্বালানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাও এখনো পর্যন্ত সেখানে করা হয়নি।

অযত্নে অবহেলায় উপেক্ষিত শেরে-বাংলার মাজারটির শোচনীয় অবস্থা সত্যিই পীড়াদায়ক। এমন কি অনেক সময় গরু ছাগলকেও শেরে-বাংলার মাজারের পাশে বিচরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু সরকারী কতৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

১৯৫৮-র অক্টোবরে যে সামরিক শাসন পাকিস্তানের মানুষের

মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল কিছুদিনের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে তীব্র গণবিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল।

পাখতুনিস্তান তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সত্যাগ্রহ করে খান আবদুল গফফার খাঁর নেতৃত্বে শয়ে-শয়ে পাঠান কারাবরণ করল, সম্পত্তি হারালো। বালুচরাও সুরু করল সশস্ত্র লড়াই। তাদের অনেককে ফাঁসিকাঠে ঝোলান হোল, গাছের ডালে পা বেঁধে মাথা ঝুলিয়ে অসংখ্য বালুচকে আগুনে সেঁকা হোল। 'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানে মুসলমান বালুচদের ঈদের জমায়েতের ওপর সামরিক বিমান থেকে বোমাবর্ষণ পর্যন্ত করা হোল।

পূর্ব-পাকিস্তানেও এই বিক্ষোভ ব্যাপক আকার নিল।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার ছাত্ররা জনাব সোহরাবর্দী ও অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে যে আন্দোলন সুরু করল কয়েকদিনের মধ্যেই তা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করল। ঢাকা শহরে তখন আয়ুব খান সশরীরে হাজির। সারা শহরে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী মোতায়েন। এর মধ্যে ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার সহস্র সহস্র ছাত্র ও অন্যান্য বিক্ষুব্ধ মানুষ যে মিছিল বের করেছিল জঙ্গী-শাহীতে তার তুলনা মেলা ভার। সেই আন্দোলিত দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে ঢাকা শহরের অনেকেই সেদিন রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার করতেন:

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

আয়ুব খানের ফটো সংগ্রহ করে তা পদদলিত করা হোল, তাতে থুথু দেওয়া হোল। মিলিটারির ব্যারিকেড ঠেলে মিছিল অগ্রসর

হবার সময় সমরধ্বনি উঠল ইয়া আলী—ইয়া আলী। বিক্ষোভকারা জনতার মুখে শ্লোগান মাত্র তিনটি—আয়ুব-শাহী নিপাত যাক, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চাই।

যুক্তফ্রণ্টের যুগের প্রারম্ভিক সাফল্যের পরে বিয়োগান্তিক অন্তরদ্বন্দ্বের বিপর্যয়ের সুযোগে প্রতিষ্ঠিত আয়ুব-শাহীর পরবর্তী অধ্যায়ে পাকিস্তানের সামরিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রথমে নির্ভীক দৃঢ়তায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তারা পূর্ব-বাংলার সেই দুরন্ত মুসলিম ছাত্র-সমাজ। নেতারা তখন জেলে, অজস্র কর্মী কারাগারে, রাজনৈতিক নেতাদের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, সর্বত্র সর্বপ্রকারের সন্ত্রাস, বিভীষিকা ও দমন-নীতি। কি ইংরেজ আমলে, কি পাকিস্তানী জমানায় বিপ্লববাদের রক্ততীর্থের মর্যাদা লাভ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই উর্দু ভাষায় ফরমান জারী করবার সময় সর্বপ্রথম পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহকেও ছাত্রদের প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—যা সে সময়ে পাকিস্তানের একচ্ছত্র নায়ক কায়েদে আজমের পক্ষে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ই ছিল।

এখানেই পাকিস্তানের সর্বশক্তিমান প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়েছিল ছাত্র-বিক্ষোভের সামনে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণই রক্তাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই ভাষা-শহীদদের মিনার পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহী আত্মাকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে। পরবর্তীকালে জঙ্গীজমানায় ফৌজী নেতা প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের বিরুদ্ধেও প্রথম মাথা তুলে দাঁড়ায় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-সচেতন ছাত্ররাই। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় উপস্থিত হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে উদ্যত বেয়নেট হাতে নিয়ে প্রহরারত ছিল বিশাল এক পুলিশ বাহিনী।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন সুসজ্জিত মঞ্চের ওপর। তিনি ভাষণ সুরু করলেন মাত্র—অমনি সামনের ছাত্র সমাবেশ থেকে বহুকণ্ঠে আওয়াজ উঠল: 'প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চাই,' 'প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই,' 'পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চাই'। শ্লোগান শুনে চমকে উঠলেন আয়ুব খান। সাদা-পোশাক-পরা গোয়েন্দা-পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকটি ছাত্রর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে উঠল ছাত্র-সমাবেশ। আয়ুব-বিরোধী ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো সারা কার্জন হল। অবিশ্রান্তভাবে ধ্বনিত হতে লাগল আয়ুব-বিরোধী শ্লোগান। ক্ষুব্ধ ডিকটেটর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কার্জন হল ছেড়ে চলে গেলেন। তারপরই সুরু হোল খণ্ডযুদ্ধ। ক্ষিপ্ত পুলিশ আক্রমণ করলো ছাত্রদের—চেয়ার ভেঙ্গে, হাতল ছুড়ে তার প্রত্যুত্তর দিলো ছাত্ররা। পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কার্জন হল থেকে বের করে দিল। এই খণ্ডযুদ্ধের পরে সারা কার্জন হলে পড়ে রইলো শত শত ভগ্ন চেয়ারের স্তূপ।

কার্জন হলের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক হল, ইকবাল হল। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল থেকে শয়ে-শয়ে ছাত্র এসে জমা হোল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উন্মত্ত পুলিশ আবার লাঠি চালালো, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলো আর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করলো। তিনটি তাজা প্রাণ—ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল আর গোলাম মোস্তাফা-পুলিশী তাণ্ডবের শিকার হোল। তারা হোল ১৭ই সেপ্টেম্বরের শহীদ। পুলিশ গ্রেফতার করল অগণিত ছাত্র-কর্মীকে। তবুও বেপরোয়া পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহী ছাত্র-সমাজ। তারা বিরাট এক মিছিল বের করল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরও অসংখ্য ছাত্র এসে সামিল হোল এই শোভাযাত্রায়। বিক্ষোভ-চঞ্চল ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকা শহরের প্রধান রাস্তাগুলি

দিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। আয়ুব-শাহীর মুর্দাবাদে ধ্বনিত, উত্তপ্ত হয়ে উঠলো ঢাকা শহর। রাস্তার দু-পাশের দোকানগুলি থেকে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ফটো নামিয়ে নিয়ে সেগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করলো উত্তেজিত ছাত্ররা। তারপর আয়ুবের একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করে সেদিনের মত ছাত্ররা শেষ করলো তাদের বিক্ষোভ-মিছিল। পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে আরেকটি দিন অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো—রক্তঝরা ১৭ই সেপ্টেম্বর। এই ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রতি বছর পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে 'ছাত্র-দিবস'-রূপে।

এই ঘটনার পর অগণিত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হোল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রইলো একমাস। আবাসিক হলগুলি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হোল ছাত্রদের। অনেক ছাত্রকে রাস্টিকেট করা হোল। তবুও দমলনা ছাত্র-আন্দোলনকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে ঠিক একইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে।

১৯৬৫ সালের নির্বাচনে ডিক্টেটর আয়ুব খানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নিজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলাম একটি সংযুক্ত মোর্চা গঠন করেছিল—'ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' (N.D.F.) এই মোর্চায় যোগ না দিলেও এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এই সংযুক্ত বিরোধী শক্তি যখন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল দাবীর ভিত্তিতে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো রচনা করে নির্বাচনী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে সে সময় ছাত্র-সমাজও এগিয়ে আসে এই গণতন্ত্রের সংগ্রামকে মদদ দিয়ে জোরদার করার জন্য। সারা পূর্ব-বাংলার ছাত্র সমাজের এক কনভেনশনে বাইশ দফা দাবী গৃহীত হয়। এই ২২ দফা দাবীর ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর

'ছাত্র-দিবস' ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত করার জন্য ছাত্র-লীগ, ছাত্র-ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন ইত্যাদি পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠনগুলি একটি 'সংযুক্ত ছাত্র-পরিষদ্' গঠন করে।

বিখ্যাত এই বাইশ দফা দাবীগুলি কি ছিল তা জানতে পাঠকদের বিশেষ করে এখানকার ছাত্র সমাজের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তাই এই 'বাইশ-দফা' ছাত্র দাবীগুলির পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছি :

১. স্কুলশিক্ষা : প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্কুল শিক্ষা ও বই-এর বোঝা কমিয়ে বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস তৈরী করতে হবে। বাংলা ভাষার উপর জোর দিয়ে ইংরাজী উর্দু ও আরবী প্রভৃতি ভাষার বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা রহিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের ফাটকাবাজারী বন্ধ করে স্বল্পমূল্যে সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে জাতীয় ভাবাদর্শের নামে বিকৃত পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিক্রিয়াশীল ও কুৎসিত সাম্প্রদায়িক ভাবধারা অবশ্যই রহিতের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের জন্য সরকারী উদ্যোগে স্কুলে দ্বিপ্রাহরিক টিফিনের ব্যবস্থা চাই। কিণ্ডার গার্টেনের মত ইংরাজী মাধ্যমের ব্যয়বহুল স্কুল ও সাধারণ স্কুলের মধ্যে শিক্ষার মনোগত বৈষম্য দূর করতে হবে এবং বিদেশী ভাবধারা ও সংস্কৃতির বদলে সকল স্কুলকে সম-পর্যায়ে আনতে হবে। অবাস্তব শর্ত আরোপ ও প্রশাসনিক খামখেয়ালীর জন্য যে সমস্ত স্কুল সরকারী সাহায্য পায়নি, তাদের সরকারী গ্র্যান্টের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। জনসংখ্যা অনুপাতে প্রদেশের সর্বত্র বিশেষতঃ গ্রামে আরও অনেক বেশী স্কুল স্থাপনের এবং ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের কার্যকরী ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত ও ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও স্কুলের ছাত্র

বেতনের হার একই স্তরে আনতে হবে এবং এর ফলে বেসরকারী স্কুলের আয়ের যে ঘাটতি পড়বে তা সরকারী সাহায্যে পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বস্তরে শতকরা চল্লিশভাগ ছাত্র-বেতন হ্রাস করতে হবে। শিক্ষার অবাধ সুযোগ দানের জন্য দরিদ্র ছাত্রদের অবশ্যই বিনামূল্যে সরকার কর্তৃক পাঠ্য পুস্তকের সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা মেধাবী এবং স্বউপার্জনে নির্ভরশীল তাদের শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য প্রদেশের কলেজ সমূহে আই. এ. ; আই. এসসি. ; আই. কম. ; এবং বি. এ. ; বি. এসসি এবং বি কম.-এর নৈশকোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

২. প্রদেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে সরকারী নূতন ও পূর্ণাঙ্গ কলেজ স্থাপন করতে হবে। আত্মনির্ভরশীল কলেজ সমূহকে সরকারী কলেজে রূপান্তরের চেষ্টা পরিহারের ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজ সমূহে অহেতুক ছাত্রাসন সীমিত করা চলবে না। প্রতি কলেজে অভিজ্ঞ এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজন অতিরিক্ত সিলেবাস ও বই-এর বোঝা কমিয়ে বছর বছর সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের নীতি পরিহার করতে হবে? এই ব্যাপারে টেক্সটবুক বোর্ডের খামখেয়ালীপনা ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিহার করতে হবে।

প্রতিটি কলেজে গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র মতে অবাধ নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠনের এবং ছাত্রদের সভা-সমিতি করার নূন্যতম অধিকার দিতে হবে। বেসরকারী কলেজ সমূহে সরকারী আমলাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৩. কারিগরি শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে উহাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ছাত্রীদের জন্য সেখানে

বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত অটোমেশন-প্রথা অবশ্যই উঠিয়ে দিতে হবে। পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রবেশ করবার পর দুই বৎসরের ধারাবাহিক বর্ধিত কোর্সে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বি. এস. অথবা বি. টেক. ডিগ্রি পড়ার সুযোগ দিতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটে বছরে মোট দুটি সেসন চালু করে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সেমিস্টার প্রথার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানের মত পূর্ব-পাকিস্তানেও আরও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

৪. চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলির বেড সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচশততে উন্নীত, পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরী স্থাপন করে স্কুল থেকে রূপান্তরিত কলেজগুলিকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। মেডিক্যাল উচ্চশিক্ষাকে সহজলভ্য করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে করাচীর মত বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট এবং একটি ট্রপিক্যাল ডিজিজ ইনস্টিটিউট খুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এম. ডি. ও এম. এস. কোর্স খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তানী ছাত্রদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগ দেওার জন্য মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কার্ডিওলজী ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট অব চেস্ট ডিসিজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। মেডিক্যাল শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য প্রদেশে আরো অধিকসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রয়োজন। কনডেন্সড এম. বি. বি. এস. কোর্সের ছাত্র বেতন হ্রাস করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ে আনতে হবে।

৫. কৃষিশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কৃষি কমিশনের সুপারিশ

অনুযায়ী প্রদেশে আরও অধিকসংখ্যক কৃষি ও পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন করতে হবে। কৃষি বিদ্যালয় এম. এসসি. কোর্সে ছাত্রাসন বৃদ্ধি ; পরিকল্পিত বিভাগসমূহ স্থাপন ও তাদের পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে হবে। কৃষি ছাত্রের দাবী মেনে নিয়ে কৃষি বিদ্যালয় ও কৃষি কলেজের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা। ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ কলেজগুলিতে নৈশ এম. এ. ; এম. কম. ও এম. এসসি. কোর্স খুলতে হবে।

প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলায় কমপক্ষে একটি কলেজে পূর্ণাঙ্গ অনার্স কোর্স এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজে পূর্ণাঙ্গ অনার্স কোর্স খুলতে হবে এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী, লেবরেটরী ও উপযুক্ত শিক্ষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নূতন বিভাগ খুলে তার পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক ও গবেষণা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে আসতে পারে।

শাসকশ্রেণী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভেদসৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা আমদানীর জন্য এবং একটি বিশেষ সুবিধাভোগী পেটোয়া সরকার সমর্থক ছাত্রগোষ্ঠী দাঁড় করবার জন্য দশকোটি টাকা ব্যয়ে বনালীতে জাহাঙ্গীরনগরে মুসলিম বিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তথাকথিত উন্নয়নের নামে নির্বাচনী প্রচার চালানো এবং সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্গস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ দ্বৈতনীতি আমদানী পরিহার করতে হবে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করে এইখানে আরও অধিকহারে ছাত্রাসন বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. শিক্ষার মাধ্যম ও বাংলা কলেজ—শিক্ষাজীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার অবিলম্বে প্রবর্তন করতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বাংলাভাষা ব্যবহারের বন্দোবস্ত করতে হবে।

বাংলা কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানের উর্দু কলেজের মত সরকারী সাহায্য দিতে হবে। বাংলা কলেজকে বাংলাভাষার কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিচালিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইংরাজী ও অন্যান্য উন্নত ভাষায় লিখিত প্রয়োজনীয় বই-এর অনুবাদের ব্যবস্থা খুব শীঘ্র শেষ করতে হবে এবং স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উহা সরবরাহ করতে হবে।

৮. নারীশিক্ষা : প্রদেশের নারীশিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক সরকারী উদ্যোগে অবিলম্বে কার্যসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে। এই জন্য প্রত্যেকটি থানায় অন্ততঃ একটি করে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাস ও সর্ব জেলায় একাধিক মহিলা কলেজ স্থাপন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি, ডাক্তারী, নার্সিং, বিজ্ঞান শিক্ষা কলাসহ সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যাপকভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী বৃত্তি দিতে হবে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অবিলম্বে প্রদেশের সর্বত্র অধিক সংখ্যক বাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

৯. মাদ্রাসা শিক্ষা—মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিককরণ, বিজ্ঞান-সম্মত ও যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সুষ্ঠু ও সুন্দর গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় ইসলামী এবং ইসলামী একাডেমী প্রভৃতি গবেষণাগারে ইসলাম-বিষয়ক সুযোগ্য পণ্ডিত ও বিশারদ নিয়োগ করিতে হবে।

১০. সামরিক শিক্ষা—সামরিক বিভাগ সকল শাখার শিক্ষা-কেন্দ্র পূর্ব-পাকিস্তানে গড়ে তুলতে হবে এবং সামরিক বিভাগে বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দিয়া আরও অধিকহারে রিক্রুটিং-এর ব্যবস্থা অতি সত্বর করতে হবে।

১১. ছাত্রাবাস সমস্যা—শিল্পগত পরিবেশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য আরও অধিকহারে ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে আরও চারটি হল স্থাপন করতে হবে এবং সাময়িকভাবে ছাত্রাবাস সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান বৎসরে ভাড়াবাড়ি ও ব্যারাক স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বর্তমান হলগুলিতে আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

১২. বৈদেশিক বৃত্তি গবেষণার সুযোগ ও শিক্ষালাভের জন্য যে কোন দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্রমণের সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক কারণের অজুহাতে বৈদেশিক বৃত্তি অথবা কোন দেশেরই রাষ্ট্রীয় বৃত্তি লাভের সুযোগ থেকে কোন ছাত্রকে বঞ্চিত করা চলবে না। আরও অধিক পরিমাণে বৈদেশিক বৃত্তিদান ও বৈদেশিক বৈষম্য দূর করে ডাক্তারী, কারিগরি, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব-থাকিস্তানের ছাত্রদের আরও অধিক পরিমাণে বৃত্তি দিতে হবে। জনসংখ্যা অনুপাতে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য—স্বাধীনতা লাভের সময় ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষার সর্বস্তরে পশ্চিম-পাকিস্তান অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সতের বছর অবাস্তব শিক্ষার ফলে বর্তমানে অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এবং পশ্চিম-পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষার সকল স্তরে পশ্চাদ্‌গামী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার বর্তমানে চরম বৈষম্যমূলক সরকারী নীতি এর জন্য দায়ী।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষিতের

সংখ্যা বর্তমানে ১৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭১১ জন আর পশ্চিম-পাকিস্তানে এই সংখ্যা ১৭ লক্ষের মত।

প্রবেশিকা পাস ব্যক্তির সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৭৫জন—পশ্চিম-পাকিস্তানে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৮১১ জন। ইণ্টারমিডিয়েটে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৫২ হাজার ৭৯৩ জন—অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯ লক্ষ ২ হাজার ৩৭৯ জন। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানে বৎসরে শতকরা ৩২ জন হারে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ হাজার ৭০ জন। পূর্ব-পাকিস্তানে বর্তমান গ্রাজুয়েট ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট মহিলা সংখ্যা যথাক্রমে ১২ হাজার ১৭৬ ও ৩৩৫ জন। পশ্চিম-পাকিস্তানে যথাক্রমে ৭ হাজার ৫৫ ও ২ হাজার ৭৪৯ জন। বৈষম্যের এই খতিয়ান প্রমাণ করছে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় প্রগতিশীল শাসকশ্রেণী একপ্রকার মারাত্মক সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করেছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চাদ্‌গামী করে রাখা হচ্ছে। এই অবস্থা কিছুতেই রাখতে দেওয়া হবে না এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে দ্বিগুণহারে আর্থিক সাহায্য অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

১৪. ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি—প্রদেশের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ছাত্রদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রয়োজনমত প্রদেশের সর্বত্র হাসপাতালের পৃথক ও বিশেষ সুবিধাদান করতে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেণ্টারের উন্নতিসাধন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল সেণ্টার স্থাপন করতে হবে।

১৫. শিক্ষক সমাজকে ভদ্রভাবে জীবন যাপনের উপযোগী বেতন প্রদান ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

১৬. শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ—সরকারী বাজেট ও পরিকল্পনা-সমূহে শিক্ষাখাতে বহুল পরিমাণে অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে। মাথাভারী শাসন ব্যবস্থা ব্যয়-বাহুল্য এবং প্রশাসনিত বিষয়ের অন্যবিধ জৌলুস

কমিয়ে ও সামরিক বাজেট কমকরে শিক্ষাখাতে ২৫ ভাগ ব্যয়বরাদ্দ ও শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. বর্তমানে শিক্ষক কমিশনের রিপোর্ট পূর্ণ বাতিল করে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সমস্যার পর্যালোচনা করে শিক্ষার সকলস্তর থেকে নিরপেক্ষ অভিনব বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে জাতীয় আশা, আকাঙ্খার ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

১৯. ছাত্র নির্যাতনমূলক সমস্ত সরকারী ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। ঢাকা, রাজশাহী কৃষিবিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং জেলে আটক বিভিন্ন ছাত্রবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। অবিলম্বে সমস্ত ছাত্রদের গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী সাহায্য বাতিল করা চলবে না এবং রাজনৈতিক কারণে কোন শিক্ষক অথবা ছাত্রকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত করা চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স (১৯৬০ সালে জারীকৃত এবং ১৯৬২ সনে সংশোধিত) বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বভৌমত্বের সুনিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওসমান গণিকে অপসারিত করে তৎস্থলে একজন নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ্‌কে নিয়োগ করতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মমতাজ উদ্দিনকে

অপসারণ করতে হবে এবং একজন নিরপেক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যে সকল কলেজের ও স্কুলের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ ছাত্র স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত আছেন তাদের অপসারণের ব্যবস্থা এবং সেস্থলে নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ্ নিয়োগ করতে হবে। যে স্কুলের হেডমাস্টার ও শিক্ষকগণ ছাত্র-স্বার্থ-বিরোধী কার্যে লিপ্ত আছেন তাঁদের অবশ্যই অপসারণ করতে হবে।

২১. ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস এবং ১৭ই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসাবে সরকারী ছুটি দিতে হবে।

২২. বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে গভর্নরের স্থলে যিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য, প্রাদেশিক প্রধান বিচারপতি অথবা সর্বজনমান্য নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদ্‌কে নিয়োগ করতে হবে।

১৯৬৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরের এই ছাত্র দিবসকে গোড়াতেই বানচাল করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি-পর্বেই আয়ুব-শাহী আঘাত হানলো পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ওপর। পূর্ব-বাংলার সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, হোস্টেলগুলি এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হোল। ছাত্র নেতাদের দলে দলে গ্রেফতার করা হোল এবং বহু ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলি থেকে বহিষ্কার করা হোল। অনেক ছাত্রের ডিগ্রিও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কমপক্ষে উনিশটি মফঃস্বল শহরে ১৭ই সেপ্টেম্বরের আগেই পুলিশ ছাত্র সমাবেশের উপর লাঠি চালায় ও কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণ করে। তবুও অকুতোভয় ঢাকার ছাত্র সমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা বের করতে উদ্‌যোগী হোল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ক্ষিপ্ত পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের ওপর। নির্মম লাঠিচালনা, কাঁদানে গ্যাস ও গুলিবর্ষণ ছাড়াও 'রায়ট কার' (riot car) থেকে ছাত্রদের ওপর ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়। ছাত্ররা গিয়ে আশ্রয় নেয় বিভিন্ন আবাসিক হলে—কিন্তু উন্মত্ত পুলিশ সেখানেও ধাওয়া করে ছাত্রদের। এবার ছাত্ররাও দেয় প্রত্যুত্তর। হলগুলির দেওয়াল ভেঙ্গে এবং

জানলার গরাদ খুলে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে বারবার ইট, লোহার রড, এবং চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চের হাতল ছুঁড়ে ছাত্ররা পুলিশকে হটিয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় তিন দিন ধরে চলেছিল ছাত্র-পুলিশের পীচট্ ব্যাটল (pitched battle) বা খণ্ডযুদ্ধ। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম— ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, মুসলিম হল, ইকবাল হল ইত্যাদি ছাত্রাবাসের ভাঙ্গা দেওয়ালগুলি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইটের স্তুপ তখনও পর্যন্ত ছাত্র পুলিশের গরিলা লড়াই-এর তীব্রতার সাক্ষ্য বহন করছিল।

মৌলানা ভাসানী আয়ুব-শাহীকে পূর্ব-পাকিস্তানে বর্বর ছাত্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন: 'পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্রদের ওপর যে অত্যাচার চালান হচ্ছে তার তুলনা নেই। সামান্যতম অজুহাতে শত শত ছাত্রকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শাসক চক্র সামান্যতম কারণেও তরুণ ছাত্রদের ওপর গুলি চালাতে ইতস্ততঃ করছে না। আমাদের সন্তান-সন্ততিদের নির্যাতনের করুণ কাহিনী বুকে ধারণ করে প্রতিটি রজনী অবসান হচ্ছে। ছাত্রদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। অভিভাবকরা তাঁদের প্রিয় সন্তানদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের মূক দর্শক হতে পারেন না। আমরা শাসকবর্গকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে সহ্যের একটা সীমা আছে। আমরা বিশ্বাস করি এখনও ছাত্রদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনিবার সময় আছে। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা আমরা অবলম্বন করব।'

পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যসেবী জনাব আবুল ফজল 'স্মরণীয় দিনের বরণীয় কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখলেন:

'দেশ বা জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য সম্ভারে দালানকোঠার সংখ্যায় আর সামরিক শক্তির অরাজেয়তায় বা রেডিও ছাড়িয়ে টেলিভিশনে পৌঁছলেই বড় হয় না। এটা বাহ্য। বড় হয় অন্তরের শক্তিতে নৈতিকবোধে, জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। দেশ আমাদের পুরানো বটে কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের নতুন, এখনো নবীন। এ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় সত্তা তা এখনো গঠনের মুখে— জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া তার ভিত কখনো শক্ত ও দৃঢ় হতে পারে না।

কেতাবের কালো অক্ষরের বাঁধন ছিঁড়ে এ মূল্যবোধ যদি জীবনাশ্রয়ী না হয়, যদি ছাড়িয়ে না পড়ে সমাজদেহে—যদি একে তুলে রাখা হয় স্রেফ পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মগজের তাকে-তাকে তা হলে জীবন-সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে জাতি হিসাবে আমরা হয়ে পড়বো এক হাওয়াই দুর্গের তালপাতার সব সেপাই শুধু।

এমন সেপাই দিয়ে জেতা যায় না জীবনের কোন যুদ্ধই। এমন মানুষ নিয়ে যে জাতীয় সত্তা বা জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবে তা হবে দুর্বল। ভঙ্গুর আর নড়বড়ে। এমন জাতি মহৎ কাজের অযোগ্য। তাই সব রকম মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে হয় ব্যবহারিক জীবনে, করে তুলতে হয় প্রত্যক্ষ আর বাস্তব। তখনই হয়ে উঠে জীবন যুদ্ধের হাতির আর জাতীয় মহত্বের প্রতীক। নানা স্বার্থের সংঘাতে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নানা সমস্যা—নানা সংকট, ক্ষমতালোভীদের দ্বন্দ্ব এতে যোগায় ইন্ধন। নবীন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী বলে এখানে অকারণে এরা ডেকে আনে সংকট, হয়ে দাঁড়ায় এরা জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায়।

মূল্যবোধের যে হাতিয়ার সে হাতিয়ার দিয়েই এসব সংকটের যেমন তেমন লোভী নেতৃত্বের করতে হয় মোকাবেলা। মূল্যবোধ নিয়ে চলে না কোন রকম আপোষ রফা। তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় এ মূল্যবোধ রক্ষায় সংগ্রামে শহীদ হয়ে অনেকে হয়েছেন অমর। এ শহীদের সংখ্যায় জাতিতে যত বেশী তারা তত বড়। আমাদের এ

আঠারো বছরের সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় জীবনেও আমাদের তরুণরা—আমাদের ছাত্ররাও বারে বারে মৃত্যুপণ করে এ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে,—প্রতিষ্ঠা করেছে আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত। এ সংগ্রামে শুধু জাতীয় নয়, মানবিকও কারণ প্রতি মানুষের ভিতরে যে মানবতা তারও তো ভিত্ রচনা এ মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতার উপর। মূল্যবোধ মানে সত্যবোধ—আমাদের ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারী উজ্জ্বল হয়ে আছে এ সত্য বোধের এক অবিস্মরণ দৃষ্টান্ত হয়ে। তেমনি স্মরণীয় হয়ে আছে ১৭ই সেপ্টেম্বরও। এ দিনও এগিয়ে এসেছিল আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজ জীবনের মূল্যবোধ আর-সত্য রক্ষায়। এ এক মহৎ উত্তরাধিকার এ শুধু এ যুগের জন্য নয়, আগামী দিনেরও এক মহৎ সম্পদ। আমাদের এ সবুজ ছাওয়া প্রিয় দেশে আগামীতে যারা জন্মাবে—পেছন ফিরে তাকালে তারা দেখতে পাবে এদেশের ইতিহাসের আকাশে ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৭ই সেপ্টেম্বরও একটি উজ্জ্বল তারা হয়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তাদের চোখের সামনে। যে তারার আলোয় দেখতে পাবে মূল্যবোধে অনুপ্রাণীত হয়ে কি করে এগিয়ে যেতে হয় সত্য আর মনুষ্যত্বের সংগ্রামে।

জয় হোক সত্যের, জয় হোক মনুষ্যত্বের—জয় হোক সংগ্রামী তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের।

শিক্ষার প্রথম শর্তই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—এ উদ্বোধন হোক আরো ব্যাপক, আরো সার্বজনীন।'

১৭ই সেপ্টেম্বরের ছাত্র-দমনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় নেতারা যুক্তভাবে ২৯শে সেপ্টেম্বর সারা পূর্ব-বাঙলায় সাধারণ ধর্মঘট এবং দমননীতি বিরোধী দিবস ঘোষণা করলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হোল তা অভূতপূর্ব, অবিশ্বাস্য। এই দিন শুধু স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারী, হাট-বাজার বা সওদাগরী অফিসগুলিই বন্ধ হয়নি—কলকারখানাও

সব স্তব্ধ হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে নিশ্চল হয়ে যায় রেল, স্টীমার, হেলিকপটার সারভিস এবং তুই পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল। সারা পূর্ব-পাকিস্তান প্রদেশের স্বাভাবিক জীবনকে অচল ও স্তব্ধ করে দিয়ে জবাব দেয় আয়ুব-শাহীর দমননীতির বিরুদ্ধে। গণ-বিক্ষোভের এই প্রচণ্ড অভিব্যক্তি দেখে সেদিনের মত আয়ুব-শাহীর প্রহরীরা হাত গুটিয়ে নেয়। ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সেদিন সকাল ন-টায় শ্রমিক সমাবেশ এবং বিকাল তিনটেয় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিকেল চারটায় পল্টন ময়দানে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হোল সে রকম বিশাল সমাবেশ ঢাকায় কেন—পূর্ব-পাকিস্তানের আর কোথাও ইতিপূর্বে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ।

দলে দলে মানুষ শোভাযাত্রা করে এই জনসভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। এই সুদীর্ঘ শোভাযাত্রার মাথা যখন ঢাকার নবাববাড়ির গেটে—শেষ প্রান্ত তখন ছিল নবাবপুর রেল ক্রশিং-এর কাছে। পল্টন ময়দানের এই স্মরণীয় জনসভায় উদ্দীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল কাসেম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মুসলেহউদ্দীন প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

ঢাকার জনপ্রিয় প্রগতিশীল কবি সায়েছুল ইসলাম '২৯শে সেপ্টেম্বরের ডাক'-শীর্ষক প্রভাত ফেরীর গান রচনা করে উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন :

বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর
হক দাবী আদায়ের তরে
নির্যাতন নাহি ডরি
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর॥

কেরানী কলম থামাও
দোকানী দরজা নামাও
গাড়োয়ান গাড়ি থামারে আজ
জুলুমের পথ রোধ কর
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর ॥

মজতুর মেশিন ছাড়
কৃষাণ কাস্তে ছাড়,
মা-বোনেদের মান বাঁচাতে
আজ এই প্রতিজ্ঞা কর
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর ॥

আওয়াজ তোল মজুর ভাই
ধর্মঘটের অধিকার চাই,
কুখ্যাত ঐ কালাকানুন
এই মুহূর্তে বাতিল কর
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর ॥

রাজবন্দীদের মুক্তি চাই
দমননীতি চলবে না আর
লক্ষ কণ্ঠে হাঁক মার
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর ॥

গণতন্ত্রের অধিকার চাই
মানুষের মত বাঁচতে চাই
কিষাণ মজুর মধ্যবিত্ত
শিকল ভাংবার পণ কর
বন্দ্ কর সব বন্দ্ কর ॥

পূর্ব-পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রিয় প্রগতিবাদী ঢাকার দৈনিক সংবাদ তাঁদের ২৯শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় 'দমননীতি বিরোধী দিবসে শপথ ও হুঁশিয়ারী'-শীর্ষক একটি স্মরণীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন :

'বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের বিভিন্ন ধরনের অবিরাম ও ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর সারা পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের সর্বস্তরের জনসাধারণ অযুতনিযুত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইতেছেন। আজ হরতাল, আজ গণজমায়েত, আজ মিছিল। আইনসঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের সমষ্টিগত অভিমত জানাইবার এইগুলি সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি। সম্মিলিত বিরোধীদল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এই কারণেই তাঁহারা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল, মিছিল ও জনসভা করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন। জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় এবং শান্তি তাহাদের চোখের মণি। জনসাধারণ নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দমন-নীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ দিবসে সাড়া দিয়াছেন। সরকারের অবিশ্রান্ত দমনমূলক নীতি ও ব্যবস্থাগুলি যে জনসাধারণকে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও অবমাননার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, একথা প্রকাশ্যে সারা দেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একত্রিতভাবে জানাইয়া দেওয়াই এই প্রতিবাদ-দিবসের উদ্দেশ্য। কোটি-কোটি নরনারী ও শিশুর এই সম্মিলিত প্রকাশ্য ঘোষণার জন্যই হরতাল, জনসভা, মিছিল। ক্ষমতাসীন চক্রের কাছে জনগণের একটি শান্তিপূর্ণ দাবী, একটি শান্তিপূর্ণ ঘোষণা : দমননীতি প্রত্যাহার করিতে হইবে। জনগণের জন্মগত অধিকার গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, তাহা দিতে হইবে। মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা, সভা করার স্বাধীনতা, ছাপাখানার স্বাধীনতা, ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী পেশ করার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। এই স্বাধীনতাও জনগণের চোখের মণি। জনগণের এই স্বাধীনতা চাই-ই।

দমননীতি দ্বারা জনগণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া বশংবদ ও 'জী হুজুরে' পরিণত করার জন্য যে শাসকচক্র অবিরত প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে, তাহারা জনগণের স্বাধিকার-দাবীর এই দেশব্যাপী ন্যায়সঙ্গত ঘোষণার প্রস্তুতিকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গত কয়েকদিন যাবৎ শাসকচক্র প্রচারণা চালাইয়া ২৯শে সেপ্টেম্বরের গণআয়োজনকে ব্যাহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাহারা চট্টগ্রামে শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে হামলা চালাইয়া স্থানীয় জনগণের মনোবলকে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এই বলিয়া যে, এই প্রতিবাদ দিবস বিরোধীদলসমূহের একটি কৌশলগত ব্যাপার। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমাজ-বিরোধী লোকেরা এই প্রতিবাদ দিবসের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা বলিয়া নিতান্ত দায়িত্বশীল সরকারী মহল হইতেও জনসাধারণকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ হরতাল, জনসভা ও মিছিল হইতে প্রকারন্তরে দূরে সরাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে। এতদ্বারা একটি সম্পূর্ণ আন্তরিক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে পূর্ব হইতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বলিয়া কলঙ্কিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ শাসকচক্র জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নমনীয়তা প্রকাশের পরিবর্তে ২৯শে সেপ্টেম্বরকে চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

এই অবস্থায় আমাদিগকে তথা জনগণকে আরও বেশী সচেতন, আরও বেশী সজাগ হইতে হইবে। জনগণ প্রথমতঃ অধিকার আদায়ের অবিচলিত শপথ জ্ঞাপনের জন্য শান্তিপূর্ণ হরতাল, জনসভা ও মিছিলে দলে দলে যোগদান করিবেন। দ্বিতীয়তঃ জনগণ খেয়াল রাখিবেন যে, জনতার কাতার হইতে কেহ যেন কোন রকম প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়া বসেন। একথা দেশবাসীর মর্মে-মর্মে জানা আছে যে, উত্তেজনা নয়, অলঙ্ঘনীয় শপথ। অধীরতা নয়, দুর্দমনীয় অগ্রগতি। একের কৃতিত্ব নয়, সার্বিক পদক্ষেপ। বিরক্তি নয়, ধৈর্য।

ইহারাই পূর্বে ছিল জনগণের সংগ্রামের সাফল্যের শর্তস্বরূপ। আজিকার মহান প্রতিবাদ দিবসেরও ইহারাই হইতেছে সাফল্যের শর্তস্বরূপ। বিরোধীদলসমূহ কর্তৃক এ শর্ত পালিত হইবে, ইহা আমরা জানি। কাজেই এই প্রতিবাদ দিবসকে ব্যাহত করিবার জন্য যাহারা ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, তাহারাই যে কোন প্ররোচনার জন্য দায়ী থকিবে।'

পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র সমাজের ওপর পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খানের ন্যাক্করজনক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আয়ুবের প্রিয়পাত্র জেনারেল আজম খান সামরিক শাসনের গোড়ায় পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। উপর্যুপরি বন্যায় পূর্ব-পাকিস্তান কয়েক বছর অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। জেনারেল আজম খান দুঃস্থের সেবা করে এবং দুর্নীতিরোধের চেষ্টা করে পূর্ব-বঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তাই হোল তাঁর কাল। আজম খানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়া দেখে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান তাঁকে পদচ্যুত করলেন। তাঁর জায়গায় বসালেন ময়মনসিংহের এক অখ্যাত উকিল মোনেম খানকে। ময়মনসিংহের মোনেম খান এবং খুলনার সবুর খান সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে একদল আয়ুব-ক্রীড়নক সৃষ্টি হোল। মোনেম-সবুর ক্রীড়নক-গোষ্ঠি হোল পূর্বাঞ্চলে আয়ুবের এজেন্ট ও শিখণ্ডী। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২৯শে সেপ্টেম্বর ইত্যাদি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষ্পেষণে গভর্নর মোনেম খানের অত্যাচারী ও ঘৃণ্য ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পরে আয়ুবের এই পদলেহীটির প্রসঙ্গ আরও আসবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রদের বাইশ-দফা দাবীর ত্রয়োদশ দাবীতে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করা বলা হয়েছে যে সরকারের চরম বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পশ্চিম-পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষার সকল স্তরে মারাত্মক

রকম ভাবে পশ্চাদ্‌গামী হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৯৬৭ সালের শেষাশেষি ঢাকায় এক ছাত্র সম্মেলনের অর্থনৈতিক প্রদর্শনীতে পূর্ব-পাকিস্তানে অভূতপূর্ব শিক্ষা সম্প্রসারণের যে গর্ব পাকিস্তানের শাসনকর্তারা প্রকাশ করে থাকেন তার একটি যথার্থ চিত্র দেখান হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর বিস্তারিত তথ্য ঢাকার সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। এমন কি প্রেস ট্রাসট্ অফ পাকিস্তানের যে বাংলা দৈনিকটি (দৈনিক পাকিস্তান) মাত্র কয়েকদিন আগে তাদের বর্ষ সুরু সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ' সংবাদ প্রকাশের গর্ব করেছে তারাও প্রদর্শনীর তুলনামূলক চিত্রটি বেমালুম হজম করে ফেলেছে, প্রকাশ করেনি। প্রকাশ করলে থলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।

যাই হোক, প্রদর্শনীতে দেখানো পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৫ শো। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত ঐ সংখ্যা বেড়েছে মাত্র আড়াই হাজারের মত। ঠিক একই সময় অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ হাজার। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ হাজার ৫ শো-তে। অর্থাৎ বেড়েছে প্রায় ১৮ হাজার ৫ শোর মত। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। ১৯৬৩ সালে অর্থাৎ বারো বছরে ৮ শো স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ২ শোতে। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনেক কম ছিল—মাত্র ২৭ হাজার ৫ শো। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজারে।

ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'পূর্বদেশ' তাঁদের ২৬শে মে,

১৯৬৮ তারিখের সংখ্যায় 'প্রদেশে শিক্ষা বিস্তার ও সরকারী ভাষ্য'-শীর্ষক যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছিলেন তাতে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ এই দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করেছিলেন। তারা যা লিখেছিলেন এখানে হুবহু তা উদ্ধৃত করছি :

বর্তমান ক্ষমতাসীনরা উঠতে-বসতে দেশে যা কিছু মন্দ তার জন্য প্রবীণ রাজনীতিকদের দোষারোপ করেন। শুধু তাই নয়, কেহ কেহ এমন ভাষাও প্রয়োগ করেন যা রাজনৈতিক শালীনতা বর্জিত। একই নিশ্বাসে তারা বিগত দশ বছরে অর্থাৎ তাদের আমলে দেশে যে 'দুধের নহর' সৃষ্টি করা হয়েছে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে থাকেন, বর্তমানে দেশে যে জীবনস্পন্দন দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে তা' আর কোনদিন দেখা দেয়নি।

একটি কথা এখানে সর্বাগ্রে বলা প্রয়োজন যে, কেবল শিল্পায়ন এবং কৃষি উন্নয়নের দ্বারাই একটি জাতির প্রকৃত উন্নয়ন নির্ণিত হয় না। শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠি। সুতরাং বিগত দশ বছরে এক্ষেত্রে পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানে কতটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে, এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, ১৯৫৮ সালের আগে যেখানে ২৬ হাজার প্রাইমারী স্কুলে ২৮ লক্ষ ছাত্র ও ৭৪ হাজার শিক্ষক ছিলেন সেখানে বর্তমানে ২৯ হাজার প্রাইমারী স্কুলে ৪৬ লক্ষাধিক ছাত্র ও লক্ষাধিক শিক্ষক রয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী একথা স্বীকার করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রদেশে শিক্ষাখাতে ১২৩ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা থাকলেও ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ৪২ কোটি টাকা।

শিক্ষামন্ত্রীর এই দাবী হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু এই প্রদেশে বিগত দশ বছরে উচ্চশিক্ষার হার কিভাবে হ্রাস

পেয়েছে, সে সত্য কথাটি শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেননি। তা' ছাড়া প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের বেলায়ও পুরোপুরি হিসেব দেওয়া হয়নি। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বিগত ২০ বছরে প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের বেলায়ও পুরোপুরি হিসেব দেওয়া হয়নি। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বিগত ২০ বছরে প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৬৮ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রাইমারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৮২০, ১৯৬৬-৬৭ সালে তা ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫২৮ এ উন্নীত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা-মন্ত্রীর প্রদত্ত সংখ্যা এবং পরিসংখ্যানের হিসাবে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। যদি এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানকে সঠিক বলে ধরা যায়, তবে বলতে হবে যে, ৬ কোটি লোক অধ্যুষিত প্রদেশে বিশ বছরের ব্যবধানে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার নতুন প্রাইমারী শিক্ষার্থীর শিক্ষায়তনে আগমন কোন গৌরবের কথা নয়।

প্রাইমারী শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাশ্যজনক হার থেকে অনুমান করা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ক'জন উচ্চ শিক্ষায়তনের দুয়ারে পৌঁছার সুযোগ পায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, '৪৭'-৪৮ সালে স্কুল সুরু করে মাত্র ১৭ হাজার শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত কলেজে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। আর এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪ লক্ষ ছাত্র স্কুল সুরু করে ৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে মাত্র ৪৯ হাজার পাঁচশত ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়।

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, বিগত ১৯ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে ৫৭ হাজার গ্রাজুয়েট তৈরী হয়েছে। এই সময়ে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ার তৈরী হয়েছেন ২৪৪০ জন। একথা শিক্ষামন্ত্রীও জানেন যে, স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা বেশী ছিল। অথচ এখন হিসাব করলে দেখা যাবে যে, পশ্চিম-পাকিস্তানে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তান অপেক্ষা বেশী। এতে বোঝা যায় যে, বিগত দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষা উন্নয়নে

যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, পশ্চিম-পাকিস্তানে চালানো হয়েছে তার অনেক বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত ১২৩ কোটি টাকার মধ্যে ৮১ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত তারা পাননি। কেন, সে ব্যাখ্যাও পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। শিক্ষামন্ত্রী যদি একই সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত এবং ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব দিতেন তবে তা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হতো। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও তারা শুধু এখানকার হিসাব দিয়ে দায় সেরেছেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে নিকট-ভবিষ্যতে। কারণ, কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৬০ এবং '৬৫ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে গ্রাজুয়েট এবং এম. এ. উত্তীর্ণদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ৩৪ জন। এদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানীদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪৭ হাজার ৪৭ জন। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্থানে গ্রাজুয়েট ছিলেন ৪১ হাজার ৫ শত ৪ জন। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ৩১ হাজার ৪ শত ৭০ জনে হ্রাস পায়। অপরপক্ষে একই সময়ে এম. এ. উত্তীর্ণদের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ১ শত ১৭ জন। এই সংখ্যা ৭ হাজার ১ শত ৪৬ জনে হ্রাস পায়।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষার্থীদের হার শতকরা যথাক্রমে ২১ ও ২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন পূর্ব পাকিস্তানে তা শতকরা ৩২ ও ১২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং প্রদেশে শিক্ষার আলো সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ যে দাবী করেন, তা তাদের নথিপত্রের পরিসংখ্যানেই একান্তভাবে অসার প্রতিপন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে এক্ষেত্রে যে টেম্পো ছিল, তাও অব্যাহত রাখতে তারা সক্ষম হননি। যা তারা পেরেছেন, তা হলো

সংখ্যার জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ঢালাও প্রচার করে জনমনকে বিভ্রান্ত করতে।

এতো গেলো একদিক। এর অপর দিক আরও করুণ, আরও মর্মান্তিক। যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষায়তনে আসার সুযোগ পায় তাদের হিসাবই ধরা হয়েছে। কিন্তু কত লক্ষ কচি শিশু প্রতি বছর শিক্ষার আলোক এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার হিসাব কোথায়? একথা কি কর্তৃপক্ষ কোনদিন ভেবে দেখেছেন যে, এদেশের হাজার হাজার গরীব অভিভাবক দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে মাসুম বাচ্চাদের মেরুদণ্ড শক্ত হওয়ার পূর্বেই নির্মম ক্ষুধার তাড়নায় তাদের কল-কারখানা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমবৃত্তিতে নিয়োগ করে থাকেন। আজ যে-কোন দিকেই তাকান যাক, সর্বত্র শিশু শ্রমিকদের জীবনের ঘানি টেনে চলার নির্মম করুণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বর্তমাম সরকার একান্তভাবে কল্যাণকামী সরকার বলে দাবী করেন। কিন্তু জীবনের গুরুভার বহনে অক্ষম হয়ে কত অভিভাবক এমনি ভাবে তাদের সন্তানদের শ্রমবৃত্তিতে নিয়োগে বাধ্য হয়ে জাতির ভবিষ্যতকে সংশয়ান্বিত করে তুলছেন তার কোন পরিসংখ্যান কি আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একথা কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন যে, যে ক'জন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে তার তিনগুণ বেশী প্রতি বছরই অজ্ঞতার অন্ধকারে নির্বাসিত হচ্ছে? সুতরাং প্রকৃত পরিস্থিতি যেখানে এরকম, সেখানে অতীতের কাসুন্দি না ঘেঁটে সমাজের সর্বস্তরে কিভাবে শিক্ষার আলোক পৌঁছিয়ে জাতির চলার পথকে সহজ এবং গতিশীল করে তোলা যায় তজ্জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমরা শুধু বলতে চাই যে, কর্তৃপক্ষ প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবন করুন। এই পরিস্থিতি আরামপ্রদ নয়, এই পরিস্থিতিকে সহজ করতে হলে অনেক বেশী চিন্তা এবং কর্মতৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে সাফল্য লাভের চেয়ে ব্যর্থতা আসবে বেশী। আর সেই

ব্যর্থতা স্বীকারই কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার প্রমাণ দেবে। তারা জানেন যে, তাদের আমলে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল দিক থেকে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যা স্বীকার না করে যদি তারা প্রতিপক্ষের উপর কেবল অহেতুক ঝাল মেটাতে চান তবে তা জাতির সেবার চেয়ে অহিত সাধন করবে অনেক বেশী।'

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে ১৯৬১ সালের আদম সুমারী সম্পর্কে যে সব বিশ্লেষক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে চাঞ্চল্যকর একটি তথ্য হচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানে সুপরিকল্পিত ভাবে শিক্ষা সঙ্কোচন এবং দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য সম্পর্কে।

প্রথমটায় এ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে তেমন আলোড়ন হয়নি। পূর্ব-বঙ্গে বৈষম্যের এতরকম চেহারা—এ বৈষম্য শিল্প, বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে—এক কথায় বৈষম্যের এমনি বিচিত্র হাট যে তারমধ্যে দিশেহারা হয়ে প্রদেশবাসী হয়ত শিক্ষাগত প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত কম জরুরী মনে করেছিলেন। এই ঔদাসীন্যের পেছনে হয়ত এই মনোভাব ছিল যে দশ ঘার ওপর আর ঘা, এমন আর কি!

সুবিদিত ও বহু আলোচিত শিল্প বাণিজ্য ও চাকরির বৈষম্যের মত স্বাধীনতার পরে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে যে শিক্ষাগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকৃতই চাঞ্চল্যকর। এ বৈষম্য দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক ব্যবধানের মতই সুদূর প্রসারিত।

১৯৬১ সালের আদমসুমারীর তথ্য অবলম্বনে ১৯৫১ সালের তুলনায় পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতির যে চিত্র পাওয়া যায় তা এই রকম :

১. পূর্ব-পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৩২·৩ জন কমে গিয়েছে, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ ডিগ্রিধারী শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২১·৩ জন বেড়েছে।

২. পূর্ব-পাকিস্তানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা শতকরা ১২ জন কমেছে কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ ডিগ্রিধারীর সংখ্যা শতকরা ৬৮'৬ জন বেড়েছে,

৩. পূর্ব-পাকিস্তানে ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা মাত্র ৬'৩ জন, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৪৩'৭ জন।

৪. পশ্চিম-পাকিস্তানে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি-ধারিণী মহিলাদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের অনুরূপ মহিলাদের তুলনায় প্রায় সাত গুণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গের মান যে নিম্নাভিমুখী তা উপরের তথ্যগুলি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। এমন নৈরাশ্যব্যঞ্জক পরিস্থিতি মনে হয় অবিশ্বাস্য, কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কয়েকবছর আগে যে 'ভোটাধিকার কমিশন' নিয়োগ করেছিলেন (যার চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব আখতার হোসেন এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান হাইকোর্টের দু-জন বিচারপতি যথাক্রমে জনাব এম. আর. খান ও জনাব মাসুদ আহমদ), তার রিপোর্টেও এই তথ্যগুলি পাওয়া গিয়েছিল :

ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট-উত্তীর্ণদের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৫১	১৯৬১	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
পূর্ব-পাকিস্তান	২,৮২,১৫৮	২,৯৯,৯৬৭	৬'৩ (বৃদ্ধি)
পশ্চিম-পাকিস্তান	২,৩৯,৭৯৮	৫,৮৪,১৮১	১৪৩'৭ (বৃদ্ধি)

গ্রাজুয়েট ডিগ্রি-প্রাপ্তদের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৫১	১৯৬১	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
পূর্ব-পাকিস্তান	৪১,৪৮৪	২৮,০৬৯	৩২'৩ (হ্রাস)
পশ্চিম-পাকিস্তান	৪৪,৫০৪	৫৪,০০০	২১'৩ (বৃদ্ধি)

পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রাপ্তদের সংখ্যা

প্রদেশ	১৯৫১	১৯৬১	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
পূর্ব-পাকিস্তান	৮,১১৭	৭,১৪৬	১২.০ (হ্রাস)
পশ্চিম-পাকিস্তান	১৪,৪২৯	২৪,৩২৪	৬৮.৬ (বৃদ্ধি)

উপরের তথ্যে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট ও গ্রাজুয়েট শিক্ষিতের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ।

অবিশ্বাস্য হলেও তথ্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে পাকিস্তান সরকারের বহুল পুনরাবৃত্ত একটি কথা এসে পড়ে। সরকারী চাকরিতে সংখ্যা-সাম্যের দাবীর জবাবে তাঁরা বলেন : বাংলাদেশে 'উপযুক্ত' প্রার্থী পাওয়া যায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের এই ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ যে কেন্দ্রীয় ও তাদের হুকুম-বরদার প্রাদেশিক সরকারের অবহেলা সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পত্রিকা পাকিস্তান কোয়ার্টার্লি-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাখাতে পূর্ব-পাকিস্তানে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বছরে যেখানে পাঁচ টাকা সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানে এ খরচ প্রায় দশ টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণ।

দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—একটি ঢাকায় এবং আর একটি লাহোরে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে আর মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে—রাজশাহীতে। অবশ্য একটি কৃষি ও একটি ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সে জায়গায় পশ্চিম-পাকিস্তানে স্থাপিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তিনটি—করাচী, পেশোয়ার ও হায়দরাবাদে (সাবেক সিন্ধু প্রদেশে)। অধিকন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নয়া রাজধানী ইসলামাবাদে আর-একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

কিন্তু এতেই সব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পূর্ব-পাকিস্তানের অপেক্ষা পশ্চিম-পাকিস্তানের শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেশী না হয় বর্ধিত হল। কিন্তু ব্যাপারটা কেবল তাই নয়। দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষিতের সংখ্যা কমে গেছে, কয়েকটি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও। ফলে অনিবার্যভাবে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে :

১. কর্তৃপক্ষ কি পশ্চিম-পাকিস্তানে শিক্ষা সম্প্রসারণের এবং পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করেছেন ?

শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা গিছু দশ টাকা ব্যয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাথা পিছু পাঁচ টাকা ব্যয় কি তারই একটি প্রমাণ নয় ?

২. কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে এবং কেন্দ্র-পরিপোষিত আধা-সরকারী বিশালায়তনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে (যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাকিস্তান ইনটার ন্যাশনাল এয়ারওয়েস্ ইত্যাদি) অবাঙালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অথচ বাঙালীদের কোণঠাসা করে রাখার নীতি বহু বছর ধরে অনুসরণের ফলেই কি উচ্চশিক্ষার প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচুর আগ্রহ এবং পূর্ব-পাকিস্তানে নৈরাশ্যভাবের সৃষ্টি হয়েছে ?

পূর্ব-পাকিস্তানে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবের কথা সুবিদিত—কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা বা নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিবর্তে বেসরকারী শিক্ষায়তনগুলিকে সরকারী আয়ত্তাধীনে এনে ভর্তি সঙ্কোচন করা হচ্ছে। ছোট-ছোট বহু স্কুল থেকে সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার করার ফলে সেগুলি বন্ধ হবার মুখে।

বহু নজিরের মধ্যে দুটি : পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বরিশালের ব্রজমোহন কলেজকে বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু সরকার এর পরিচালন-ভার গ্রহণ করবার পর বিপুল অর্থব্যয়ে কলেজের আঙ্গিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন সত্য, কিন্তু

বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন ১৯৬৬ সালে ব্রজমোহন কলেজের মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে স্নাতক শ্রেণীর বিভিন্ন শাখায় মোট মাত্র ৪২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় (যদিও দরখাস্ত করেছিলেন ১২১৭ জন) ;—এর মধ্যে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ১৫০ জন করে ও বিজ্ঞান শাখায় ১২৫ জন নেওয়া হয়, যদিও বরিশাল জেলার অন্য কোন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক শ্রেণী নেই। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি এরকমই।

১৯৩০ সালে স্থাপিত যশোহর জেলার ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের পাশে নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত রাউতাড়া গ্রামের এম. ই. স্কুলটি কালক্রমে ১৯৬১ সালে একটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে হাইস্কুলে পরিণত হবার পর থেকে আগে এ প্রতিষ্ঠানটিকে যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হোত তা বাড়ান তো দূরের কথা সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাউতাড়া উচ্চ বিদ্যালয় আজ শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন।

এ যুগে গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রসারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। স্বাধীনতা পূর্ব আমলের তুলনায় পূর্ব-বাংলায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ছে না কমছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ পাওয়া যাবে ঢাকা শহরেই। ঢাকায় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অন্ততঃ তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার আজ বিলুপ্তির পথে—এ তিনটি হচ্ছে রামমোহন লাইব্রেরী, নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী এবং রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থাগার অবশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠানের—তবু লাইব্রেরীগুলিকে সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং সর্ব-সাধারণের ব্যবহারের জন্য কাজে লাগানো যেতো। কিন্তু সেদিকে কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নেই। শুধু ঢাকায় নয়—রাজশাহী, বগুড়া, কুমিল্লা, আরও অনেক মফঃস্বল শহরের বহু পুরানো গ্রন্থাগার এখন ধ্বংসের মুখে।

কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে এ ব্যাপারেও বৈষম্য। করাচীর 'লিয়াকৎ ন্যাশনাল লাইব্রেরী' বর্তমানে বিখ্যাত গ্রন্থাগারে পরিণত। রাওয়ালপিণ্ডির 'পাকিস্তান সংহতি কাউন্সিল' সুসজ্জিত নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার এবং ইসলামাবাদের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সেখানে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল।

পূর্ব-পাকিস্তানে লাইব্রেরীগুলির দুর্দশা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করা যাক।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁদের তাবেদার রাজ্যপাল মোনেম খান সাহেব দিবানিশি দেশের তমদ্দুন তহযীব রক্ষার কর্ণবিদারী জিগির তোলেন কিন্তু শূন্য কলসীর আওয়াজের মত তাদের বাগাড়ম্বর যে কত অসার তার পরিচয় পূর্ব-বঙ্গের সংস্কৃতিমনা মানুষ পদে পদেই পাচ্ছেন।

বরিশালের বানরিপাড়া লাইব্রেরী ও রংপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পর্কে যে সব উদ্বেগজনক তথ্য সম্প্রতি জানা গেছে তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রদেশবাসী বিশেষ আশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। বানরিপাড়া ছিল এককালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি প্রাণকেন্দ্র। নানা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এ স্থানটিকে প্রাণচঞ্চল করে রাখত। কিন্তু কালের আবর্তে বানরিপাড়ার যে লাইব্রেরীটিকে কেন্দ্র করে এই গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজ ধ্বংসোন্মুখ। যে সব কারণে প্রায় শতাব্দী কালের প্রাচীন এই ঐতিহ্যময় লাইব্রেরীটি আজ এরকম শোচনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে তা যেমন পীড়াদায়ক তেমন লজ্জা-জনকও বটে। এই পাঠাগারের অধিকাংশ বই-ই নাকি লোপাট হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী লাইব্রেরী আন্দোলনের যে ঢেউ ভারতে এসে পৌঁছোয় তারই ফলে ১৮৭৯ সালে বানরিপাড়ার এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছিল আরও বহু পুস্তকাগার।

কিন্তু আর্থিক সঙ্কট, সরকারী ঔদাসীন্য এবং সংরক্ষণ ও সুপরিচালনার অভাবে তাদের অধিকাংশই বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

উদাহরণ স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ইসলামপুরের রামমোহন লাইব্রেরীর অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির পথে।

একদা খ্যাত ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারটিরও আজ অতি জীর্ণ-দশা।

ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী-প্রতিষ্ঠান নর্থবুক হল লাইব্রেরীর বর্তমান দুর্গতির কথা সর্বজন বিদিত। এককালে পূর্ব-বঙ্গের জ্ঞান সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এই পাঠাগারটির যদিও আজ এ শোচনীয় অবস্থা, তথাপি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য কোন সুষ্ঠুব্যবস্থা অবলম্বন করবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সরকারী অবহেলা ও আর্থিক সঙ্কটে রংপুরের বাংলা সাহিত্য-সাধনার প্রাণকেন্দ্র বিখ্যাত রংপুর-সাহিত্য-পরিষদটি-ও আজ চরম দুর্দশার সম্মুখীন। এটি একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং কলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-এর প্রথম শাখা। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পরিষদটির অবদান অপরিসীম। রংপুর-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে জড়িত আছে বহু প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর নাম ও স্মৃতি। তরুণ লেখকদের নানাভাবে সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহিত করা ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর বাংলা ও আসামের নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য নিয়ে গবেষণা করা এবং প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য মূর্তি, পুঁথি-পত্র প্রভৃতি উদ্ধার ও সংরক্ষণ। কিন্তু রংপুর জেলা কর্তৃপক্ষ যে, কি কারণে সাহিত্য পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা বাড়ান দূরে থাক, তা বন্ধ করে দিয়েছেন তা কারও বোধগম্য হচ্ছে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র এ ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে কসুর করছেন না। তাদের ভাবখানা

এই : রামমোহন লাইব্রেরী ও রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারের মত পূর্ব-বঙ্গের আরও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুদের উদ্যোগে স্থাপিত ও গঠিত—অতএব এদের হাল নিয়ে মাথা ঘামানো ইসলামী জাহানের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে গুনাহ। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি-সচেতন মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে বলছেন যে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই—এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপক যারাই হোক না কেন, এদের সংরক্ষণ ও সুপরিচালনার দ্বারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতেন।

পূর্ব-পাকিস্তানেও একটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু বহু আবেদন-নিবেদনের পর পূর্ব-বঙ্গের ভাগ্যে জুটেছে একটি কেন্দ্রীয় (জাতীয় নয়) গ্রন্থাগারের প্রতিশ্রুতি মাত্র! চিকাগো থেকে ডঃ হারমান হেস্কল নামে জনৈক লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞকে পরামর্শদাতারূপে পাকিস্তান সরকার নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদে গ্রন্থাগার প্রসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

ঢাকার দৈনিক সংবাদ 'সাংস্কৃতিক বিপর্যয়'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'আমাদের সরকার তামুদ্দুনিক তরক্কী সম্পর্কে অহরহ গালভরা বুলি আওড়িয়ে থাকেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁরা যেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করছেন, তাতে তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে দেশবাসীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য তবে দেশের সর্বত্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। তবেই হবে দেশে সংস্কৃতির ও শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ।

গ্রন্থাগারের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বেলায় একই কথা। পূর্ব-বাংলার চেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ ও

অগ্রগতি অনেক বেশী। উদাহরণস্বরূপ গত বছর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আর পূর্বে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা।

এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি পূর্ব-পাকিস্তানেই কার্যকরী হোল কেন?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় কথা ছিল সমতার, সাম্যের; হয়ে গেল বৈষম্য: চাকরি, দেশরক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব থেকেই। ফলে পশ্চিম-পাকিস্তান সব ক্ষেত্রেই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে—পূর্ব-বাংলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়ছে পিছিয়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও।

পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ এক দুঃসহ অবস্থা। তবুও তাঁদের একমাত্র ভরসা এই যে এই প্রদেশের সাধারণ মানুষ, চিন্তানায়ক ও ছাত্র-সমাজ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিকারের পথ অন্বেষণ করছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের পাঠাগারগুলির দুর্দশার কথা বললাম। এই প্রসঙ্গেরই জের টেনে পূর্ব-বঙ্গে একদল অসাধু প্রকাশক কিভাবে ভারতীয় লেখকদের বই-এর চোরাই-কারবার ফলাও করে চালিয়ে যাচ্ছিলেন সে কথা বলা হয়ত বেমানান হবে না।

১৯৬৬ সালের শেষে পূর্ব-পাকিস্তানের গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকার বাংলা-বাজার, পটুয়াটুলি, আসান মঞ্জিল লেন, ও শরৎ গুপ্ত রোডের কয়েকটি প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতার দোকান, গুদাম ও দফতরী-খানায় অতর্কিত তল্লাশী চালিয়ে লেখকদের বিনানুমতিতে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে মুদ্রিত পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যিকদের লেখা আনুমানিক পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দামের বাংলা বই উদ্ধার করেছিলেন এবং তিনটি প্রকাশনী-সংস্থার মালিকসহ ষোলজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন।

এই সব পুস্তকের মধ্যে 'সঞ্চয়িতা'-সহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, জরাসন্ধ, সৈয়দ মুজতবা আলী, শংকর প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি পাওয়া যায়। সব বই বা তার অবাঁধাই ফর্মা দোকানে গুদামে ও দফতরীখানায় এত অধিক সংখ্যায় মজুত ছিল যে এইগুলি স্থানান্তরিত করতে সুবৃহৎ এক পুলিশবাহিনীকে কয়েকদিন ধরে হিমসিম খেতে হয়।

এ অসাধু ব্যবসায়ীরা ভারতীয় লেখকদের পুস্তক প্রকাশে মোটামুটি নিম্নলিখিত তিন ধরনের কারসাজি অবলম্বন করতেন বলে দেখা যায় :

(ক) পশ্চিম-বঙ্গের লেখকদের কিছু পুস্তক তারা পুনর্মুদ্রিত করেছে যাতে লেখকদের নাম ঠিকই আছে, কিন্তু প্রকাশক ও মুদ্রাকরের উভয়ের নামই ভিন্ন।

(খ) কিছু বই পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে, যাতে লেখকদের ও মুদ্রাকরের নাম অপরিবর্তিতই আছে, কিন্তু প্রকাশকের নাম ভুয়ো।

এক শ্রেণীর লোভী ও অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে সাহিত্যিক রুচিবোধ যে কি নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হতে পারে তার কলঙ্কজনক একটি নজির ঢাকা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র মুদ্রণ ও প্রচার। বিশ্বভারতী প্রকাশিত এই বইটি মুদ্রণকালে ঢাকার একটি জাল প্রকাশনী সংস্থা 'ভারতী' শব্দটি বেমালুম বাদ দিয়ে তৎস্থানে 'পাক' শব্দটি ব্যবহার করে 'সঞ্চয়িতা'র প্রকাশকের নাম দেখিয়েছিলেন 'বিশ্ব-পাক, ঢাকা'—অথচ এই বিচিত্র নামধারী কোন প্রকাশনী সংস্থা ঢাকা কেন—পূর্ব-পাকিস্তানের কোথাও নেই।

'সঞ্চয়িতা'র অপর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন উত্তরায়ণ নামে ঢাকার তথাকথিত অন্য একটি প্রকাশক গোষ্ঠি। নিউজ প্রিণ্ট কাগজে 'সঞ্চয়িতা'র আরেকটি সুলভ সংস্করণও বে-আইনীভাবে ঢাকায় মুদ্রিত হচ্ছিল।

(গ) এক শ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রাকর এতদুর দুঃসাহসী হয়ে

উঠেছিলেন যে তাঁরা পুস্তকে ভারতীয় লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের নাম যথাযথ রেখেই সে বইগুলির হুবহু সংস্করণ ঢাকা শহরে বসেই ছেপে বাজারে ছাড়ছিলেন।

অতি সহজভাবেই এ সব অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপ নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছিল। লেখকদের রয়ালটি বা টাকা-পয়সা কানা-কড়িও দিতে হচ্ছিল না—বইগুলির সুনাম ও চাহিদা আগে থেকেই প্রচুর থাকায় এগুলি হু-হু করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। ফলে একটার পর একটা স্থানীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হচ্ছিল।

অথচ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'ইস্ট পাকিস্তান পাবলিকেশন অব বুকস (রেগুলেশন অ্যাণ্ড কন্ট্রোল)' নামে চালু একটি অর্ডিনান্সের তিন নং ধারা অনুযায়ী পাকিস্তানের বাইরে প্রকাশিত ও মুদ্রিত কোন পুস্তক কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল যে এ বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও এ বইগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল কি করে?

এ কথা সত্যি যে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ভারতীয় লেখকদের রচিত কয়েকটি সাহিত্য-পুস্তকের অভাব পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজকে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলেছিল, কিন্তু তাদের অসুবিধার কথাটা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনানুগ পথে বইগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা সে চেষ্টা করেননি। বইগুলির প্রয়োজনের তাগিদ লক্ষ্য করে প্রথমে ঢাকার দু-একজন প্রকাশক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত কয়েকটি বই স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করে দেখলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে এগুলির চাহিদা ব্যাপক এবং এ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারলে তাঁরা অদূর-ভবিষ্যতে বিনা আয়াসে প্রভূত বিত্তশালী হয়ে উঠবেন। ফলে ক্রমশ এরা এবং অন্যান্য কিছু লোভী ব্যবসায়ীদের হাতের শিকার হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'

তারাশঙ্করের 'কবি' বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এর মত অমূল্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

অজস্র ভুলভ্রান্তি সম্বলিত এবং বে-আইনী ও রুচি-বিহর্গিত পথে ঢাকার মুদ্রিত কবিগুরু-সহ পশ্চিম-বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক-বৃন্দের জনপ্রিয় বইগুলির পাকিস্তানী সংস্করণ পূর্ব-বঙ্গের কৃষ্টিবান ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের ব্যথিত, উদ্বিগ্ন ও প্রতিবাদমুখর করে তুলেছিল। বিলম্বিত হলেও এই অর্থ-লোভী অসৎ পুস্তক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযানকে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। উপরন্তু তাঁরা বক্তব্য পেশ করেছিলেন: ঢাকার সরকারী সংস্থা 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' নজরুল রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছেন—সুন্দর একটি সংস্করণ। অনুমেয় যে এ কাজ তাঁরা আইনানুগ পথেই করেছেন। যেহেতু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা পশ্চিম-বঙ্গের অগ্রণী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি বাদ দিয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য কল্পনামাত্রও করা যায় না, সে-হেতু এদের রচনা পূর্ব-বঙ্গের প্রকাশের দায়িত্বও যদি ঢাকার বাংলা একাডেমী লেখকদের অনুমতি সংগ্রহ করে স্বহস্তে তুলে নেন তবে এই সব অমূল্য সাহিত্যসম্ভার হয়ে উঠবে পাকিস্তানের বাঙালী জাতির মার্জিতমনা বৈদগ্ধের উপকরণ ও পরিচায়ক।

এখন পূর্ব-পাকিস্তানের জাগ্রত ছাত্র-সমাজের গৌরবজ্জ্বল ভূমিকার কাহিনীতে আবার ফিরে আসা যাক। পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ দুর্নিবার গতিতে মোকাবিলা করতে নেমেছিলেন আয়ুবের জালেম-শাহীর বিরুদ্ধে এবং এই সেদিন আয়ুব-শাহীকে শেষ আঘাত হেনে তার সমাধি রচনা করেছিলেন এই উদ্দীপিত ছাত্র-সমাজই।

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র গোষ্ঠী আর কোন স্তোক বাক্য শুনতে চায়নি, কোন সান্ত্বনার বাণী শুনতে চায়নি। শিক্ষার নামে সুপরিকল্পিত শিক্ষাসঙ্কোচনের সরকারী চক্রান্তকে তারা মেনে নিতে

চায়নি। জঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে অন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা মেনে নেয়নি—তারা দাবী জানিয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের। কিন্তু তাদের দাবী নির্মম শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করেনি—মদমত্ত হয়ে তারা বার-বার ছাত্র-আন্দোলনকে বেয়নেট, গুলি, টিয়ার গ্যাস দিয়ে রক্তাপ্লুত করে তুলেছে। সারা পূর্ব-পাকিস্তানের মাটি বার-বার ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। আয়ুব-শাহীর পুলিশ অবাধে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিতর প্রবেশ করে লাঠি চালিয়েছে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে, গুলি বর্ষণ করেছে কিন্তু এ অত্যাচারের সামনে কিন্তু মাথা নত করেনি পূর্ব-পাকিস্তানের নির্ভীক-ছাত্র সমাজ, যাদের কাছে জীবন ও মৃত্যু দুই-ই পায়ের ভৃত্য এবং চিত্ত ভাবনাহীন। এ রকম ছাত্র-প্রতিরোধের অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে একটি আমি এখন শোনাব, সে কাহিনী পূর্ব-বঙ্গের শিক্ষা জগতে কয়েকটি সরকারী কালাকানুনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-সমাজের প্রতিবাদের, আলোড়নের ও আন্দোলনের কাহিনী।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেন ১৯৬৬ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে যশোরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ব-বঙ্গের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। কিন্তু রাওলপিণ্ডির কুক্ষিগত প্রাদেশিক সরকারের হস্তক্ষেপ ও খামখেয়ালীপনার পরিণতিতে সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনিকাল ইউনিভার্সিটিতে (প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়) উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুধাবন করলে শিক্ষা-উজীরের উক্তি যে কতো আসার ছিল তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।

পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুবের সুযোগ্য প্রতিনিধিরা মুখে অহরহ বলতেন—'প্রদেশে ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা বাড়াও' কিন্তু কাজে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অনুসরণ করছিলেন সুপরিকল্পিত এক 'শিক্ষা সঙ্কোচন' ও 'বৈষম্যমূলক নীতি'—উদ্দেশ্য, অন্ততঃ কাগজে-

কলমে পূর্ব-পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিমে অধিক সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার সৃষ্টি করা—তাদের মেধাগত বা শিক্ষাগত উৎকর্ষ যা-ই থাকুক না কেন।

পূর্ব-পাকিস্তানে 'ভাল ইঞ্জিনীয়ার গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যে' (সরকারী ভাষ্য মতে) ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত কয়েকটি অদ্ভুত নিয়ম-কানুন (যাকে পূর্ব-বঙ্গের ছাত্র-সমাজ 'কালাকানুন' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন) রদ করবার ঐক্যবদ্ধ দাবী উপেক্ষিত হওয়ার প্রতিবাদে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন তাদের অভিযোগের প্রতি উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণের শেষচেষ্টা হিসাবে এক প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। এই আন্দোলনের অন্যতম মূল দাবী ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ম-কানুনের মধ্যে সমতা 'বিধান করা'। কিন্তু একদিনের এই ধর্মঘটের পরেই কর্তৃপক্ষ শুধু যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাই নয়, সেদিনই রাত ১২টার মধ্যে আবাসিক ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে তাদের চরম দুর্বিপাকের মধ্যে ফেলেছিলেন।

ছাত্র প্রতিনিধিদের একটি দল উপাচার্য ডাঃ এম. এ. রশিদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আমরা অবিলম্বে ক্লাসে যোগদান করতে ইচ্ছুক, আপনি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার আদেশ প্রত্যাহার করুন।' কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলবার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও হোস্টেল প্রাঙ্গণের মধ্যে পুলিস এনে বসানো হয়েছিল।

২৮শে জুনের ছাত্র ধর্মঘট সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। দৈনিক 'সংবাদ' ২৩শে জুলাই (১৯৬৬) 'প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খোলা হউক'-শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে

একদিনের ছাত্র ধর্মঘটের জন্য দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রাখাকে 'রোগী মেরে রোগ সারানোর হাতুড়ে পদ্ধতি' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

যে কালাকানুনগুলির বিরুদ্ধে ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের এই আন্দোলন সেগুলি কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানেই অনন্যভাবে চালু করা হয়েছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে এ ধরনের কোন নিয়ম আরোপ করা হয়নি।

এখন বিতর্কমূলক এই কানুনগুলির কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক—

(ক) **সিমেস্টার প্রথা**: বছরে দুটো সিমেস্টার বা অর্ধ বাৎসরিক সেসন। প্রথমটি অক্টোবর থেকে মার্চ এবং দ্বিতীয়টি এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর। কোন ছাত্র যদি এক সিমেস্টারে পাস করে তবে তাকে ছ-মাসের জন্য পরবর্তী সিমেস্টারে প্রমোশন দেওয়া হয়। কিন্তু ফেল করলে সে একবছর পিছিয়ে পড়ে। অর্থাৎ যদি কেউ দ্বিতীয় সিমেস্টারে ফেল করে তবে তাকে ছ-মাস বসে থেকে পরের বছর দ্বিতীয় সিমেস্টারের গোড়া অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকেই আবার কোরস সুরু করতে হয়। তাই ছাত্রদের মধ্যে দাবী উঠেছিল 'যেহেতু পাস করলে আমরা ছ-মাস এগোই, সেহেতু ফেল করলেও যেন ছ-মাসের বেশী পিছিয়ে না পড়ি।'

(খ) **ক্লাস দেওয়ার পদ্ধতি**: আগে কোন ছাত্রের ক্লাস দেওয়া হোত চতুর্থ বর্ষের শেষ পরীক্ষার ফলাফলের উপর। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়ম চালু করলেন যে প্রতি সিমেস্টারে অর্থাৎ প্রতি ছ-মাসের মধ্যে দুটি করে পরীক্ষা হবে—চার বছরে মোট ষোলটি এবং এই সবকটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ক্লাস নির্ধারিত হবে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক। নানা আর্থিক অনটন ও অদৃষ্টপূর্ব বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়ে তাদের লেখাপড়া করতে হয়। তাই প্রতি তিন

মাস পরপর পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে অনেকের ভাগ্যেই "পাস ক্লাস" ছাড়া বেশী কিছু জোটে না।

(গ) **৭৫% রুল:** এক সিমেস্টারে দুটো পরীক্ষা হয়। পার্ট-'এ' ও পার্ট 'বি', আগে কোন ছাত্র দুটো পরীক্ষার নম্বর মিলিয়ে পাস করতে পারতো—অসুস্থ থাকার জন্য বা অন্য কোন কারণে একটি পরীক্ষা দিতে না পারলে সাপলিমেণ্টারী পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নতুন কানুনের ফলে প্রথম পরীক্ষায় কোন কারণে ফেল করলে তার জন্য সাপলিমেণ্টারী পেতে হলে দ্বিতীয় পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭৫ ভাগ বিষয়ে পাস করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল—সাপলিমেণ্টারী পরীক্ষা যেহেতু প্রথম পরীক্ষার পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলাফলের সম্পর্ক কি?

(ঘ) **৬০% (প্রথম শ্রেণী) রুল:** ফার্স্ট ক্লাস পেতে হলে প্র্যাকটিকাল ও থিওরেটিকাল পরীক্ষায় পৃথকভাবে ৬০% নম্বর পেতে হবে। অর্থাৎ কোন ছাত্র থিওরিটিকাল বিষয়ে ৮০% নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬০% না পেলে প্রথম শ্রেণী পাবে না।

(ঙ) **অটোমেশন প্রথা:** কোন ছাত্র প্রথম বা দ্বিতীয় সিমেস্টার পরীক্ষায় ৫০% নম্বর না পেলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হবে।

(চ) **পাস ক্লাস প্রবর্তন:** আগে ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ও দ্বিতীয়—মাত্র এই দুটো ক্লাস দেওয়া হোত। কিন্তু এখন পাস ক্লাস সৃষ্টি করে সারা পাকিস্তানে পাস ক্লাসে উত্তীর্ণ অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার একমাত্র এই প্রদেশ থেকেই উৎপাদন করার আয়োজন করা হয়েছে।

উপরোক্ত নিয়মকানুনগুলি প্রবর্তনের ফলে এই প্রতিষ্ঠানে ফেল-করা ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অনেকে পিছিয়ে পড়ে আবার কেউ-কেউ এই নয়া রেগুলেশনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়

ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে ঢাকায় ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের প্রায় ৪০% ভাগেরও বেশী একবার বা দু-বার ফেল করেছেন। গত ১৯৬৩-৬৪ সালে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২৪০ থেকে বাড়িয়ে ৩৬০ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই বছরের ছাত্ররা—যারা ১৯৬৬ সালে তৃতীয় বর্ষে পাঠরত ছিল তাদের সংখ্যা মাত্র ২৫৫ জন। বাকী ছাত্রদের ফেল করিয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রকারান্তরে আগের মতই রাখা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র জনাব ফজলুল করিম দৈনিক সংবাদের সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরীকে ১৪ই জুলাই ১৯৬৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন: 'জনসাধারণ যদিও জানেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—প্রকৃত পক্ষে তা মোটেই সত্য নয়। জনসাধারণকে শুধু মাত্র ধোঁকা দেওয়াই হচ্ছে। এটা পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিরই একটি প্রকট রূপ।'

এইসব ব্যবস্থার ফলে ঢাকার কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগণ্য সংখ্যক ছাত্রই প্রথম শ্রেণী পাচ্ছেন। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বহু সংখ্যক ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ—১৯৬৫ সালে করাচী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল বিভাগে ১২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২৬ জনকেই প্রথম শ্রেণী দেওয়া হয়—অথচ এই একই বিভাগে ঢাকার ১৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১২ জন ফার্স্ট-ক্লাস পান এবং ৪০ জন ফেল করেন।

ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকরিগুলিতে পূর্ব-পাকিস্তানের ইঞ্জিনীয়াররা সহজে মনোনীত হন না।—দেশী অথবা বিদেশী বৃত্তি অর্জনে তাঁরা পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেন না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া 'ক্লাস' দেখেই তাঁদের যোগ্যতা বিচার করা হয়। বৈষম্যের কথা তুললেই পিণ্ডি থেকে বলা হয় পূর্ব-পাকিস্তানী ছাত্রদের মান পশ্চিমের ছেলেদের থেকে

অনেক নীচু। ২৪শে জুন (১৯৬৬) ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে এস্‌টাবলিশমেণ্ট বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ সাফ জবাব দেন যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রদের যোগ্যতা আশানুরূপ নয় বলে তারা উচ্চপদগুলি অধিকার করতে সক্ষম হন না।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রদের মান সত্যিই কি পশ্চিমের তুলনায় নীচে ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, সাধারণ সম্পাদক জনাব শফি আহমদ সহ পর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতারা কর্তৃপক্ষের ছাত্র দমননীতির তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, 'নির্যাতনমূলক এই সব কালাকানুন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবর্তন করে আয়ুব সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা এই প্রদেশের কারিগরি শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত ও সঙ্কুচিত এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ইঞ্জিনীয়ারদের ভবিষ্যৎ বানচাল করার এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।'

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় পরিষদে বিরোধী-দলের নেতা জনাব নুরুল আমীন ২১শে জুলাই ১৯৬৬ তারিখে ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেন যে, 'সরকারের সুপরিকল্পিত এক নীতির ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্ররা পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে।'

মৌলানা ভাসানী আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, 'পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের সকল অংশের মত এ প্রদেশের ছাত্রসমাজও স্বৈরাচারী সরকারের চরম উপেক্ষা ও জুলুম নীতির শিকারে পরিণত হয়েছে।'

পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল, ছাত্র সমাজ ও অভিভাবকদের তরফ থেকে দাবী ওঠে : 'অবিলম্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হোক এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের মান এবং নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পূর্ব-পাকিস্তানে কারিগরি শিক্ষার নীতি নির্ধারিত হোক।'

কিন্তু এ দাবীর প্রতি কর্ণপাত করা দূরের কথা উপাচার্য ডাঃ রশিদ নির্লজ্জভাবে ছত্রেদের উপর গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত হন। তিনি ৪ঠা জুলাই ১৯৬৬ তারিখে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি গোপন নির্দেশনামা জারী করে ছাত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁকে খবরাখবর সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেন।

এই সার্কুলারটি যা 'শিক্ষজগতে নজিরবিহীন' বলে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র ধিক্কৃত হয় তার একটি অনুলিপি হুবহু এখানে তুলে দেওয়া হোল—

পূর্ব-পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়-ঢাকা

মেমো নং : আর ৮১৩৪ (৪০০) তারিখ : ৪-৭-৬৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফের সকল সদস্যগণকে সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় যে সকল ছাত্রগণকে তাঁহারা বক্তৃতা দান করিতে, শ্লোগান দিতে অথবা অন্য উপায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন। ইহা ছাড়া এই সংক্রান্ত কোন তথ্য সরবরাহ করিলে সে সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইবে। এই ধরনের তথ্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানাইতে হইবে।

স্বাক্ষর : এম. এ. রশিদ
ভাইস চ্যান্সেলর

জনাব আবদুল মালিক উকীল, জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন, জনাব আহমেদুল কবীর, শ্রীনীরোদ নাগ প্রমুখ প্রদেশের বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা 'উপাচার্যকে শিক্ষকদের ছাত্রদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা-গিরিতে নিয়োগ' করার অভিযোগ এনে তাঁকে অবিলম্বে এ 'কলঙ্ক জনক কার্যকলাপ' থেকে বিরত হবার আহ্বান জানান।

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আসাদুল হক অভিযোগ করেন যে 'উপাচার্য ডাঃ রশিদ এই

প্রতিষ্ঠানটিকে একটি গোয়েন্দা অফিসে পরিণত করে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি করবার অপচেষ্টায় রত হয়েছেন।'

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তাঁর পূর্ব-পাকিস্তান সফরের সময় ৯ই আগস্ট ১৯৬৬ ঢাকার লাট ভবনে শহরের তথাকথিত বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সমাবেশে প্রদেশে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর আগ্রহের কথা সোচ্চারে ব্যক্ত করেন, কিন্তু এর মাত্র কদিন আগেই ১৮ই জুলাই পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী সদস্য জনাব আশরাফ হোসেন জানান যে পশ্চিম-পাকিস্তানের ৫টির জায়গায় এ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে মাত্র ১টি শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথম ৫টির জন্য সে যাবৎ খরচ করা হয়েছে ১৪ কোটি টাকা কিন্তু শেষেরটির জন্য ২ কোটি টাকা। ১৯৬৫ সালে ঢাকার গবেষণাগারটির জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ৩৫ লক্ষ টাকা আর পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।

পূর্ব-পাকিস্তানে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য আয়ুবের ব্যাকুলতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই! এই কালাকানুনের প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজে যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সামিল হয়েছিল তা ছাত্র-সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রে সমাজ জীবনের সর্বস্তরে সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিপীড়ন যে কি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা যে কি পরিমাণে খর্বিত হয়েছিল তার একটি নজির হোল পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্যে আয়ুবের প্রতিধ্বনি প্রাদেশিক লাটবাহাদুর মোনেম খাঁ সাহেবের সতর্কবাণী।

১৯৬৭ সালের ১০ই আগস্ট নোয়াখালি কলেজে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি সমাবেশে মোনেম খাঁ সাহেব ঘোষণা করেন যে ছাত্ররা কোন বিক্ষোভ বা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে তাদের

বিরুদ্ধে তো বটেই, এমন কি তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাঁর সরকার দ্বিধা বোধ করবেন না।

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় লাটবাহাদুর তাঁর ভাষণে সে ঈঙ্গিত দিয়ে বলেন যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলন চলছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সরকারের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানর জন্য ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের গুরুত্ব অনুসারে 'অপরাধী' ছাত্রদের স্কলারশিপ ও স্টাইপেণ্ড যখন-তখন বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে, এমন কি তারা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র তার সরকারী মঞ্জুরীও।

এর কয়েকদিন আগে ঢাকায় শিক্ষাবিদ্, আইনজীবী ও শিল্পপতিদের একটি সভাতেও গভর্নর মোনেম খাঁ আস্ফালন করে বলেন : প্রদেশের তরুণ সম্প্রদায় যদি ফাঁকাধ্বনি আওড়িয়ে নানা 'দিবস' ও 'সপ্তাহ' পালনে অমূল্য সময় ও শক্তি অপব্যয় করে তবে তাঁর সরকার কঠোরহস্তে সে 'অরাজকতা'র মোকাবেলা করবেন।

মোনেম খাঁ সাহেবের আস্ফালন শুধু হুমকিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বাস্তবক্ষেত্রেও তার অপক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুটে যে ছাত্র-ধর্মঘট হয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণের অপরাধে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের যাবতীয় স্কলারশিপ ও স্টাইপেণ্ড বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, যদিও এদের অনেকেরই এই টাকা ছিল প্রধান অবলম্বন। সরকারী স্কলারশিপ বা স্টাইপেণ্ড ছাড়াও কয়েকজন ছাত্র বুনিয়াদী গণতন্ত্র কবলিত ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের স্কলারশিপ পেত—তাও বাতিল করা হয়।

গভর্নর ঘোষিত এই মারাত্মক সরকারী সিদ্ধান্তে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। আজাদী লাভের পর কেন্দ্রীয় সরকারের সুপরিকল্পিত বৈষম্যনীতির ফলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের মত সন্তোষজনক অগ্রগতি পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেনি।

এ অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের অপরাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের রীতি চালু হলে শিক্ষকদের তাঁদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য কোন কাজ থাকতো না। এ শোচনীয় অবস্থা দেশে সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে না। একেই পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক সঙ্গতি আশানুরূপ নয়। এর উপর নানা অজুহাতে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কোনটি সরকারী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড বা স্কলারশিপ কেটে দেওয়া হলে, এই আঘাত সমাজ জীবনে তীব্র ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা স্থাপনের চিন্তায় আয়ুব-শাহীর চোখে ঘুম ছিল না। সেজন্য পিটুনী করের মত পাইকারী হারে কোন শিক্ষায়তন বা দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে তার সব ছাত্রের উপর দণ্ড-বিধান করতে তাঁরা পেছ-পাও হননি, কিন্তু আয়ুবের স্নেহধন্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা নিজেরাই কিভাবে শিক্ষা জগতের সর্বস্তরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন তার একটি কাহিনী বিবৃত করা যাক।

পূর্ব-পাকিস্তান বিধান-পরিষদের এক অধিবেশনে স্বতন্ত্র সদস্য মোল্লা আবুল কালাম আজাদ চমৎকারিত্বে অভিনব দুর্নীতির এই অভিযোগটি উত্থাপন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন।

মোল্লা আজাদ জানান যে ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময় এক স্কুল-শিক্ষক বিস্ময়-বিস্তারিত চোখে দেখলেন যে তাঁর স্কুল থেকে আগত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দশজনের মত বেড়ে গেছে। তিনি অচেনা এই দশজন সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে তাঁকে সাফ জবাব দেওয়া হয়েছিল যে শিক্ষাদপ্তরের প্রভাবশালী কোন অফিসারের ইচ্ছানুসারে এই পরীক্ষার্থীদের আনা হয়েছে এবং তাঁর

যদি চাকরির মায়া থাকে তবে তাঁকে তাঁর স্কুলের ছাত্র হিসাবে এই দশজন ছেলেকে সনাক্ত করতে হবে। অতঃপর গরীব শিক্ষক বেচারা আর কি করেন?

ঢাকার প্রগতিশীল সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ মন্তব্য করেছিলেন: 'এসব অভিযোগ তুলে বা উদাহরণ দেখিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন বা তাদের সমর্থকদের লজ্জা দেবার চেষ্টা নিরর্থক। কারণ, তাঁরা কি করছেন তা ভালভাবেই জানেন। আমরা শুধু কবির ভাষায় বলি—'দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ। ঋণ পরিশোধের দিন একদিন আসিবেই।'

কিন্তু ক্ষমতামত্ত ক্রূর শাসকচক্রের অবিচারের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজে নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল। তাদের বুকে জেগে উঠেছিল অসীম বল, মনে সাহস, মুখে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। তারা সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন—তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ঢাকা ছাড়িয়েও সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল আর পূর্ব-বঙ্গের আনাচে-কানাচে। ১৯৬৬ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-ইউনিয়নের দশম প্রাদেশিক সম্মেলনে পোস্টারের ভাষায় ধ্বনিত হয়েছিল:

(১) শান্তির কপোত উড়ুক দিগ্‌দিগন্তে

(২) যুদ্ধকে আমরা রুখবোই

(৩) সঞ্চয়ী জ্বালার বিস্ফোরণে
ইতিহাস প্রস্তুত হচ্ছে
নতুন যুগের

(৪) এ পৃথিবী আমাদের
এ পৃথিবী সকলের
এ পৃথিবীর মানুষ
ধ্বংস সহ্য করবে না

(৫) এখন প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটছে
বিন্দু বিন্দু অন্ধকার সরছে

(৬) মৃত্যুর ফাঁসি কাঠে লটকে
দাও ফের হতাশার কণ্ঠ
লোভ ভয় সংশয় জোটকে
ভেঙ্গে ফেলে হও কলকণ্ঠ

(৭) গুলি বারুদ
জেল বেয়নেট দিয়ে
দখল করা
হে নগরী
আমরা প্রস্তুত থাকবো

(৮) আমি রব বাংলার পায়ে-পায়ে

(৯) এ লড়াইয়ের শেষ
অত সহজেই নয়
এ লড়াই
বাঁচা মরার লড়াই

এই সম্মেলনেই প্রধান অতিথির ভাষণে প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ছাত্র-সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন: 'আমি নিজেও রাজভয়ে আমার কথা গলাটিপে মারি না।'

ছাত্র-ইউনিয়ন সম্মেলনের দেওয়াল-পত্রের ভাষায় শান্তির স্বপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলা হয়েছিল, বাংলা ভাষার প্রতি যে মমত্ব প্রকাশ পেয়েছিল ('আমি রব বাংলার পায়ে পায়ে') তার অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখতে পাই পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ইউনিয়নগুলির মুখপত্রগুলিতে। এ ধরনের একটি মুখপত্র—পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ কলেজ শাখার একুশে ফেব্রুয়ারী বিশেষ সঙ্কলন "অনির্বাণ"-এর সম্পাদকীয় থেকে উদ্‌ধৃতি

দেবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না। ১৯৬৫ সালের শেষের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৬৬ সালের প্রথমে ঐতিহাসিক তাসখণ্ড চুক্তির অল্পদিন পরেই প্রকাশিত এই ছাত্র-সঙ্কলনটিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল সব মানুষকে সংঘবদ্ধ হবার ও 'প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দের সহৃদয়তা নিয়ে বাস করবার' আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল :

'কোটি সূর্যের শোভাযাত্রায়
আমার দেশ সোনা হোক

আবার, বর্ষচক্রের আবর্তনে, ফাগুনের আগুন সেই লাল তারিখ, বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক মহান দিন, অমর একুশে—ফেব্রুয়ারী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে চতুর্দশ বসন্তের রোদনভরা স্মৃতি অতিক্রান্ত করে।

হে বায়ান্নর রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারী দীর্ঘদিন বাদে আজ তোমাকে সরাসরি প্রশ্ন করবো : তুমি এলে তো এলে, এমন ভয়াবহ বিভীষিকাময় হিংস্র ও কদর্যরূপ নিয়ে এলে কেন, বন্ধু? তোমার জন্মদিনে তুমি আসবে আর আমরা সবাই তোমাকে ও তোমার জন্যে নিবেদিত মৃত্যুঞ্জয়ী ও আত্মাহুতিদত্ত শহীদ স্মরণে স্বাগতম জানাবো। পবিত্রতম স্মৃতিস্পন্দনে পুষ্পপত্র অর্পণ করবো। এ রীতি আজ কোন নতুনত্বমণ্ডিত ঘটনাই নয়, সবাই হেন উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সচেতন ভাবেই সমতুল্য রায় স্বীকার করবেন। তবুও আজ তুমি যখন একান্তই এলে—আজকের দিনে তুমি আমাদের কাছ থেকে কী নিয়ে গত হবে, কী দিয়েই বা তোমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাবো?

বিপুলা এ ধরণীর বিরাট এ বিশ্বের ইতিহাসে ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কি তেমন, অবিরল ঘটনা? মোটেই না। বরং ভাষা সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে বহুতর বার্তা আমাদের মনের বাতায়নে এসে বহুবার ভীড় করেছে। তাই বলে ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

চালু করার সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের সাথে রাজপথে খণ্ড যুদ্ধ রক্তক্ষয় ও জীবনপাত সারা বিশ্বের তরে এক উজ্জ্বল ও অনন্য ঘটনা। গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার দেশ, তাল-তমাল-শাল-বেত, মহুয়া মলুয়ার দেশ, কবিগানের দেশ, যাত্রাগানের দেশ, ছড়া-তর্জার সেই বাংলা দেশের ঐতিহ্য সমন্বিত অনন্য ঘটনার প্রতীক: একুশে ফেব্রুয়ারীতে বর্বর জঙ্গম শক্তি যে প্রবল প্রতাপের অভিমানে আস্ফালন করেছিল সে ঔদ্ধত্য চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বজ্রাঘাতে তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ভীম অত্যাচারের সিংহ গর্জন চিরদিনের জন্য রুদ্ধ, পিষ্ট, বিনষ্ট ও পদদলিত মথিত করে দিয়েছিল সূর্যোদয়ের দেশের তরুণ ছাত্র ও যুব জনগণ সাধারণ। এ জন্যেই আমরা কান্নার ফেনিল উচ্ছ্বাসে, স্মৃতি দর্পণে বিগত কালের অস্পষ্ট ও ম্লান মুখাবয়বই দর্শন করবো না শুধু; ভাবীকালের অমরাবতীর আনন্দ কল্লোল ও উদ্দীপনার সঙ্কেতও দেখতে পাবো বলে দৃঢ় প্রতীতি পোষণ করি।

তাই এতদিনে আমাদের নানা আকুল আর্তি ব্যাকুলভাবে মূর্তমান হয়ে ওঠে হরেক-রকম কর্ম চাঞ্চল্যে। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জীবনে কেবল স্মৃতিসহচর হিসেবেই দেদীপ্যমান থাকবে, একুশে ফেব্রুয়ারী যুগ যুগান্তর ধরে কাল-কালান্তর অবধি, প্রতি বছরের প্রতিদিন প্রতিটি সকাল, প্রতিটি সন্ধ্যা এমন কি প্রতি মুহূর্ত অগ্নিমান্দ্য হয়ে চির চিক্ চিক্ করবে।

এমন দিনে আমার বেবাক অনুভূতি প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় রাগের আগুনে ফস্ করে জ্বলে উঠে খাঁচা ভাঙ্গার মারণ উচাটন মন্ত্রোচ্চারে মারমুখী হয়ে ওঠে। আজকের এই মারমূর্তিই বায়ান্ন-র একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার পূর্বজরা তারুণ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বিঘোষিত করেছিল। সেই শীতোষ্ণ স্মৃতি আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘ মল্লারের মীড় বাজায়। সে স্মৃতি আজ আমাকে বেদনা বিদীর্ণ করে, বিষণ্ণ করে, পাণ্ডুর করে। স্মরণ করিয়ে দেয় সেই স্বৈর শাসকের তীক্ষ্ণ দন্ত নখর, যে রক্ত পিঙ্গলের অভব্য, অমানুষিক,

পাশবিক, হীন ও জঘন্য নেংটো বর্বরতা আমার পূর্বসূরীদের নরকে নিপতিত ও অশুভ চক্রান্তের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করতে উদ্যত হয়েছিল। বঙ্গমাতার বীর সালাম, বরকত, আউয়াল, সফি, জব্বার রক্তের বদলে কোটিসূর্য আত্মার শোভাযাত্রার সূচনা করে দিয়ে যে অফুরান বান ডাকিয়ে ছিল সে বান, কেন জানি না ; আজ স্তিমিত ও পলাতক প্রায়।

শুধু তাই নয়, আজ চারিদিকে চতুর চোখ বুলাতেই দেখতে পাই আমাদের মাথার উপর ঝুলছে ধুরন্ধর সেই ফ্যাসিজমের খড়্গ। পক্ষান্তরে আজও যখন কিঞ্চিৎ ধোঁয়া পরিদৃশ্যমান হচ্ছে, তখন অতি অবশ্যই ধারণা করে নিতে হবে, আশে-পাশে আগুনও কোথাও নিশ্চয় চাপা পড়ে আছে। এ আগুনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গন্‌গনে করে তোলার ভার আজ একুশের নব-জাতকদেরই স্কন্ধে তুলে নিতে হবে।

আসুন, আজ আমরা বজ্রনির্ঘোষে কামান দাগি : অন্যায় যুদ্ধে মাতাল তরুণীর সলিল সমাধি রচনা করি। কামধেনুর মতো দোহনকারী শোষকের অপমৃত্যুর পরওয়ানা জারী করে দিই। রক্ত সমুদ্র সাঁতরিয়ে নতুন সূর্যকে ধরে এনে নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের, মহান দিনে ; মহান ব্রত গ্রহণ করি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ প্রশস্ততর করে দিই। কথায় কথায় ধর্মের জিগির তুলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের, মানবতা-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল বিষ বাষ্প ও নারকীয় বিদ্বেষ হলাহল, হানাহানি ও রক্তারক্তির অবসান করি। আমাদের শিল্প ও সাংস্কৃতির প্রতিক্রিয়াশীল সাধকগণকে আমরা চিহ্নিত করি প্রগতি ও কল্যাণের হন্তারূপে। সাহিত্যকে সুধী জনগণের ও মাটির কাছাকাছি আনার জন্যে আমরা আবেদন জানাই। সাহিত্য কোটি কোটি গণমানুষকে শিক্ষিত করে তুলুক। মাতৃভাষা, মুখের ভাষা, পাখীর ভাষা, কবির ভাষা, নদীর ভাষা, প্রেমের ভাষা, জীবনের ভাষা এই বাংলা ভাষা শুধু মাত্র কতিপয় মৃত

শব্দমালার সমষ্টি নয়,: বাংলা ভাষা প্রতিটি বাঙালীর, প্রতিটি কণ্ঠের, প্রতিটি উচ্চারণের সোচ্চার বেদধ্বনি; প্রতিটিক্ষণের অমূল্য অক্ষয় সম্পদ। আমাদের এই দুর্মূল্য ভাষাসম্পদকে কেন্দ্র করে, ভারত দ্বিখণ্ডিত করণের অব্যবহিত পর; স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরদিন থেকেই ভাষা সমস্যার চরম সঙ্কট পাকিস্তানের পশ্চিমা ভাগ্য বিধাতারা ঘোরতর করতে করতে বাঙালীকে কথা বলার, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার, মায়ের সাথে প্রেম করার পথ পঙ্গু অথর্ব ও কণ্ঠে তালা লাগিয়ে দেবার হীন কারসাজি করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলার যুব-জনতা ভাষা হরণের বিরুদ্ধে নগ্নহাতকে হাতিয়ার বানিয়ে সঙ্গীন উঁচু করে সেদিন দুর্বার আঘাত হেনেছিল রাস্তায় বুলেটের বুলন্দ আওয়াজে মৃত্যু বরণ করেছিল এবং বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে সরকার অবশেষে স্বীকৃতি দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা, জনতা জোয়ারকে কে রোখে, কার এমন সাধ্য?

বায়ান্নর সেই উত্তাল গণ-সমুদ্রের মার্তণ্ড জাগরণকে দেশে দেশে নন্দিত ও বন্দিতই করেনি শুধু, আমাদের পূর্বসূরীদের এই অমর গাথা ও বীর কীর্তিকে নত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনও করা হয় সর্বত্র।

আজকে আমরা ঐক্যতান তুলবো, আজকে আমরা দুর্বার গণ চেতনায় নাড়া দিবো এবং সোনার বাংলার ধনী দরিদ্র কৃষক মজুর সবাইকে এক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাবো। আমরা নয়া উপনিবেশবাদকে স্বদেশের সীমা থেকে টুটি চেপে ধরে তাড়িয়ে দেবো, সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট সকল বন্ধন ছিন্ন করবো, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহকে পাশ কাটাবো, প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্যের সহৃদয়তা নিয়ে বাস করবো, তাসখন্দ ঘোষণা মেনে চলার জন্য জনগণের কাছে আবেদন পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেবো, দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থা ও দেশ রক্ষা আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাবো, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, শান্তি বিরোধী চক্র, কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের উন্মাদ অপচেষ্টা প্রতিরোধ করবো, বাংলা ভাষার বিপক্ষে কতিপয় মুষ্টিমেয় তথাকথিত গুরু-

মশায়দের ষড়যন্ত্রের দৌরাত্ম্য আর মানাবো না, ক্ষমা করবো না, এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা আইনে আটককৃত রাজবন্দীগণ সহ দেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে ধৃত দেশপ্রেমিক ছাত্র, সাংবাদিক ও সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের কারামুক্তির দাবীতে আজ থেকে আমরা সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার নতুন শপথ নেবো; আসুন আমরা সবাই আজ শহীদ বেদীতলে এই ঘোষণা উচ্চারিত করি। সার্থক করি। এই হোক এবার একুশের মূল আওয়াজ।'

এখন পূর্ব-পাকিস্তানের দুজন বলিষ্ঠ তরুণ কবি জনাব মোজাম্মেল হোসেন ও জনাব মনজুর আহমেদ-এর দুটি কবিতার উদ্‌ধৃতি দিয়ে ছাত্র-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাব:

বন্ধুদের জন্যে। মোজাম্মেল হোসেন

এসো বন্ধুরা—
দীপ্ত দৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুলে
বিক্ষোভ ঘোষণায় মিছিলে মিছিলে
উত্তাল সাগরের প্রচণ্ড গর্জনে
ওদের জানিয়ে দিই:
আমরা জাগ্রত।
দিগন্তে দেখা যায় সূর্যের সোনালী রেখা।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—
কালের গলিত গর্ভ থেকে
বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে।
আমাদের দু-চোখের সহস্র চিতার আগুনে
মরণ কামড়ে উদ্যত নেকড়েরা
ভস্ম হবে

এ পৃথিবী নিরঙ্কুশ নিঃশঙ্ক হবে—
রক্তাক্ত প্রান্তরের পথে পথে
আমরা শান্তির শুভ্র পতাকা উড়াব।
দৃপ্ত দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুলে
এ অগ্নিমন্ত্রে উচ্চকিত হোয়ে
বন্ধুরা এসো॥

আরও দুর্বার সংগ্রাম। মনজুর আহমেদ

মুষ্টিবদ্ধ আমাদের হাত শূন্যে উত্তোলিত
পায়ে উদ্দাম:গতি অবিরাম
বলিষ্ঠ সুতীব্র ঘোষণায় শত্রুরা কম্পিত
এখন আরও দুর্বার আমাদের সংগ্রাম।

রোদ কাঁপে থরথর আকাশ বাতাস
কেঁপে ওঠে উত্তাল মুখরিত দিন
বাংলার নদনদী পদ্মা তিতাস
মাঠ ঘাট প্রান্তর শঙ্কাবিহীন।

বিস্ফোরিত আমাদের হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ
বাংলার নগর আর বন্দর গ্রাম
শাণিত শপথে দৃঢ় আরও বিক্ষুব্ধ
আরও দুর্বার শৃঙ্খল ভাঙ্গবার সংগ্রাম।

শুধু ছাত্র আন্দোলনই নয় কৃষক-প্রধান পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছিল। বিশেষ

করে জুলুমের বিরুদ্ধে এবং খাদ্যের দাবীতে জেলায় জেলায় কৃষকদের এই আন্দোলন দিনের পর দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল।

অবিভক্ত বাংলাতেই তে-ভাগা আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। চাষীর শরীরের রক্ত জল-করা উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তার থাকবে—বাকী এক তৃতীয়াংশ জমির মালিকের এই ছিল আন্দোলনের মূল। এই আন্দোলন প্রধানতঃ দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, খুলনা, বগুড়ায় ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব-বাংলায় এই আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই কৃষক-জাগরণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

যশোর জেলার নড়াইলে হিন্দু মুসলমান চাষীরা একযোগে মুসলিম লীগ সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন নুরজালাল। তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ কৃষকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল।

চট্টগ্রাম জেলার মাদারশা গ্রামে সেচকার্যে বাধা সৃষ্টি করার জন্য স্থানীয় জমিদার একটি বাঁধ তৈরী করলে প্রায় কুড়ি হাজার চাষী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার যথারীতি পুলিশী নির্যাতন ও গুলি চালিয়ে বহু কৃষক-কে হত্যা করে।

সিলেটে জমিদার শ্রেণীর 'নানকর' প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। 'নানকর' প্রথা শুধু মুসলমান চাষীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী চাষীরা দাস ছাড়া আর কিছু হতে পারতেন না। এমন কি বিয়ে করলেও চাষীর স্ত্রী জমিদারের সম্পত্তির অংশ হতেন। এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলন দমন করতেও পূর্ব-পাকিস্তানী পুলিশ প্রবল তৎপরতা চালিয়েছিল। এই আন্দোলনে যাঁরা পুরোধা ছিলেন, তার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন দুজন অসম সাহসী মহিলা শ্রীমতী সুসমা দে ও শ্রীমতী অসিতা পাল। নির্মম পুলিশ বাহিনী তাঁদের চুল ধরে টানতে টানতে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে প্রায় দু-মাইল নিয়ে গিয়েছিল। যদিও

নানকর প্রথা শুধু মুসলমান চাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল তবুও বহু হিন্দু পুরুষ ও মহিলাও এই প্রথার প্রতিরোধ আন্দোলনে মুসলমান কৃষকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

ময়মনসিং জেলার হাজং এলাকায় (গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসং মহারাজার জমিদারীর অন্তর্গত জমি) 'টঙ্ক' নামে এক কুখ্যাত প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে মহারাজা তাঁর এলাকাধীন জমিতে উৎপন্ন ফসল বাবদ চাষীদের থেকে অগ্রিম অর্থ আদায় করতেন। ফসল ভাল হোল কি হোল না সে বিষয়ে তিনি কখনও বিবেচনা করতেন না। এই প্রথার বিরুদ্ধে মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্র কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং-এর নেতৃত্বে হাজং এলাকার কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। এই অন্দোলনে মণি সিং-এর সহযোগী হলেন পূর্ব-বঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী-কর্মী যেমন: সিলেটের খোকা রায়, অনিল মুখার্জি, চিত্ত দাশগুপ্ত, খুলনার বিষ্ণু চ্যাটার্জি, বরিশালের অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ), রংপুরের মণিবিষ্ণু সেন এবং দিনাজপুরের হাজী মহম্মদ দানেশ। মুসলিম লীগ সরকার বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে অতি নিষ্ঠুরভাবে হাজং এলাকার কৃষিঅভ্যুত্থান দমন করেছিলেন। শয়ে-শয়ে হাজং কৃষক গারো পাহাড় অতিক্রম করে ভারতে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল—তাদের পরিত্যক্ত ভূমিতে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ভারত থেকে আসা শরণার্থী মুসলমানদের দলে দলে বসিয়ে দিয়ে এই আন্দোলনের সমাধি রচনা করেছিলেন।

কিন্তু রাজশাহী জেলার নাচোল গ্রামে কৃষকদের বিরুদ্ধে দমন-মূলক নীতির ঘৃণ্য চেহারা আর সব জায়গার সরকারী নিপীড়নের চেহারাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই গ্রামের চাষী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন সাঁওতাল। শ্রীমতী ইলা মিত্র (বর্তমানে পশ্চিম বাংলা বিধান সভায় কলকাতা মানিকতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যা) এ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে পাকিস্তানী পুলিশের হাতে তাঁকে চরম নির্যাতন ও বর্বর অত্যাচার ভোগ করতে হয়। মাত্রাহীন পুলিশী অত্যাচারে ইলা মিত্রর প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা হয়েছিল—তিনি যে কি করে বেঁচে ছিলেন সেটাই আশ্চর্য। ১৯৫০ সালের ৭ই জানুয়ারী ইলা মিত্র রাজশাহী জেলার রাহানপুরের কাছে গ্রেফতার হয়েছিলেন। এর আগে ইনি আত্মগোপন করেছিলেন এবং যখন পুলিশ তাঁকে আটক করে তখন তাঁর পরণে ছিল সাঁওতালী রমণীর বেশবাস। সে সময় রাজশাহী বিভাগের যিনি D. I. G. বা পুলিশের ডেপুটি ইনস্‌পেটকর জেনারেল ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে নাচোলের নিকটবর্তী চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানায় গিয়ে এক সন্ধ্যায় থানার হাজত কক্ষে রক্তাপ্লুত অবস্থায় প্রায় নগ্ন অবস্থায় শ্রীমতী ইলা মিত্রের যে হাল তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাতে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। শোণিত স্রোতের মধ্যে শায়িত অচেতন ইলা মিত্রকে দেখে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে হয় তিনি মৃত অথবা তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তৎক্ষণাৎ D. I. G. সাহেব তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানর জন্য স্থানীয় থানা অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি নাচোল গ্রামে যখন জিপ নিয়ে ঢুকলেন তখন নাকি একটি গাছের নীচে স্তূপীকৃত যন্ত্রণাকাতর গুরুতর আহত সাঁওতালদের রক্তাক্ত দেহগুলি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। তাদের জন্য নাকি প্রাথমিক চিকিৎসার সামান্যতম ব্যবস্থাও করা হয়নি। D. I. G. সাহেব আমাকে আরও বলেছিলেন যে একজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার হিসাবে এসব কথা আমার কাছে কবুল করতে লজ্জায় ও দুঃখে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে কিন্তু তবুও তাঁর মতে Truth should always prevail.

নাচোলে পুলিশী তাণ্ডব ও শ্রীমতী ইলা মিত্রর ওপর তাদের বর্বরতম নির্যাতন-এর কাহিনী সারা পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভ

ও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এবং আগামী দিনগুলিতে পূর্ব-বঙ্গে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের পথে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

বলা বাহুল্য পূর্ব-পাকিস্তানের এই কৃষক আন্দোলন যে বেশ একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিনাবাধায় গড়ে উঠেছিল তা মোটেই নয়। দেশবিভাগের আগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব-বঙ্গে যে কৃষক সমিতি ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উত্তরকালে তা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে আধা বেআইনী অবস্থার মধ্যেই রংপুরে এক সম্মেলন ডেকে সেই কৃষক সমিতিকেই পুনর্গঠিত করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু উগ্র দমন নীতি, বিপুল সংখ্যক পশ্চাদপদ কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কু-প্রভাব এবং মুসলিম লীগের দ্বারা জমিদারী দখল আইনের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মোহ, এসব মিলে সে প্রচেষ্টাকে সাময়িকভাবে ব্যর্থ করে দেয়। ক্রমে পূর্ব-বঙ্গে কৃষক সংগঠন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং দেশবাসীর স্মৃতিতে 'কৃষক সমিতি' নামটিই কেবল টিকে থাকে। ইতিমধ্যে অবশ্য, অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতিকার ও বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিকে কেন্দ্র করে পূর্ব-বঙ্গে যে লীগ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার একটা ব্যাপক উন্মেষ ঘটে যায় এবং আগেই বলেছি যে ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের সেই প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচনে শাসক-দল মুসলিম লীগ বস্তুত পক্ষে রাজনৈতিকভাবে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৫৭ সালে তৎকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান ধারক ও বাহক আওয়ামী লীগের একাংশের দেউলিয়াপনার ফলে একদিকে যেমন গড়ে ওঠে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, অপরদিকে তেমনি অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলবার তাগিদ। অবশেষে ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ও অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মীদের সহায়তায় পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতি গড়ে উঠল বটে, কিন্তু অল্প

কালের মধ্যেই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় জঙ্গী নায়ক আয়ুব-খানের আবির্ভাব কৃষক সমিতির অগ্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আভ্যন্তরীণ জনমতের চাপে মওলানা ভাসানী সহ বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীর কারামুক্তি ঘটার পরে ১৯৬৫ সালে রংপুরেই আবার একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর প্রায় এক বছর পরে গত ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার রায়পুরায় পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতির যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে জানা যায় যে এক বছরে যদিও মাত্র ৫০ হাজার ৭ শো ব্যক্তি কৃষক সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছেন কিন্তু একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের অবশিষ্ট ১৬টি জেলাতেই কৃষক সমিতির ইউনিট গড়ে উঠেছে।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শক্তি হলেও বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতি আজ সংগ্রামে অবতীর্ণ। স্বায়ত্তশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকার, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার ইত্যাদি রাজনৈতিক শ্লোগান অথবা নিছক স্থানীয় দাবী-দাওয়া নিয়েও তাঁরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন সেগুলি হচ্ছে সমস্ত শহর ও গ্রামে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা, রেশনে চালের দাম মন প্রতি ২০ টাকা ও গমের দাম মন প্রতি ১০ টাকা ধার্য করা, পাটশিল্প ও পাট ব্যবসা জাতীয় করণ এবং পাটের সর্বনিম্ন দর মন প্রতি ৪০ টাকা ধার্য করা, সকল প্রকার খাজনা ট্যাকসের পরিমাণ হ্রাস ও ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা, উদার শর্তে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুব-শাহীতে এই কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের পথ নিরঙ্কুশ হয়। তার ওপর বারে বারে আঘাত এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৬৭ সালের ৫ই মার্চ ঢাকা শহরে আয়োজিত একটি কৃষক সমাবেশে শরিক হবার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে আগত প্রায় দশ হাজার কৃষকের এক মিছিলের ওপরে ৪ঠা মার্চ গভীর রাত্রে বাবুরহাটের কাছে সশস্ত্র পুলিশের এক বেপরোয়া লাঠি চার্জ হয় এবং দুই শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা

হয়। সে বছরই ১৫ই মার্চ পাবনা শহরে প্রাদেশিক সরকারের ভুট্টা সরবরাহ করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান একজন, জখম হন বারো জন এবং কারাবরণ করেন তিনশোর বেশী সংগ্রামী মানুষ। আয়ুব-সরকার এ সব আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে এবং সরকারের দমননীতিমূলক সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের সম্ভাবনা আশঙ্কা করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহসভাপতি হাজী মোহম্মদ দানেশ ও সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতির সম্পাদক জনাব হাতেম আলী খানকে দেশরক্ষা বিধির বিভিন্ন ধারা বলে আটক করেন।

কৃষক-আন্দোলন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক আন্দোলনের কথাও এসে পড়ে, কারণ পূর্ব-বঙ্গে বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলন কৃষক-শ্রমিকদের যৌথ মোর্চায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছে।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে তৎকালীন প্রধান কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (A. I. T. U. C.) স্বভাবতই তাদের কার্যকলাপ ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। সুতরাং এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত যে সব ইউনিট পাকিস্তানে থাকলো সেই ইউনিটগুলি একত্র হয়ে গঠন করল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। এই সংস্থা গঠনে কমিউনিস্ট কর্মীরা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নানা কারণে তার সভাপতি নির্বাচিত হলেন জনাব আফতাব আলী এবং সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন জনাব ফয়েজ আহমদ্। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠী ও মালিক শ্রেণীর সঙ্গে এই দুই ব্যক্তির দহরম্-মহরম্ এবং শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের দরুণ এমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে বিশ্বস্ত কর্মীরা অনেকেই এই ফেডারেশনের সংস্রব ত্যাগ

করলেন এবং স্বতন্ত্র সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আফতাব আলী সাহেবের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় জনাব ফয়েজ আহমদ্ অবশ্য প্রথম একটা ফেডারেশন গঠন করলেন, কিন্তু এ দুটো সংস্থার কোনটাই শ্রমিক সাধারণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হোল না। শুধু তাই নয়, এই সময় ঢাকার নবাব পরিবারের এক ব্যক্তি জনাব আসানুল্লার উদ্যোগে একটি সুবিধাবাদী ফেডারেশন গড়ে তোলবার অপচেষ্টাও ঐ একই কারণে ব্যর্থ হোল।

অপর দিকে স্বতন্ত্র একটি সংগ্রামী শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের অনুকূল পরিবেশ তখনও সৃষ্টি হয়নি। কারণ বিভিন্ন শিল্পে ও কারখানা স্তরে তখনও সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে পরাজিত করে সংগ্রামী ইউনিয়ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গড়ে ওঠেনি। অনেক উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের আঁকা-বাঁকা পথে-পথে এই কাজটি সম্পন্ন হতেও লেগে গেল প্রায় ছ-সাত বছর। অবশেষে ১৯৫৮ সালে গঠিত হোল পূর্ব-পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন। কিন্তু এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সুরু হোল আয়ুব খানের সামরিক শাসনের যুগ। দমননীতির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এই ফেডারেশন।

কিন্তু উল্লেখ করার মত বিষয় এই যে আকস্মিক দমন-নীতির এই তীব্র আঘাত সামাল দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের বেশী সময় লাগলো না। ১৯৬২ সালের শেষ ভাগেই টঙ্গীর সূতাকল শ্রমিকরা তাঁদের এক ধর্মঘট দীর্ঘকাল ধরে চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে রেল শ্রমিক ও ডাক-তার বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটের আহ্বান, ১৯৬৩-৬৪ সালে চট্টগ্রামে শ্রমিক বিক্ষোভ, ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ৪০ হাজার পাটকল শ্রমিকের একমাস ব্যাপী ধর্মঘট, ২৯শে সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটে চট্টগ্রাম ও ঢাকার শ্রমিকদের ও সাধারণভাবে রেল শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, ১৯৬৪ সালের

অক্টোবর মাসে আবার পঞ্চাশ হাজার পাটকল শ্রমিকের দু-মাস ব্যাপী ধর্মঘট, ১৯৬৫ সালের মে মাসে রেল-শ্রমিক ধর্মঘট, ১৯৬৫-র আগস্ট মাসে সরকারের গণ-বিরোধী শ্রম আইনের বিরুদ্ধে ঢাকা ও নারায়ণ-গঞ্জের শ্রমিকদের হরতাল ও ব্যাপক সমাবেশ এবং তারপর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবর রহমানের প্রখ্যাত ছয়-দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই জুনের হরতাল থেকে নিশাত জুট মিলের শ্রমিক ধর্মঘট পর্যন্ত অজস্র সংগ্রাম পূর্ব-পাকিস্তানে এক সংগ্রামী ফেডারেশন গঠনের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ফলে এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংগঠিত 'শ্রমিক-পরিষদে'র যে বার্ষিক অধিবেশন ১৯৬৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনেই মহম্মদ তোয়াহা-কে সভাপতি ও জনাব সিরাজুল হোসেন খানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন।

সামর্থ্য যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হলেও এই পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন পূর্ব-পাকিস্তানের অজস্র ছোট-বড় শ্রমিক সংগ্রাম পরিচালনা করবার গুরু-দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। বকেয়া বোনাস প্রভৃতির দাবিতে অটল বেশ কিছু সংখ্যক জুট মিল ইউনিয়ন এঁদের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান জুট মিল ফেডারেশনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। সবচেয়ে নিপীড়িত চা-বাগিচার শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান চা শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে। বগুড়া কটন মিল, কুষ্টিয়া মোহিনী মিল, ফেনীর দোস্ত মহম্মদ মিল, ঈশ্বরদির আলহজ্জ টেকসটাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোকিল টেকসটাইল এবং নারায়ণগঞ্জ ও ও টঙ্গীর সূতাকলগুলির শ্রমিকদের দাবিদাওয়াগুলি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এই ফেডারেশনের নেতারাই। গত ১৯৬৩ সাল থেকে প্রাপ্য অতিরিক্ত বেনিফিট, পীসরেট শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ইত্যাদি দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাতটি জুট মিলের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ১৯৬৭ সালের ১৩ই মার্চ থেকে ধর্মঘট স্থরু করেন

২০শে মার্চ থেকে এই সংগ্রামের শরিক হন ডেমরার বাওয়ানী জুট মিল, সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিলস এবং চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলস, ভিকটোরিয়া জুট প্রোডাক্টস ও ইসপাহানী জুট মিলসের আরও তেত্রিশ হাজার শ্রমিক। অবশেষে ২৮শে মার্চ (১৯৬৭) থেকে খুলনা শিল্প এলাকার প্ল্যাটিনাম জুবিলী, ক্রিসেন্ট, পিপলস্ স্টার ও দৌলতপুর জুট মিলের ত্রিশ হাজার শ্রমিকও এই সংগ্রামে যোগদান করেন। ফলে এই লড়াই প্রদেশের এক লক্ষ তেরো হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের এক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। এই ধর্মঘট বানচাল করে দেবার জন্য সরকার ও মালিকপক্ষের অপচেষ্টার যদিও বিরাম ছিল না, তবুও পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব-পাকিস্তান জুট মিল শ্রমিক ফেডারেশন এবং পূর্ব-পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন নামে পরিচিত একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক সংস্থা যুগ্মভাবেই এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করায় সে অপচেষ্টা সফল হয়নি।

একথা মনে করা ভুল হবে যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি বা শ্রমিক ফেডারেশনের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সাংগঠনিক দুর্বলতা নেই। বরঞ্চ ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা সবই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক গণতান্ত্রিক কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলবার যে নিরলস প্রচেষ্টা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় দু-দশক ধরে চলছিল সেই ইতিহাস অনুধাবন করলে আজকের দিনে পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের যুক্ত প্রয়াসে যে সব গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার বুনিয়াদকে কেউ হালকা ভেবে তুচ্ছ করতে পারবেন না।

কোনও সন্দেহ নেই যে পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী সংগঠনের এই আবির্ভাব অদূর ভবিষ্যতে একে এক নতুন রূপ দিতে সমর্থ হবে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা করেছিলেন যে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণার সুযোগ নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলি আওয়াজ তুললো : 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার চাই', 'প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই', 'ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই' এবং সেই সঙ্গে চাই 'পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন'। এই দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের জনমত গঠনের জন্য অগ্রণী হোল বিরোধী দলগুলি। এদের সামনে আরেক সুযোগ করে দিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব। পূর্ব-পাকিস্তানের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি নিজের একজন বিশ্বস্ত বিচারপতি আখতার হোসেনকে দিয়ে একটি 'ভোটাধিকার কমিশন' বা 'ফ্র্যানচাইজ কমিশন' গঠন করলেন এবং এই কমিশন ভোটাধিকার সম্পর্কে জনমত নির্ধারণের জন্য প্রকাশ্য সাক্ষ্য নিতে আরম্ভ করলো। সাক্ষ্যদানের অবকাশে পূর্ব-বাংলায় আয়ুব-তন্ত্রের বিরোধীতায় এবং গণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে সভা-সমিতি, সম্মেলন, শোভাযাত্রার মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে লাগলেন বিরোধী পক্ষীয় নেতৃবৃন্দ। ১৭ই সেপ্টেম্বরের ছাত্র-সংগ্রাম আগেই পূর্ব-বাংলার গণচেতনাকে প্রবলভাবে জাগ্রত করে দিয়েছিল। কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানের সময় পূর্ব-বাংলার জনমত আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবস্থার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে আয়ুব-শাহী এক নতুন আদেশ জারী করে কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন বন্ধ করে দিলো। কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত বিচারপতি জনাব আখতার হোসেন পর্যন্ত তাঁর রায়ে অভিমত প্রকাশ করলেন যে ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হোক—এটাই জনসাধারণের ইচ্ছা। 'আখতার হোসেন কমিটি'র রায়ে বিব্রত বোধ করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব এই কমিশনকে বাতিল করে দিয়ে প্রধানত নিজের সমর্থকদের নিয়ে আরেকটি নতুন 'কনস্টিটিউশন কমিটি' গঠন করলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুবের

ভুর্ভাগ্য এই কমিটিও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সপক্ষে তাদের রায় দিলো।

আকস্মিক ও ব্যাপকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের 'মৌলিক গণতন্ত্র'-বিরোধী গণবিক্ষোভকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আবার উগ্র কাশ্মীর রাজনীতি সুরু করে দিলেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও তাঁর তল্পীবাহকরা। আয়ুবের স্বৈরাচারী রাজনীতির বিরুদ্ধে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিশাল গণসমাবেশ হোল। এই সভায় মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান, হামিদুল্লা হক এবং অন্যান্য নেতারা আয়ুব-নীতির বিরোধীতা তো করলেনই—এমন কি ইংরেজ আমলের কট্টর মুসলিম লীগ-পন্থী নেতা অতিবৃদ্ধ মৌলানা আক্রাম খান পর্যন্ত বললেন : 'পূর্ব-পাকিস্তানকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী তোলা এক পরিহাস মাত্র।'

আয়ুব-শাহী যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষকে বিচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে এক সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঢাকার সাংবাদিকরা আগেই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁরা ডিসেম্বর (১৯৬৩) মাসের গোড়া থেকেই আয়ুবের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যখন পূর্ব-পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাবার ইন্ধনের সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন সে সময় কাশ্মীরে পবিত্র হজরৎ-বাল (পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের পবিত্র কেশ) অপহরণের ঘটনা এক সুযোগ এনে দিল রাওয়ালপিণ্ডিকে। 'হিন্দুরা পবিত্র হজরত-বাল অপহরণ করেছে'—এই জিগীর তুলে ১৯৬৪ সালের ৩রা জানুয়ারী পাকিস্তানে 'কাশ্মীর-দিবস' ঘোষিত হোল। পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের প্রচেষ্টায় এই দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির চক্রান্ত পূর্ব-বঙ্গের প্রায় সর্বত্র ব্যর্থ হোল কিন্তু আয়ুবের বিশ্বস্ত অনুচর ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান আবদুস সবুর খান

প্রধানতঃ একদল অবাঙালীর সহায়তায় খুলনায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সবুর খান খুলনারই অধিবাসী—দেশবিভাগের আগে ইনি কলকাতায় থাকতেন এবং একজন ক্রীড়ামোদী—বিশেষতঃ ফুটবল প্রেমিক হিসেবে তাঁর নামডাক ছিল। কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইনি একজন পাণ্ডা ছিলেন। পরে আয়ুব-শাহীতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের নেকনজরে পড়ে তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন। খুলনার সবুর সাহেবের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজ্যপাল ময়মনসিংহের প্রাক্তন উকিল আবদুল মোনেম খান সাহেবের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি ও রাজনৈতিক ঈর্ষা ছিল—কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। জনাব সবুর খান বহুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন যে কিভাবে মোনেম খান সাহেবকে অপদস্ত করা যায়। কাশ্মীরের পবিত্র হজরত-বাল অপহরণের ঘটনাটিকে সবুর খান অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। খুলনা অঞ্চলে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তার অধিকাংশরই শ্রমিক অবাঙালী—প্রধানতঃ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম থেকে আসা বাস্তুহারা মুসলমান। এই অবাঙালী শ্রমিকদের অনেককে অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল—তাই তারা ছিল হিন্দুদের বিষয়ে ধর্মান্ধ। ডিসেম্বর মাসের (১৯৬৩) শেষ দিকে জনাব সবুর খান খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁর অপ-ভাষণে তিনি বলেন যে এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন অপহরণ কাফের হিন্দুদের কাজ। এর দ্বারা কাশ্মীরের ওপর মুসলমানদের বিশেষ করে পাকিস্তানের দাবী অস্বীকারের একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। অতএব পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ কি ধর্মের প্রতি অবিচারের একটা সমুচিত জবাব দেবে না ?

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবার ফলাফল যা হবার তা হোল। খুলনার শ্রমিক অঞ্চলে হিন্দু-নিধন সুরু হোল। সবুর খান সাহেব আরেকটি কাজ করলেন: খুলনায় দাঙ্গা সুরু হবার সঙ্গে

সঙ্গে যশোর-খুলনার সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্ত খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত বা ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দু নরনারী সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয় নিলো। সবুর সাহেব জানতেন যে এরা পশ্চিম-বাংলায় গিয়ে সীমান্তের ওপারে যা হয়েছে তার চেয়ে অতিরঞ্জিত করে অনেক কথা বলবে যার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা কলকাতায় ও পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে। আর পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষতঃ কলকাতায় কোন ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে বিশেষতঃ ঢাকায় দেখা দেবার সমূহ সম্ভাবনা। এতে এক ঢিলে দুটি পাখী বধ করা যাবে—পূর্ব-পাকিস্তানে পাইকারী হারে হিন্দু নিধন হবে আবার গভর্নর মোনেম খান সাহেবের রাজনৈতিক carrier-এরও একটা পরিণতি হয়ত ঘনিয়ে আসবে তাতে। বাস্তবে সবুর সাহেবের কূটনীতি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। খুলনায় হিন্দু-নিধনের খবর পশ্চিম-বঙ্গে এসে পৌঁছানর পর কলকাতায় ও চব্বিশ পরগণার নানা স্থানে মুসলিম-নিধন ও মুসলমানের সম্পত্তি দখল করা বা বিনষ্ট করা সুরু হয়ে গেল। কলকাতার দাঙ্গার ব্যাপকতায় বিচলিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দা পশ্চিম-বঙ্গে এলেন এবং স্বয়ং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি সফর করে কঠোর হাতে দাঙ্গা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখন অসুস্থ। এর কয়েকদিন আগে ভুবনেশ্বরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর স্ট্রোক হয়েছে। দেহের কিছুটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনিও তাঁর রোগশয্যা থেকে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরিয়ে আনিবার আবেদন জানালেন।

কলকাতায় দাঙ্গার রি-অ্যাকশন হিসাবে ঢাকায় ব্যাপকহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে গেল। এই দাঙ্গায় ঢাকা শহরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হোল প্রধানতঃ নবাবপুর রোড ও নারিন্দা

রোড। জয়কালী মন্দির রোডও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ অঞ্চলের দাঙ্গার নায়ক ছিলো কুখ্যাত আবদুল কাদের নওয়াজ। ২০৫নং, ৭৯নং U. P. Boarding ও তার পাশের বাড়ি G. C. Basak & Co, Das Studio নয়নচাঁদ-এর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি সংখ্যালঘুদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সব ছিলো নবাবপুর রোডে। এগুলি দাঙ্গায় বিনষ্ট হয়েছিল। ঢাকায় গুজব রটেছিল যে ঢাকার দাঙ্গার নায়ক আবদুল কাদের নওয়াজ নাকি তার অপকীর্তির পর কলকাতায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাকে নাকি ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে কলকাতায় পাঠান হয়েছিল। নিজের প্রাণ-বাঁচানোর জন্য বিখ্যাত একজন উকিল যিনি ঢাকা শহরে মন্ত্রীর মত সম্মান পেতেন পুলিশকে পনের হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ঢাকার একটি বিখ্যাত ঔষধালয়ের মালিক দিয়েছিলেন ষাট হাজার টাকা।

ঢাকার দাঙ্গার পেছনে কাশ্মীর বা কলকাতার ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি লাভের আকাঙ্খা বেশী কাজ করেছিল বলে মনে হয়। সে সময় উদ্বাস্তু ও স্থানীয় কর্মহীন মুসলমানদের বোঝান হয়েছিল যে বাঙালী হিন্দু শ্রমিকদের জন্য হিন্দুস্তান থেকে আসা মোজাহের (রিফিউজি) অবাঙালী শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের যদি ঢাকা ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে বহু অবাঙালী মুসলমানের কর্মসংস্থান তো হবেই—অপরপক্ষে তাদের অন্নবস্ত্রের অভাবও দূর হবে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে ঢাকার এই ব্যাপক দাঙ্গার পরবর্তীকালে ক্রমশ প্রকাশ পেয়েছিল যে ঢাকার আদমজী ও বাওয়ানী মিলগুলি, জিন্নত মিল ও অলিম্পিয়া মিলের কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ দাঙ্গাকারীদের শক্তি জুগিয়েছিল। এছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীর দুই তীরে যে সব অবাঙালী শিল্পমালিকরা ছিলেন তাঁরাও প্রচুর অর্থ, গাড়ি দিয়ে দাঙ্গাকারীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিলেন। তাঁরা মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে লোহার ডাণ্ডা, ছোরা ও কেরোসিন তেলে

সিক্ত পাট বিতরণ করেছিলেন। ঢাকেশ্বরী কটন মিল দুটোর ওপর আদমজীদের বহুদিন ধরে প্রবল ঈর্ষা ছিল। ঢাকার সাম্প্রদায়িক অশান্তিকে এবার তারা কাজে লাগালেন। দশ থেকে পনেরো হাজার অবাঙালী শ্রমিক এবং এদের সঙ্গে আনসার বাহিনী ও কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বাঙালী মুসলমান শ্রমিকও প্রবল বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নারায়ণগঞ্জের হিন্দুদের ওপর। তারপর নারায়ণগঞ্জে বিজয়-অভিযান শেষ করে তারা উল্কার মত এগিয়ে গিয়েছিল দিগুন, দক্ষিণ মৌস্মুন্দী, ভুলতা, বহর, বৈন্তের বাজার, বিরুলিয়া, গোয়ালকান্দি, মাধবদি, গোলকান্দা, রূপসী, গুইটা-অন্দর গ্রামগুলির দিকে। গ্রামগুলির ওপর দিয়ে একটা যেন প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গেল। দাঙ্গার আগুনে বহু নিরীহ মানুষের বাড়ি ভস্মীভূত হোল, তাদের বিষয় সম্পত্তি লুট হোল, জীবনহানিও হোল কম নয়।

কিন্তু আয়ুব-শাহীর তরফ থেকে চরম সাম্প্রদায়িক উসকানি এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য সত্ত্বেও এই দাঙ্গায় কিন্তু ভাড়াটে গুণ্ডারা ছাড়া মাত্র অল্পসংখ্যক স্থানীয় মুসলমান যোগ দিয়েছিল। ছাত্ররা এবং সাধারণভাবে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ দাঙ্গা-প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন। আমি ঢাকায় কয়েকজন রাজনীতি-সচেতন হিন্দুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম—তাঁরা পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে আমাকে একবাক্যে বলেছিলেন যে বাঙালী মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি হস্তক্ষেপ না করতো তাহলে যে কি বীভৎস কাণ্ড হতে পারতো তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এই বাঙালী ছাত্র-সমাজ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়—তা সে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, কুমিল্লা যেখানেই হোক না কেন—সর্বত্র প্রথম থেকেই এই দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করেছেন, প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, শান্তিমিছিল বের করে দাঙ্গাকারীদের মুখোস খুলে দিয়েছেন। তাঁরা আয়ুব-সবুর চক্রের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে বলেছেন যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙালীদের বিরুদ্ধে সরকার ও বড় মালিকগোষ্ঠীর (যারা অবাঙালী

এবং বাঙালীদের স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে যাদের জেহাদ) এক জঘণ্য ষড়যন্ত্র। তাঁরা আরও বলেছেন যে এই দাঙ্গা হোল পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী শাসক শ্রেণীর ঘৃণ্য চক্রান্ত—হিন্দুরা যদি সবাই দেশ ত্যাগ করে চলে যায় তবে পূর্ব-পাকিস্তানে পুরোপুরিভাবে অবাঙালী মুসলমানদের আধিপত্য হবে। অবশ্য একথা ঠিক নয় বা আলাদিনের প্রদীপের মত এমন হাওয়া সম্ভবত ছিল না যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালী মুসলমান হিন্দুদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল, তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে স্থানীয় মুসলমানরা সাধারণভাবে দাঙ্গার বিরোধিতা যদি না করত তবে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ও পরিমাণ আরও অনেক বেশী হোত। ১২ই জানুয়ারী থেকে ঢাকায় দাঙ্গা সুরু হয় এবং ১৩ই তারিখে অবস্থা অত্যন্ত অবনতির দিকে যায়। কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী পূর্ব-বাংলার কয়েকটি জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল সংবাদপত্রগোষ্ঠী—যেমন 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'পাকিস্তান অবসারভার' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা বলিষ্ঠ ভাষায় আহ্বান জানালেন : 'পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও।' তাঁরা লিখলেন :

'দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করুন। আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম খুলনা-কলকাতার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবিলম্বে প্রতিহত না হইলে পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশেরই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি যে বেপরোয়া তাণ্ডবের সূচনা করিবে তাহাতে নিরীহ নরনারীর জীবনে নামিয়া আসিবে অবর্ণনীয় দুর্দশা। জনতার দুশমনদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য তাই আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট দাঙ্গাবাজ ও দুষ্কৃতিকারিদের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে পূর্ব-

পাকিস্তানের জননেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী ও মহিলা কর্মিবৃন্দ, দাঙ্গা প্রতিরোধ করার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। সীমান্তের অপর পারের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত না হইবার জন্যেও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁহারা ব্যাকুল আবেদন জানাইয়াছেন, তৎসত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই ঘটনাকে আমরা নিন্দা করার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এ ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে আর-একটি কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অচিরেই মোচন করিতে হইবে।

দেশকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট আমরা আর একবার বলিতেছি, শুধু শান্তির আহ্বানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ও বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবিলম্বে নিজ নিজ পাড়ায়, মহল্লায়, নিজ নিজ গ্রামে শান্তি কমিটি গঠন করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা শায়েস্তা করুন। সকল দেশকর্মী ও শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িকতাই হইল প্রতিক্রিয়ার কর্ম, সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল না করিলে প্রতিক্রিয়ার পরাজয় অসম্ভব। এই সম্প্রদায়িকতাই গণতন্ত্রের পহেলা নম্বর দুষমন।

সরকারের উদ্দেশে আমাদের আবেদন, নিজহস্তে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের দমন করুন। সাম্প্রদায়িক কোন সমাবেশকেই দেখিবা-মাত্রই গুলি করার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিন।

জনসাধারণের নিকট আমাদের আহ্বান দেশপ্রেমিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া মানবতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিন। শহরে বন্দরে গ্রামে মহল্লায়, সর্বত্র আওয়াজ তুলুন :

- দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন।
- সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না।
- সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠন করুন।
- সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাউক।'

সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ আয়ুব সরকার সংবাদপত্রগুলির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের কণ্ঠরোধ করে দিলেন।

দাঙ্গার মধ্যেই বেরিয়েছিল ঢাকার সেই স্মরণীয় শান্তিমিছিল। আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন কাজী রউফ ও এমদাদ খাঁ। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন নিঃসন্দেহে এবং সঙ্গত কারণেই কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু মানুষদের ওপর তাঁদের বিশ্বাস ফিরে এসেছে যখন তাঁদের মনে পড়েছে আমীর হোসেন চৌধুরীর মহান আত্মত্যাগের কথা। পূর্ব-বঙ্গের দাঙ্গা রুখতে গিয়ে কাজী রউফ ও এমদাদ খাঁ ছাড়াও আরও কয়েকজন মুসলমান জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমীর হোসেন চৌধুরীর কাহিনী।

জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী নিহত হন ১৬ই জানুয়ারী। গুণ্ডারা যখন মত্ত অবস্থায় পাশবিক উল্লাসে সংখ্যালঘু নিধনে অন্ধ, বাহান্ন বছরের চৌধুরী সাহেব তখন দাঙ্গাকারী মুসলমানদের কাজে বাধা দিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁকে তাড়া করল। তাঁর পকেটে পিস্তল ছিল। তিনি যদি প্রথমেই পরিচয় দিতেন যে তিনি মুসলমান তাহলে হয়ত তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটত না। তাঁকে একদল দাঙ্গাকারী মুসলমান তাড়া করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুলি ছুড়তে ছুড়তে ছুটতে থাকেন। আমীর হোসেন সাহেবের গুলিতে পর পর ছ-ব্যক্তি আহত বা নিহত হয়, কিন্তু সপ্তম ব্যক্তি আঘাত পেয়েও চৌধুরী সাহেবকে আক্রমণ করে। তখন তিনি বলে ওঠেন: 'আমাকে মেরো না। আমি মুসলমান।' আক্রমণ-কারীরা 'এখন বেগতিক দেখে তুমি মুসলমান সেজেছ' বলে একটি বল্লম দিয়ে আমীর হোসেন সাহেবের গলা বিদ্ধ করে দেয়। চৌধুরী সাহেব নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন যে এই পৃথিবীতে এখনও মানুষ আছে—মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। আমীর হোসেন চৌধুরী ছিলেন সেই জাতের মানুষ, যাঁরা জীবনে সঙ্কীর্ণতা কি বস্তু তা জানেন



এ বছর (১৯৬৯) মার্চ মাসে ঢাকার নবাবপুর রোডে
আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিশাল শোভাযাত্রা



শেখ মুজিবর রহমান



মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী



ঢাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রগণ কর্তৃক রেল লাইন তুলে ফেলার দৃশ্য। এই হাঙ্গামার ফলে শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়



ফজলুল হক সাহেব কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে পদচ্যুত হয়ে করাচী থেকে ঢাকা ফেরার পথে দমদম বিমান ঘাঁটিতে (৩০।৫।৫৪)। হক সাহেবের পিছনে



১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ জনাব আবুল বরকত

হৈ হল্লা, রাজনৈতিক এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ এবং সরকার বিরোধী সভা সমিতি বায়তুল মোকাররমের সীমানার মধ্যে একেবারেই নিষেধ, এছাড়া অন্য কোন সভা সমিতি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বায়তুল মোকাররমের মধ্যে ও নিষেধ,

SLOGANS, SHOUTINGS, POLITICAL AND SUBVERSIVE ACTIVITIES AND ANTI-GOVERNMENT MEETINGS ARE NOT ALLOWED IN BAITUL MUKARRAN AREA. NO OTHER MEETING WITHOUT PERMISSION IS ALSO ALLOWED HERE.

আয়ুবী গণতন্ত্রে "সরকার বিরোধী সভা" নিষিদ্ধ



এবছর (১৯৬৯) ঢাকায় আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণ
আন্দোলনে শহীদ জনাব মনিরুল ইসলাম



ইয়ুসুফ আলি চৌধুরী
(মোহন মিয়া)



জনাব নুরুল আমিন



জনাব সৈয়দ



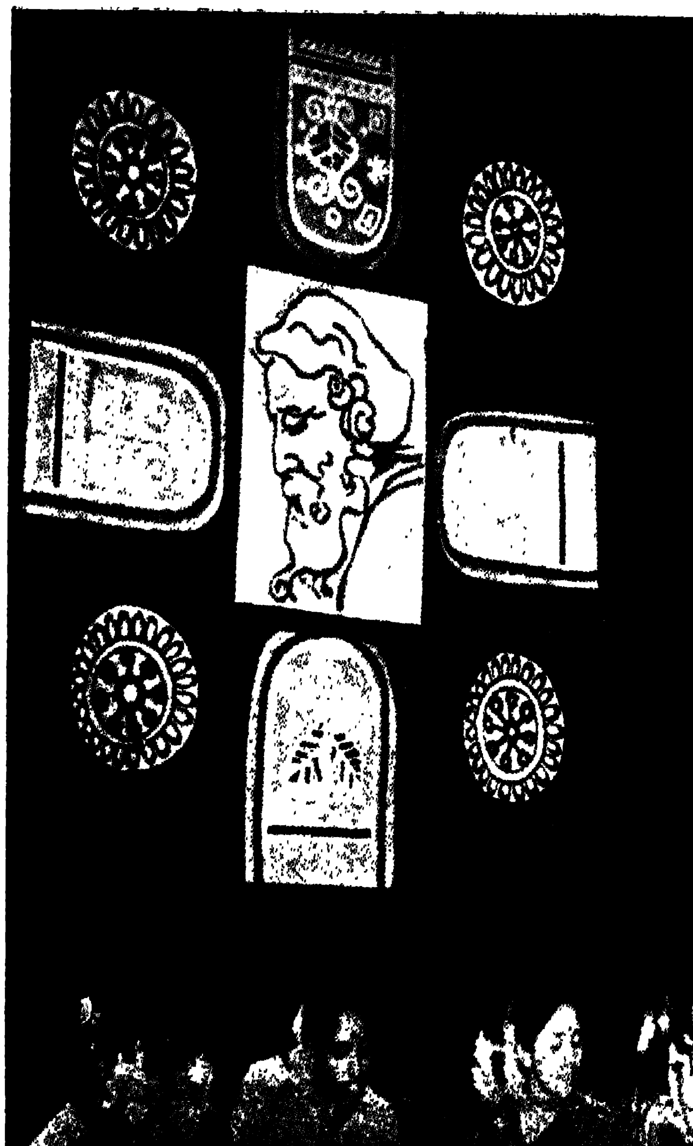
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত



জনপ্রিয় ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমদ্ ঢাকায় আয়ুববিরোধী
এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন (মার্চ, ১৯৬৯)



আওয়ামী নেতা আতাউর রহমান খান সপরিবারে
কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে



এ বছর (১৯৬৯) ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "ছায়ানটে"র
উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান

না, যাঁরা ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে জীবনবোধকে মনুষ্যত্ববোধকে অন্ধকারকক্ষে অবরুদ্ধ করে ফেলেন না। আমীর হোসেন চৌধুরীর পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর উদার মানসিক বিকাশ-বোধের সহায়ক হয়েছিল। রংপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার পরিবারের মেয়ে ছিলেন তাঁর মা এবং বাবা স্বয়ং ছিলেন ময়মনসিং-এর একজন বর্ধিষ্ণু জমিদার। কলকাতার 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী বিখ্যাত সমাজকর্মী বেগম রোকেয়া ছিলেন তাঁর মাসীমা। খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা আবদুল হালিম গজনভী সাহেবের সঙ্গেও চৌধুরী সাহেবের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আমীর হোসেন চৌধুরীর জন্ম কলকাতাতে ১৯১২ সালে এবং এখানেই তিনি মানুষ হন। পাকিস্তান কায়েম হবার পরও প্রায় ছ-বছর তিনি কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহে পৈতৃক জমিজমা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে তাঁকে ১৯৫৩ সালে বাধ্য হয়ে সপরিবারে ঢাকা চলে যেতে হয়। জনাব চৌধুরী কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন। সদাহাস্যময় এই মানুষটি সাহিত্য-পাগল ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের খুব ভক্ত ছিলেন। নজরুলের কিছু কবিতা তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। ঢাকাতে গিয়েই আমীর হোসেন চৌধুরী 'নজরুল স্মরণি' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল'-শীর্ষক একটি গ্রন্থ ছাড়াও সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বই লিখেছিলেন মরহুম আমীর হোসেন চৌধুরী। চৌধুরী সাহেব ছিলেন সহজ সরল মানুষ। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যে তিনি রিকসা চড়ে যাচ্ছেন— হঠাৎ কোন মিষ্টির দোকান বা রেস্তোঁরা তার চোখে পড়ল। চৌধুরী সাহেব রিকসাওয়ালার হাত ধরে তাকে নিয়ে সেখানে ঢুকলেন, একসঙ্গে খেলেন এবং গল্পগুজব করলেন। পূর্ব-পাকিস্তনের অগ্নিগর্ভ রাজনীতিতে আমীর হোসেন সাহেবের ভূমিকা কি ছিল বা হতে

পারত তা জানা যায় না বা জানবার আর কোন উপায়ও নেই। কিন্তু মৌলানা ভাসানী ছিলেন তাঁর প্রিয় নেতা। চৌধুরী সাহেব রেখে গেছেন কি শুধু তাঁর স্ত্রীকে? না, তিনি রেখে গেছেন এক অক্ষয় সত্যের মহৎ উদাহরণ—মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ!

এখনও ঢাকার মানুষ প্রতি বছর ১৬ই জানুয়ারী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মৃতিবার্ষিকী পালন করেন। তাঁর মাজার ফুলে-ফুলে ভরে দেওয়া হয়—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নতুন করে বলিষ্ঠ শপথ নেওয়া হয়।

এ সময় কলকাতার শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের উদ্দেশে প্রচারিত একটি আবেদনে বলেছিলেন: 'গত দু-সপ্তাহ যাবৎ পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে স্থানে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলছে তার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নেই। আমরা মনে করি যে যারা এ সমস্ত জঘণ্য আচরণে লিপ্ত তাদের সঙ্গে মানবতা, ধর্ম ও দেশাত্মবোধের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি উভয় দেশের প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সক্রিয়-ভাবে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারীকে অবিলম্বে নিবৃত্ত করা সম্ভব। আমরা লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকর, অভিনয়শিল্পী, ক্রীড়াবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীরা দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন অবিলম্বে উভয় দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনেন এবং দুর্গতদের সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

এই আবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সঈদ আয়ুব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, কাজী আবদুল ওদুদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, বিমল মিত্র, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, পরিমল গোস্বামী,

গোপাল হালদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, সাগরময় ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, গোলাম কুদ্দুস, আতাউর রহমান, ইবনে ইমান, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যামিনী রায়, আলী আকবর খান, সুচিত্রা মিত্র, সত্যজিত রায়, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র তপন সিংহ, উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বিকাশ রায় প্রভৃতি।

এছাড়া কলকাতা যখন দাঙ্গায় আক্রান্ত সে সময় প্রখ্যাতা লেখিকা ও সমাজসেবী শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠন করলেন 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণ সমিতি' (Council for promotion of communal harmony)। এঁরা ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর নেতৃত্বে নিরলসভাবে সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের কাজে নিরত আছে।

এতক্ষণ ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে ও পশ্চিম-বঙ্গে যে দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল সে কথা বললাম। এর বহুদিন আগে ১৯৫০ সালেও এই দুটি রাজ্যে এক ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-বঙ্গে চলে এসেছিলেন এবং বহু মুসলমান উদ্বাস্তুও সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব-পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ হবার পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় একদল ঘোর সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কি ভাবে ব্যাপক হারে হিন্দুদের পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উৎখাত করা যায় সে বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের এই চক্রান্তে সামিল হয়েছিলেন ভারত থেকে আসা অবাঙালী আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী ও শিল্প-পতি গোষ্ঠী। তাঁরা হিন্দুদের পূর্ব-বঙ্গ থেকে বিতাড়িত করে তাদের জমি, বাড়ি,

ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি হস্তগত করে সেখানে মুসলমানদের বসানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানে যখন কৃষক অভ্যুত্থান সুরু হোল, তখন এই চক্রান্তকারীদের সামনে একটা সুযোগ এলো। এরা নিরীহ অজ্ঞ মুসলমান গ্রামবাসীদের বোঝাল যে এসব কৃষক অভ্যুত্থান হিন্দুরাই সংগঠিত করছে—হিন্দুরা সবাই পাকিস্তানের দুষমন এবং মুসলমান কৃষকদের ক্ষতি করাই ওদের মূল উদ্দেশ্য। অধিকাংশ জায়গাতেই এই অপপ্রচার ব্যর্থ হোল কিন্তু কালসিরা নামে একটি ছোট শহরে চক্রান্তকারীরা হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ঘটাতে সক্ষম হলেন। বিজয়া দশমীর দিন দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে কালসিরা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়ে গেল। দলে দলে হিন্দু কালসিরা ছেড়ে পশ্চিম-বঙ্গে বা পূর্ব-বঙ্গের অন্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলো। ঢাকার কোন সংবাদপত্রে কিন্তু এ ঘটনার কোন উল্লেখই ছিল না। পূর্ব-বঙ্গ বিধান সভায় হিন্দু সদস্যরা কালসিরায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যর্থতার জন্য যখন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে দায়ী করে তাঁদের কৈফিয়ৎ দাবী করলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব সাফ জবাব দিলেন যে ঢাকার সংবাদপত্রগুলিতে কালসিরার ঘটনাবলীর নামগন্ধও নেই। অতএব কালসিরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিন্তু কালসিরার কাহিনী কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে দেরী হোল না। ওখান থেকে যারা প্রাণভয়ে একবস্ত্রে কলকাতায় এসে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন, তাঁরা সত্য ঘটনার সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গে হিন্দু নিধনের অতিরঞ্জিত রোমহর্ষক কাহিনী রটাতে লাগলেন। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামা দিয়ে এসব সংবাদ পরিবেশন করতে সুরু করলেন। কলকাতা ও আশেপাশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কলকাতা ও হাওড়ায়

কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো, যাতে কয়েকজন মুসলমান হতাহত হলেন এবং কিছু মুসলমান ধন-সম্পত্তিও বিনষ্ট হোল। কিন্তু ঢাকার 'আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' পশ্চিম-বঙ্গের ঘটনা সম্পর্কে নানা অতিরঞ্জিত ও আজগুবী খবর ছড়াতে লাগলো এবং স্থানীয় হিন্দুদের ওপর বদলা নেবার জন্য মুসলমানদের সরাসরি আহ্বান জানালো। এসব আজগুবী ও মনগড়া খবরের কয়েকটি নজির দিচ্ছি :

ইউনাইটেড প্রেস অফ পাকিস্তানের জনাব আবদুল মতিন সে সময় ঘটনাচক্রে কলকাতায় ছিলেন। ঢাকার সংবাপত্রগুলি প্রচার করলো যে কলকাতার দাঙ্গায় মতিন সাহেব শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছেন। কিন্তু এর কদিন পরে আবদুল মতিন বহাল তবিয়তে ঢাকায় এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে তাঁর সাংবাদিক বন্ধুরা আঁতকে উঠলেন, আবার আনন্দে আত্মহারাও হলেন। কারণ ঢাকায় প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী কলকাতায় হিন্দু দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হয়ে জনাব মতিন ইতিমধ্যেই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

ঢাকার দৈনিক 'ইত্তেফাকে'-র সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক জনাব আখতার ('মুকুল' নামে সুপরিচিত) সে সময় কলকাতায়। একদিন সন্ধ্যা-বেলা ধর্মতলায় এসে তিনি ঢাকা থেকে বিমান-ডাকে আসা 'দৈনিক আজাদে'র একটি কপি কিনলেন। তিনি বিস্ফারিত চোখে দেখলেন 'আজাদ' প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার হেড লাইন দিয়ে প্রকাশ করেছে যে কলকাতায় অগণিত মুসলমান-কে হিন্দুরা হত্যা করেছে। আশে পাশে তাকিয়ে হাঙ্গামার কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে 'মুকুল' কয়েকজন স্থানীয় মুসলমানকে 'আজাদ' কাগজটি দেখিয়ে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা বললেন যে তাঁরা কলকাতা ও আশে-পাশে কয়েকটি ইতস্ততঃ ঘটনার কথা শুনেছেন কিন্তু 'আজাদ' যে খবর দিয়েছে তা নেহাতই গাঁজাখুরি।

ঢাকার সংবাদপত্রগুলি আরেকটি চাঞ্চল্যকর খবর দিলো, যে হুগলীতে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জনাব ফজলুল হক

সাহেবের ভাগিনেয় পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার জনাব এস. এম্. মুরশেদ সপরিবারে হত হয়েছেন। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় হক সাহেব ট্রাঙ্ক টেলিফোনে জনাব মুরশেদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। জনাব মুরশেদ তাঁর মাতুলকে জানালেন যে তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যথেষ্ট ভাল আছেন—তাঁদের কারো গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে জনাব মুরশেদের এই পুত্রদের মধ্যে একজন বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের যগ্ম-স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব এস্. এ ম্. মুরশেদ।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ ঢাকায় কলকাতায় 'মুসলিম নিধন'এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর জন্য একটি 'প্রতিবাদ দিবস' আহ্বান করা হোল। পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় ঘোর সাম্প্রদায়িক কয়েকজন মুসলমান সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি তীব্র ভাষায় সমবেত মুসলিম শ্রোতাদের উত্তেজিত করে তুললো এবং কাফেরদের ধন-প্রাণ-সম্পত্তি বিনষ্ট করবার জন্য তাদের উস্কানি দিলো। এর পরই ঢাকায় ব্যাপক-হারে হিন্দু-বাড়ি, হিন্দু-দোকান, অন্যান্য হিন্দু ব্যবসা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠিত হতে লাগলো এবং অসংখ্য হিন্দু নিহত হলেন। এই হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা ক্রমশঃ ঢাকা থেকে পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি অংশে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষতঃ বরিশাল, ময়মনসিংহ, ইত্যাদি স্থানে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে পূর্ব-বঙ্গের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই ১৯৫০-এর দাঙ্গা সীমাবদ্ধ ছিল···উত্তরাঞ্চলে বা দক্ষিণাঞ্চলে বা অন্যান্য স্থানে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

পূর্ব-বঙ্গের দাঙ্গার সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর এদিকেও সুরু হোল তার প্রতিক্রিয়া। কলকাতা ও বাইরের কয়েকটি জায়গায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল—সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল একটা দূষিত চক্র বা vicious circle-এ। পূর্ব-বঙ্গের reaction বা প্রতিক্রিয়া পশ্চিম-বঙ্গে, আবার পশ্চিম-বঙ্গের প্রতিক্রিয়া পূর্ব-বঙ্গে।

১৯৫০ সালের ঘটনার পর পূর্ব-বঙ্গ থেকে ব্যাপকহারে বাস্তুত্যাগ সুরু হোল। সরকারী হিসাব মতে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এপ্রিলের ১৬ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব-বঙ্গ থেকে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু পশ্চিম-বঙ্গে পাড়ি দেন। এঁরা অধিকাংশই নেহাতই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাস্তু হলেন। এই নতুন ইহুদীদের স্থানীয় অধিবাসীরা তাচ্ছিল্য-ভরে আখ্যা দিলেন 'রেফিউজি' (refugee) ও পশ্চিম-বঙ্গ থেকে যে মুসলমানরা পূর্ব-বঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন তাদের নাম হোল 'মোহাজের'।

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর পূর্ব-বঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সাহস বা মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে গেল বলতে পারা যায়। তাঁরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দেশত্যাগ করলেন। অনেকে যারা পূর্ব-বঙ্গে চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা, ওকালতি, চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন সাময়িকভাবে পশ্চিম-বাংলায় যাচ্ছি বলে আর পূর্ব-বঙ্গে ফেরেননি। তাঁদের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, ব্যবসা পড়েই রইল। পরে সেগুলি স্থানীয় বা উদ্বাস্তু মুসলমানরা অধিকার করে ভোগ করতে লাগলেন।

পশ্চিম-বঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা থেকেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবাররা অধিকাংশই ঢাকা চলে গেলেন। পশ্চিম-বাংলার মুসলিম সমাজের শীর্ষে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হোল।

দেশ বিভাগের আগে ঢাকার উয়ারি পাড়ার প্রায় সবগুলি সুদৃশ্য বাড়ির মালিক ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা। কিন্তু এখন ঐ পাড়ায় হিন্দু অধিবাসীদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাড়িগুলির প্রায় সবই হয় তাদের হিন্দু মালিকরা দেশত্যাগের আগে যে যা দাম পেয়েছিলেন তাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন—নয়ত কলকাতার বা পশ্চিম বঙ্গের অন্যত্র মুসলিম সম্পত্তির সঙ্গে বিনিময় করেছিলেন।

প্রায় একই অবস্থা কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। এখানে পার্টিশনের আগে বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মুসলমান পরিবারের

বাড়ি ছিল, কিন্তু এখন এ বাড়িগুলির অধিকাংশরই মালিক পূর্ব-বঙ্গ থেকে আসা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন হিন্দু পরিবার। বেশীর ভাগ মুসলিম পরিবার হয় কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে নয়ত বিনিময় করে ঢাকা বা পূর্ব-বঙ্গের অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

পূর্ব-বঙ্গের কালসিরা বা পশ্চিম-বঙ্গের হাওড়াতে যে সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে উভয় বঙ্গে নতুন করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির সূত্রপাত হয়েছিল তা কালক্রমে উভয় অঞ্চলের জনসংখ্যার চিত্রই বদলে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব-বঙ্গে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিম-বঙ্গে এল এবং অসংখ্য মুসলমান এদিক থেকে সীমান্তের ওপারে গেল। ফলে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—১৯৬০ সালের আদম সুমারীতে দেখা গেল যে ঢাকা জেলায় বিশেষ করে ঢাকা শহরে ও খুলনায় হিন্দুর সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম কমে গিয়েছে আর মুসলমানের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে পশ্চিম-বাংলায় দেখা গেল যে নদীয়া বা মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেড়েছে।

অবশ্য উভয় বঙ্গের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর গমন-আগমন সত্ত্বেও এখনও পূর্ব-পাকিস্তানে বহু হিন্দু ও পশ্চিম-বাংলায় অসংখ্য মুসলমান আছেন। পশ্চিম-পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে যে সম্পূর্ণ লোক বিনিময় হয়েছিল তা পূর্বাঞ্চলে হয়নি। তাই পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ এখনও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

আগেই বলেছি যে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব-পাকিস্তানে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তার পেছনে মূলতঃ ছিলো পূর্ব-বঙ্গে বসবাসকারী অবাঙালীরা, যাদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশ ছিলেন ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তু। পূর্ব-পাকিস্তানের এই শ্রেণীটি যে কি পরিমাণে উগ্র ভারত-বিদ্বেষী ও হিন্দু-বিদ্বেষী তার একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলাম ১৯৬৪ সালেই অর্থাৎ দাঙ্গার বছরেই আমার ঢাকা সফরের সময়।

সেবার আমি যখন কয়েকদিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়া ঠিক করলাম, তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করলেন 'ছুটি' নিয়েছো শুনলাম—তা যাচ্ছ কোথায়?' আমি বললাম: 'ঢাকা'। যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তাঁরা। কি সর্বনেশে কথা, বল কি ঢাকায়, পাকিস্তানে? যাবার আর জায়গা পেলোনা……শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে……প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে তো……ইত্যাদি নানা সব অদ্ভুত ও উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল। তাঁদের এমন ভাব-সাব যে ঢাকা বা পাকিস্তান বোধহয় সুন্দর বনের জঙ্গলের অন্তর্গত কোন স্থান—সেখানে বাঘ ভালুকের বাস, গেলেই আমাকে আক্রমণ করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রদায়িকতা বা পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণার দ্বারা দুষ্ট হয়ে আমাদের দেশেও অনেকের মত এতটা আচ্ছন্ন হয়েছিল যে তাঁরা মাঝে মাঝে সব বিচারবোধ হারিয়ে ফেলতেন বলে মনে হয়।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে গেলে, দিন কয়েক সেখানে থেকে জন-সাধারণের সঙ্গে বিশেষতঃ বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানদের একটা বৃহৎ অংশ কত প্রগতিশীল—কতটা উন্নত তাঁদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা। তাঁরা বাঙালী জাতীয়তাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাংলা ভাষা তাদের জানের চেয়ে প্রিয়, এই পূর্ব-পাকিস্তানের নির্ভীক তরুণরাই প্রাণ দিয়ে তাঁদের শাসকগোষ্ঠীর উর্দু চাপানোর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল, বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষা করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো রাষ্ট্রভাষার আসনে। অথচ দুঃখের কথা যে ভারতে বাঙালী হিন্দুদের অনেকের ধারণা যে বাংলাভাষা বোধ হয় শুধু হিন্দুদেরই ভাষা—তাঁরা 'বাঙালী' বলতে শুধু হিন্দু 'বাঙালী'-কেই বোঝেন। তাঁরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন—ও লোকটা বাঙালী না মুসলমান? অর্থাৎ তাঁরা জানতে চান ও লোকটা হিন্দু না মুসলমান? কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ ও অবিচলিত নিষ্ঠা,

তাঁরা যে বাঙালী এবং বাংলা যে তাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের মধ্যে এ গর্ববোধের প্রাবল্য দেখে ভারতের বাঙালীদের এ আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি যে পশ্চিম-বাংলায় হিন্দীর অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করে তাঁরা বাংলা ভাষার যথোপযুক্ত মর্যাদা রক্ষার জন্য কি বা কতটা করতে পেরেছেন ?

পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই আমাকে বলেছেন : 'আমরা আগে ভাবতাম, আমাদের আগে শেখান হয়েছিল যে আমরা আগে মুসলমান, তারপর বাঙালী। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে সেটা কত বড় ভুল। আমরা নিশ্চয়ই আগে বাঙালী, তারপর মুসলমান।' তাঁদের এ মনোভাবের পরিচয় আমি পেয়েছি যখনই ঢাকায় বাঙালীদের বাড়ি গিয়েছি। আমি ভারতীয়, আমি হিন্দু কিন্তু সে কথা ক্ষণিকের জন্যও তাঁদের মনে উদিত হয়নি। আমি বাঙালী এই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং তাঁরা নিতান্ত আপন-জনের মত, পরমাত্মীয়ের মত আমাকে তাঁদের বাড়িতে একেবারে অন্দর-মহলে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজেই দেখেছি যে পশ্চিম-পাকিস্তানের অবাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরা অত সহজভাবে মিশতে পারেননি। তাঁদের সঙ্গে সর্বদা একটা দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

ঢাকায় মোহন মিঞা সাহেবের মাহুতটুলির বাড়িতে একটা বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে আমার কাছে আরও ভাল করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল মৌলানা ভাসানী সাহেবের একটি মূল্যবান উক্তি যে কত সত্য, কত যথার্থ। ভাসানী সাহেব বলেছিলেন 'বাংলাদেশ আজ দুটি দেশ, কিন্তু বাঙালীদের মন একটি-ই।'

এই ঘটনাটি পাকিস্তানে বাঙালীদের প্রতি অবাঙালীদের বিদ্বেষভরা তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাবটিও আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করেছিল।

একদিন রাত্রে মোহন মিয়া সাহেবের ঢাকার বাড়িতে আমার দাওয়াত ছিল। ফরিদপুরের স্বনামধন্য ব্যক্তি মোহন মিয়া বা

ইয়ুসুফ আলী চৌধুরীর কথা ১৯৫৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভার সঙ্কটের কথা বিবৃত করবার সময় উল্লেখ করেছি। মোহন মিয়া সাহেব পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি-তে অত্যন্ত বিতর্কমূলক, কিন্তু শক্তিশালী এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে অনেকে আখ্যা দিয়েছিলেন : 'Minister-maker' অর্থাৎ যিনি মন্ত্রী তৈরী করেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান ও তার অধিবাসী বাঙালীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বড় ভাই লাল মিয়া সাহেবের নামও সমধিক সুপরিচিত। লাল মিয়া সাহেব সে সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। স্বাস্থ্য ও শ্রমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের নির্বাচনী প্রচারের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান সফর উপলক্ষ্যে তখন ঢাকায় এসেছিলেন। লাল মিয়া সাহেবও সেদিন রাত্রে তাঁর ভাই মোহন মিয়া সাহেবের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। আর নিমন্ত্রিত ছিলেন ফকরুদ্দিন ভালিকা নামে করাচীর অর্থাৎ পশ্চিম-পাকিস্তানের এক বিত্তবান শিল্পপতি। ভালিকা সাহেব স্বাধীনতার আগে বোম্বাইতে একজন কমিশন এজেণ্টের কাজ করতেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে করাচীতে এসে সরকারী আনুকূল্যে তাঁর কপাল খুলে গিয়েছিল।

মোহন মিয়া সাহেবের কয়েকজন আত্মীয় এবং ঢাকার কয়েকজন বাঙালী সাংবাদিকও এই নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মোহন মিঞা সাহেব ফকরুদ্দিন ভালিকার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন···বললেন, 'আমাদের বন্ধু অমিতাভ গুপ্ত কলকাতা থেকে এসেছেন···ঢাকায় ·আমার জামাই-এর অতিথি।' ফকরুদ্দিন সাহেব আমার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বুঝতে পারলাম তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চন দেখে। ফকরুদ্দিন সাহেব বিনা ভূমিকায় প্রথম প্রশ্নই আমাকে করে বসলেন, 'ভারতে মুসলমানদের হাল এত খারাপ কেন?' অত্যন্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগেই মোহন মিঞা সাহেব ও তাঁর নিমন্ত্রিত বাঙালী বন্ধু-বান্ধবদের

দু-চারজন প্রসঙ্গটি পরিবর্তন করবার জন্য বলে উঠলেন, ভালিকা সাহেব এ সব বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনার কি দরকার। উনি ভারত থেকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন। আসুন আমরা অন্য বিষয়ে আলাপ করি।' প্রসঙ্গটা আপাততঃ চাপা পড়ল বটে, কিন্তু খাবার টেবিলে ফকরুদ্দিন সাহেব আবার কথাটা তুললেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হিন্দুস্থান থেকে মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? তিনি এ প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন উপস্থিত পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙালীরা। ফকরুদ্দিন সাহেবের আত্মসম্মানে বোধহয় ঘা লাগল একজন ভারতীয় হিন্দুর সমর্থনে উপস্থিত পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রতিবাদে। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং যে সব ভাষা ব্যবহার করতে সুরু করলেন তাতে তাঁর স্বরূপ বেশ ভালকরেই ফুটে উঠল। তিনি মোহন মিঞা সাহেবকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন আপনার বাড়িতে ভারতীয় হিন্দু অতিথি কেন। হিন্দুরা সবাই বেইমান, বেতমিজ এবং পাকিস্তানের দুষমন। ফকরুদ্দিন সাহেবের প্রশ্নে ও মন্তব্যে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ওখানে উপস্থিত পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান অতিথিরা। তাঁদের মধ্যে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র জনাব মোতাহার হোসেন চৌধুরী, মোহন মিঞা সাহেবের জামাই ঢাকা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার জনাব বদরুল আমীন, ইত্যাদি ছিলেন। তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'গুপ্ত সাহেব ভারতীয় কি পাকিস্তানী তা জানি না···উনি হিন্দু কি মুসলমান জানি না। কিন্তু উনি বাঙালী এবং তাই তিনি আমাদের একান্ত আপন জন।' ফকরুদ্দিন সাহেব একথা শুনে মদমত্ত হস্তীর মত চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমরা বাঙালী বাঙালী করছ কেন। তোমরা আগে পাকিস্তানী। তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে ভারতের হিন্দুরা এসে তোমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে ইত্যাদি। পূর্ব-পাকিস্তানী বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠলেন এবং আমিও যোগ দিলাম: 'না, ফকরুদ্দিন সাহেব কে ভারতীয়, কে পাকিস্তানী সে

পরিচয় তো আছেই, কিন্তু আমরা বাঙালী বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এই আমাদের সব চেয়ে বড় পরিচয়।' ক্ষিপ্ত ফকরুদ্দিন সাহেব চীৎকার করে বললেন তোমরা বাঙালীরা সবাই বিশ্বাসঘাতক! আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীরা, আমরা অবাঙালীরা তোমাদের রক্ষা করছি, তাই তোমরা বেঁচে আছ। নয়ত কবে ভারতের হিন্দুরা তোমাদের গ্রাস করে নিত।' পূর্ব-পাকিস্তানী বন্ধুরা বলে উঠলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানীদের তাঁবেদারি ও চোখ রাঙানোর মধ্যে বাস করবার চেয়ে বোধহয় তাও ভাল হোত।'

তর্কের গতি ক্রমেই এত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছিল যে লাল মিঞা সাহেব ও মোহন মিঞা সাহেব হস্তক্ষেপ করে ফকরুদ্দিন ভালিকা সাহেবকে অন্য ঘরে না নিয়ে গেলে বোধ হয় হাতাহাতি সুরু হোত

পূর্ব-পাকিস্তানী বন্ধুরা বলতে লাগলেন: 'অমিতাভবাবু পশ্চিম পাকিস্তানের এ ধরনের লোকেরাই পূর্ব-বাঙলার যত দুর্দশার মূলে সাম্প্রদায়িক কলহের ইন্ধন এরাই যোগায়—হিন্দু বিদ্বেষ এরাই ছড়ায়। হিন্দু ভারতের জুজু দেখিয়ে তাদের হাত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে রক্ষা করবার অজুহাত দেখিয়ে এখানে জেঁকে বসে আমাদের ওপর শোষণ চালায়।'

আমি বললাম, 'ভারতের চিত্রও প্রায় একই। সেখানেও অবাঙালীদের বিশেষ করে উত্তর-ভারতীয়দের বাঙালীশোষণের বিষয়ে ভূমিকা একই।'

কিন্তু আমি মনে মনে ভাবলাম যে কলকাতায় কোন মাড়োয়ারী বাড়ি গুজরাটি ব্যবসাদার যদি ঢাকা থেকে আগত কোন পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমান সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতেন আমরা কি আমাদের সেই বাঙালী ভাই-এর সমর্থনে এভাবে সমবেতভাবে এগিয়ে আসতাম?

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব-বঙ্গে খুলনা, ঢাকা, প্রভৃতি

অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর পর আয়ুব-সরকার ঐ বছরেরই ফেব্রুয়ারী মাসে 'উপক্রুত ব্যক্তি পুনর্বাসন' আইনের নামে একটি জরুরী অর্ডিনান্স জারী করে উপক্রুত ব্যক্তিদের ওপর স্থায়ী উপদ্রবের এক নয়া বন্দোবস্ত করলেন। এই আইনের ৪নং ও ৬নং ধারার বলে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তর বিশেষতঃ জমি-বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই অর্ডিনান্সের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেছিলেন যে হতভাগ্য সংখ্যালঘু যাঁরা ভীত-তাড়িত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তারা ফিরে এসে যাতে তাদের ঘর-বাড়ি, জোত-জমি অখণ্ড অটুট অবস্থায় পেতে পারে তার রক্ষা-কবজ হিসাবেই এ ব্যবস্থা। কিন্তু, শিশু-পাঠ্য পুস্তকে গরুর শোকে যে শকুনিটি কেঁদে ভাসিয়েছিল তার নয়নের পানিও বোধ হয় দরদের এত বান ডেকে আনেনি।

আয়ুব-সরকার মুখে যাই বলুন না কেন, এই অর্ডিনান্সটি জারী করবার পিছনে তাদের সুস্পষ্ট একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ব-বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে শ্রেণীর প্রাধান্য অসাধারণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা হোল মুসলমান জোতদার বা কুলাক শ্রেণী। যখন-তখন যত্র-তত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু চাষীদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে, নির্মম ও লোভী এই কুলাক শ্রেণী প্রতিবেশী অমুসলমানদের সম্পত্তি এক কথায় যথাসর্বস্ব গ্রাস করে ফেঁপে ফুলে উঠেছে। আয়ুব-সরকারের নীতি গ্রামাঞ্চলে বেসিক ডেমোক্রেসীর নামে কুলাকদের এই হিংস্র অংশটিকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ক্ষমতাসীন করে রেখে নিজেদের বনিয়াদ পোক্ত করা। এদের হাতে রাখার উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিত পন্থায় অমুসলমানদের সম্পত্তি বিক্রি অসম্ভব করে তোলা হয়েছে, যাতে কুলাকরা পয়সা দিয়ে না কিনে এমনিতেই তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে পারে।

অবশ্য কুলাক বা জোতদাররা ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তানে অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও একটি অংশও যেন-তেন-প্রকারেণ সংখ্যালঘু সম্পত্তি হস্তগত করবার নিরন্তর অপচেষ্টায় বিরত হননি। ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ' মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, পূর্ব-বঙ্গের পল্লীতে বা শহরে আজ যাঁরা ধনী হয়েছেন খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে এঁদের অনেকেই সংখ্যালঘু সম্পত্তির উপর নিজেদের 'ধন' এবং 'মানে'র ইমারৎ গড়ে তুলেছেন। সংবাদ সম্পাদকের মতে: 'শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ছলে-বলে-কৌশলে অথবা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের একান্ত অসহায় সুযোগ নিয়েই সংখ্যালঘু সম্পত্তির হস্তান্তর সাধিত হয়েছে। বিগত সতেরো বছরে কোন সরকারই এ ধরনের অসাধুতা বন্ধ করতে অগ্রসর হয়নি।

সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ক্ষমতাধীন দল থেকে সুরু করে সামাজিক দুষ্কৃতিকারীদের লুটের বখরার মত ব্যবহৃত হচ্ছে' (সংবাদ ১১।১।৬৫)।

বরিশালের শ্রীচিত্তরঞ্জন সুতার নামে এক ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে স্থানীয় সাব রেজিস্ট্রারের থেকে বাধা পেয়ে উপদ্রুত ব্যক্তি পুনর্বাসন আইনের বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করেন। বিচারপতিদের রায়ে আইনটি শাসনতন্ত্র বিরোধী বলে বাতিল ঘোষিত হয়। সরকার হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপর্ব সুরু হতে দীর্ঘদিন দেরী হয়েছিল। এই সুযোগে আয়ুব-সরকার এই আইনটির মেয়াদ বাড়িয়েই চলেন। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-বাংলায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একটা চিরস্থায়ী দাঙ্গা পরিস্থিতি জীইয়ে রাখা।

চিত্তরঞ্জন সুতার তাঁর বেয়াদবির উপযুক্ত সাজা পেয়েছিলেন। তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য নিরাপত্তা আইনে আটক হয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে "উপদ্রুত ব্যক্তি পুনর্বাসন" আইনটির পুনর্বার মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আলোচনা

সুরু হলে বিরোধী সদস্য জনাব আহমেতুল কবীর সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, 'এ আইন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনের অসহনীয় এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর লড়াই-এর সময় ও তার পরেও পূর্ব-পাকিস্তানে অমুসলমানদের বাড়িঘর শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে জবর-দখল করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ অরণ্য-রোদনের পর্যবসিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের উর্ধ্বতম আমলা থেকে সুরু করে চৌকিদারকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে হচ্ছে। এমন কি নিজের জমির বাঁশ কাটার অধিকারও আজ তাদের নেই, কারণ সে কাজও সংখ্যালঘু সম্পত্তি হস্তান্তরের সামিল বলে উর্বর মস্তিষ্ক আয়ুব-চক্র আবিষ্কার করেছেন।

এ ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের বহু গ্রামে হিন্দু অধিবাসীদের ইউনিয়ন ট্যাক্স যথেচ্ছভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটি উদাহরণস্বরূপ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার দুর্গাপুর ইউনিয়ন কাউন্সিল ঐ ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ট্যাক্স ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে প্রায় দ্বিগুণ বা আরও বেশী করে দিয়েছিলেন—

নাম	গ্রাম	১৯৬৫ সালের ট্যাক্স	১৯৬৬ সালের ট্যাক্স
পীতাম্বর পাল	শান্তিপুর	৫ টাকা	১০ টাকা ৯৪ পয়সা
ফাগুণা পাল	শান্তিপুর	২ টাকা	৯ টাকা
বলাইচন্দ্র পাল	শান্তিপুর	৪ টাকা	৮ টাকা
খোকারাম মহান্ত	শান্তিপুর	১৬ টাকা	২৪ টাকা
অধরচন্দ্র পাল	শান্তিপুর	৫ টাকা	৮ টাকা ৬৯ পয়সা
ধরণীকান্ত পাল	ডাবরা	১৮ টাকা	৩১ টাকা
বাণীকান্ত পাল	ডাবরা	৬ টা. ৭৫ প,	১৪ টাকা

এই ট্যাক্স ধার্যের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য যে কি প্রকট হয়ে উঠেছিল তার একটি নজির—উপরোক্ত দুর্গাপুর ইউনিয়নের

আবছুর রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তি ২০ বিঘা জমি ও কয়েকটি ঘরের মালিক—তাঁর ট্যাক্স হয়েছিল ৫ টাকা ৪৩ পয়সা অথচ ঐ একই ইউনিয়নে এক হিন্দু অধিবাসী শুধু ১২ কাঠা জমি ও একটি মাত্র চালা ঘরের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ট্যাক্স দিতে হয়েছিল ১৯ টাকা ৮২ পয়সা।

বরিশাল থেকে নির্বাচিত বিরোধী-পক্ষীয় সংখ্যালঘু সদস্য শ্রীনীরোদ নাগ—হিন্দুদের উপর সরকার-প্ররোচিত জুলুমবাজির নানা নজীর উত্থাপন করে বলেন যে অমুসলমানদের জমি বা বাড়ি বন্ধক দেবার উপরও নিষেধাজ্ঞা থাকার দরুণ আজ কোন হিন্দুর পক্ষে সম্পত্তির বিনিময়ে শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এমন কি বরিশালের এক হিন্দু চিকিৎসক শ্যাম ডাক্তার একটি এক্স-রে প্লাণ্ট কেনবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর একখণ্ড জমি বিক্রি করবার বহু চেষ্টা করেও সরকারী অনুমতি পাননি।

জবর-দখলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার বাঘারামপুর গ্রামের কাউন্সিলের মুসলমান চেয়ারম্যান শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র সাহা নামে এক গ্রামবাসীর বাড়ি ও জমি জোর করে দখল করে চাষবাস সুরু করে দেন।

ঢাকা জেলার গোলকুণ্ডা ইউনিয়নের সদস্য এক হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের টাকা সংগ্রহের জন্য জমি বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়ে অবরুদ্ধ বর্ডার অতিক্রম করে অজস্র ঝুঁকি নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সংখ্যালঘু নিপীড়নের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে শ্রীনীরোদ নাগ জানান যে, অমুসলমানদের শুধু নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই গণ্য করা হচ্ছে না—সম্পত্তি বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়ে নিদারুণ অর্থনৈতিক চাপে হিন্দুরা ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে—বরিশাল জেলার-

অধিবাসী শ্রীজয়নাগ হাওলাদার জমি বিক্রির অনুমতি না পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ করতে পেরেছেন। কোর্টে এফিডেফিট করে তিনি হয়েছেন জনাব জয়নাল হাওলাদার।

শ্রীনীরোদ নাগের এই নির্মম অভিযোগ খণ্ডন করবার কোন যুক্তি সরকার পক্ষের সদস্যরা খুঁজে পাননি। শুধু নিস্তব্ধ পরিষদের নীরবতা ভঙ্গ করে বিরোধী সদস্য জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন বলে ওঠেন, 'আমেরিকার সংখ্যালঘু নিগ্রোদেরও জমি হস্তান্তরের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়নি, কিন্তু আমাদের দেশে তাও হয়েছে।'

জমি হস্তান্তর আইনটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধি। পূর্ব-বাংলার কি মুসলমান কি হিন্দু কারোরই মরণ-বাঁচনে আয়ুব খানের কিছু এসে যেতো না। আয়ুব যে কত বড় মুসলিম-দরদী পূর্ব-পাকিস্তানের বহু সমস্যার প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ও প্রমাণ · প্রতিনিয়ত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পূর্ব-বাংলার সাধারণ মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে ক্ষতিকর ভেদ-সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, পূর্ব-বাংলার সম্ভাব্য জাতীয় গণতান্ত্রিক সংহতি-কে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার আশায়, আয়ুব সরকার এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করে—যে কাজ একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা করতো এবং করাতো একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্রিটিশের মত আয়ুবী স্বৈরতন্ত্রও পূর্ব-বাংলাকে উপনিবেশ করে রাখতে চেয়েছিল। বিশেষ করে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে এই অর্ডিনান্সটি জারী করার মধ্যে স্বৈরাচারী আয়ুব সরকারের স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজজীবনে ও রাজনীতিতে শহরাঞ্চলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আজ আর কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব নেই। চাকরি ও পেশা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রেষারেষি বা প্রতিযোগিতা আজ ইতিহাসের বিষয়, চলতি রাজনীতির প্রসঙ্গ নয়। পূর্ব-বাংলার নতুন ও উঠতি মুসলিম

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে আজ পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজির শোষণ ও আমলাতান্ত্রিক হুকুমদারি-ই হোল প্রধান সমস্যা। ১৯৬৪-এর দাঙ্গার সময় এই নব্য শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই দাঙ্গার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য প্রচার ও প্রতিরোধ করেছিলেন এবং আয়ুবী হামলার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

দেশ বিভক্ত হবার পর বাংলাদেশের উভয় অঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বহু ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। লাখে-লাখে উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে বা পশ্চিম-বঙ্গ থেকে পাকিস্তানে চলে এসেছেন। পেছনে ফেলে এসেছেন বহু টাকার ধন-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি। এ বিষয়ে কোন "নৈতিকতার প্রশ্ন" বহু দিন পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে বা পশ্চিম-বঙ্গে কেউ তুলে ধরেছিলেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের নতুন প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর একটি বড় অংশের মনকে এই "নৈতিকতার প্রশ্নটি" ক্রমে আলোড়িত করতে সুরু করেছিল এবং তাঁদেরই অন্যতম মুখপত্র পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিবাদী "দৈনিক সংবাদ" মন্তব্য করেছিলেন: 'বিগত সতেরো বৎসর পূর্ব-পাকিস্তান হইতে অনেক সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করিয়াছেন। যখন দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহাওয়া বিরাজ করিয়াছে সেই স্বল্প সময়টুকু বাদ দিলেও কখনও মন্থর গতিতে কখনও বা হিড়িকে বাস্তুত্যাগ চলিয়া আসিতেছে। এই বাস্তুত্যাগের রাজনৈতিক সামাজিক দিক এবং ইহারই পাল্টা ভারত হইতে সেখানকার যে-সব সংখ্যালঘু এই দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের পুনর্বাসনের সমস্যা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে চলিয়া গিয়া সংখ্যালঘুরা সম্পত্তির আকারে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

যদিও অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিনিময় হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সামাজিক দুষ্কৃতকারীরা লুটের মাল হিসাবেই ব্যবহার

করিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের পল্লীতে অথবা শহরে আজ যাহারা ধনী হইয়াছেন এবং সেই ধনের দৌলতে কোন-কোন ক্ষেত্রে মানী হইয়াছেন, খোঁজ লইলে দেখা যাইবে যে ইহাদের অনেকেই সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির উপরই নিজেদের "ধন" এবং "মানে"র ইমরাৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বাজার মূল্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে সব লেনদেন বা সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে সে সম্পর্কে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু লক্ষ লেনদেনের মধ্যে এই ধরনের স্বাভাবিক লেনদেন কত? শতকরা দশ পনেরোর বেশী হইবে না। বাকী পঁচাশি বা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে ছলে-বলে-কৌশলে অথবা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের একান্ত অসহায় অবস্থার সুযোগেই সংখ্যালঘু সম্পত্তির হস্তান্তর সাধিত হইয়াছে। বিগত সতেরো বৎসরে কোন সরকারই এই ধরনের অসাধুতা বন্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই। বরঞ্চ সামাজিক নৈতিকতাহীন ব্যক্তিদের মত বিভিন্ন সময়ে সরকারী পর্যায়ের লোকেরাও এই ধরনের লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াছেন, ইহার মধ্যে গর্হিত কোন কিছুই তাঁরা দেখেন নাই। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা জাতির নৈতিকতাকে কোথায় নামাইতে পারে সে কথাটা খুব কম লোকেই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি সতেরো বৎসর পর যখন সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এই অধঃপতিত নৈতিকতার বিষাক্ত অনুপ্রবেশ আর ঢাকিয়া রাখা যাইতেছে না, সমাজদেহে সহস্র বিষদাঁতের মত যাহা সম্ভবতঃ দৃশ্যমান, তখনও এ সম্পর্কে আমাদের বিবেক নীরব। অন্ততঃ ভাবী বংশধরদের মুখের দিকে তাকাইয়া এ সম্পর্কে আজ সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় অসাধুতা ও নীতিহীনতার যে নজির রাখিয়া যাওয়া হইতেছে; তাহা ভাবী বংশধরদের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে।

আইন মোতাবেক বাস্তুত্যাগীদের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকের ভার সরকারের। ইহার অর্থ উক্ত ধরনের

সম্পত্তি জাতীয় কল্যাণেই ব্যবহার হইবে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইতেছে কি? সংখ্যালঘুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ক্ষমতাধীন দল হইতে স্থরু করিয়া সামাজিক দুষ্কৃতকারীদের লুটের বখরার মত ব্যবহৃত হইতেছে, এই ধরনের খবর অতীতে এবং বর্তমানে প্রায়ই পত্রিকার দফতরে আসিয়া পৌঁছায়…'

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত লড়াই-এর সময়ও ভারতীয় নাগরিকের মালিকাধীন বহু সম্পত্তি ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়—মূলতঃ হিন্দুদের বহু সম্পত্তিও আয়ুব সরকার "Enemy Property" বা "শত্রু সম্পত্তি" বলে ঘোষণা করেছিল। এ ভাবে "শত্রু সম্পত্তি" বলে ঘোষিত প্রায় দুশো নৌযান, বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, ভূ-সম্পত্তি, ইমারত ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা বা সংরক্ষণের অভাবে অচল বা বিনষ্ট হতে চলেছে। এ সব সম্পত্তির মোট মূল্য কত হবে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হলেও ওয়াকিবহাল মহল তার মোট পরিমাণ বহু কোটি টাকা বলে অনুমান করেছেন। এসব তথাকথিত শত্রু সম্পত্তির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য: বাষ্পীয় ও মোটরচালিত বার্জ ও ফ্যাট, চিনির মিল (গোপালপুরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্, দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস), বস্ত্রমিল (ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস), দুলিচাঁদ অয়েল মিলস ও হরদেও গ্লাস ও সিলিকেট ফ্যাক্টরি, সিনেমা হল (ঢাকার নাগর মহল, খুলনার উল্লাসিনী), ঢাকার বিবেকানন্দ বস্ত্রালয় ও ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষিত ভূসম্পত্তি বা ইমারতের সঠিক সংখ্যা নাকি এখনও নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু বিভিন্ন জেলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে এক শ্রেণীর অসাধু অফিসার ও কর্মচারীর যোগসাজশে বহু জমি ও ইমারত বেমালুম ভোগ করছে। অসাধু অফিসাররা এ ধরনের অসংখ্য ভূ-সম্পত্তি শুধু ভোগ দখলই করছে না—উপরন্তু দিনের পর দিন অবাধে লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে।

আয়ুবী শাসনে পূর্ব-বাংলায় প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপে ও যোগসাজশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সরকারী মহল ও তাঁদের তাঁবেদার-গোষ্ঠী হীনতর যে সব পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হোল বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখা। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল! D. P. R. বা ডিফেনস্ অব পাকিস্তান রুলস-এর পাতা দেখিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বহু হিন্দু রাজনৈতিক কর্মীকে ধড়পাকড় করা হয়েছিল। 'হিন্দু' ও 'হিন্দুস্থান'-এর বিরুদ্ধে সরকারী মহল জেহাদ ঘোষণার জিগীর তুলেছিলেন—এমন কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালীর নববর্ষ পয়লা বৈশাখকেও তারা রেহাই দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখ প্রসঙ্গে পরে আসছি—এখন আয়ুবী রাজ-রোষের বন্দী মানুষদের কথায় আসা যাক। প্রথমে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের কথা বলছি :

১৯৬৬ সালের ১৬ই জুলাই ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে পাকিস্তান দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে আটক রাজবন্দীদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে সরকার পক্ষের অসম্মতির প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা একযোগে পর-পর দুবার সভাকক্ষ ত্যাগ করে যান।

এ বিষয়ে প্রশ্ন কিন্তু সরকার দলীয় এক সদস্যই—জনাব আতিয়ার রহমান উত্থাপন করেছিলেন—যদিও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বলেন যে জনস্বার্থে এ তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়। ডেপুটি স্পীকার জনাব গমিরুদ্দীন সাহেব (দেশ বিভাগের পর জলপাইগুড়ি থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে আসা জনাব গমিরুদ্দিন পরে স্পীকার নিযুক্ত হয়েছিলেন) এ প্রসঙ্গে অন্য কোন প্রশ্ন তোলবার বা আলোচনার অনুমতি দেননি।

জনাব আতিয়ার রহমানের গোস্তাকি তাঁর দলের পাণ্ডারা মাফ করতে পারেননি। মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী দলের সম্পাদক জনাব আতাউদ্দীন খান জানান যে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আতিয়ার রহমানের উপর নোটিশ জারী করা হবে। আতিয়ার সাহেব এ নোটিশ পেয়েছিলেন পরদিন ১৭ই জুলাই রাত দুটোর সময়। লীগ দলের কর্মতৎপরতা প্রশ্নের উর্ধ্বে সন্দেহ নেই।

এর আগে ২৬শে জুন তারিখেও প্রাদেশিক পরিষদে অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে বিরোধী সদস্য জনাব আহমেতুল কবির জানান যে পূর্ব-পাকিস্তানে এমন কয়েকজন নেতা আছেন যাঁরা ১৯৫৮ সালে আয়ুবী শাসন জারী হবার পর থেকেই একটানা কারাযন্ত্রণা ভোগ করে আসছেন বা আত্মগোপন করে ফেরারী জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

বস্তুতঃ এঁদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকেই ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের শাসনকালে সামান্য দেড় বছরের বিরতি ছাড়া সুদীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ বন্দী বা ফেরার ছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন :

ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলে বন্দী

ননী চৌধুরী (নারায়ণগঞ্জ)
অজয় ভট্টাচার্য
লালা শরদিন্দু দে (বুলিবাবু) সিলেট
অমল সেন (যশোর)
সন্তোষ ব্যানার্জি (ফরিদপুর)
আশু ভরদ্বাজ
ধীরেন দাশ (ময়মনসিংহ)
মন্মথ দে

বিষ্ণু ভট্টাচার্য
রতন সেন

গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় আত্মগোপনকারী

মণি সিং (১৯৬৭ সালের আকস্মিকভাবে ধৃত হন), সুখেন্দু দস্তিদার, সুধাংশুবিমল দত্ত, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, নলিনী দাস, আবদুস সাত্তার, অমর সেন, সুধীন রায় (খোকা রায়) বারীন দত্তচৌধুরী।

ঢাকার সাপ্তাহিক "জনতা" এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমাদের দেশের অনেক বীর সন্তানকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় করিয়া রাত্রির অন্ধকারকে নিজেদের সহচর হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিতে হইয়াছে।'

সুখেন্দু দস্তিদারের মেয়ে "জনতা"র প্রতিনিধিকে সজল চোখে বলেছিল : 'আমার বাবাকে আমি কোনদিন দেখিনি।'

দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরা ছাড়াও স্বৈরাচারী আয়ুব সরকার শত শত দেশপ্রেমিককে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক এই বন্দীদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিধারী বহু ব্যক্তি ছিলেন যথা :

রণেশ দাশগুপ্ত	(ঢাকা)	সাংবাদিক
সত্যেন সেন	(ঢাকা)	সাংবাদিক
প্রসাদ রায়	(পাবনা)	সাংবাদিক
রণেশ মৈত্র	(পাবনা)	সাংবাদিক
নগেন সরকার	(ময়মনসিংহ)	সাংবাদিক
ডাঃ ভূপতিকান্ত মৈত্র	(রংপুর)	চিকিৎসক
বিজয়চন্দ্র মিত্র (পাখীবাবু)	(রংপুর)	উকিল
হীরালাল দাশগুপ্ত	(বরিশাল)	শিক্ষক

এ ছাড়া পূর্ণেন্দু দস্তিদার (চট্টগ্রাম), রবি নিয়োগী, মহাদেব সান্ন্যাল, জিতেন ঘোষ, দুর্গেশ পত্রনবীশ, সুকুমার ভাওয়াল, জ্যোতিষ বসু (ময়মনসিংহ), চিত্তরঞ্জন সুতার, অবনী ঘোষ (বরিশাল), গৌরচন্দ্র বালা (ফরিদপুর), জিতেন দত্ত (রংপুর) প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সমাজসেবী কর্মীরা।

প্রাক্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লায় ধর্ম-সাগরের তীরবর্তী তাঁর বাসভবনে অন্তরীণ হয়ে ছিলেন। রেডিও শোনা এমন কি বাড়ির বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ করাও তাঁর নিষিদ্ধ ছিল। এ সব নিষেধাজ্ঞার কোনটি লঙ্ঘন করলে তাঁকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া চলতে পারতো।

সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও (মহারাজ) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জেলে বন্দী ছিলেন।

নোয়াখালী জেলার জনপ্রিয় ছাত্রনেতা পূর্ব-পাকিস্তান-ছাত্র-ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য শ্রীতরুণ নাগ ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জরুরী অবস্থার অজুহাতে গ্রেপ্তার হন। এর মাত্র দুদিন আগে তরুণ নাগ পাকিস্তানবাসীকে দেশরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে চৌমুহনী বাজারে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন, তবুও দেশপ্রেমের পরীক্ষায় তিনি আয়ুবী কষ্টি-পাথরে উত্তীর্ণ হতে পারেননি! কর্তৃপক্ষের চোখে তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিলো—তিনি হিন্দু।

বিভিন্ন জেলে দেশরক্ষা আইনে আটক বন্দীদের নিদারুণ মর্মন্তুদ ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছিল। প্রায় সকলকেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে অত্যন্ত জঘন্য অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল। খাওয়া খরচ বাবদ তাঁদের দৈনিক খরচ দেওয়া হচ্ছিল মাত্র দেড় টাকা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস-পত্র কেনবার জন্য মাসে মাত্র পাঁচ টাকা। দৈনিক "সংবাদ" এ বিষয়ে মন্তব্য করে লিখেছিলেন: 'ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে গুহা মানবের যুগে যখন কোমরের নীচে কিঞ্চিৎ বল্কল পরিয়াই মানুষ বসবাস করিত, সেই প্রাগৈতিহাসিক মাপকাঠিতেই কর্তৃপক্ষ আটক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রয়োজনগুলি নির্ধারিত করে দিয়াছেন।'

কর্তৃপক্ষ আটক নেতাদের পরিবারবর্গের জন্য কোন পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেননি—বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে তাঁদের স্থাবর-

অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছেন। এমন কি বসতবাটি পর্যন্ত নীলামে চড়িয়েছেন। ফলে বহু পরিবারের অবস্থা হয়েছিল ধ্বংসোন্মুখ।

উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহ জেলার তিনজন রাজবন্দীর স্ত্রী যথাক্রমে শহরের ব্রাহ্মপল্লীর অধিবাসী শ্রীমতী শান্তি সান্যাল (স্বামী শ্রীমহাদেব সান্যাল), খামারবাজার ডাকঘরের এলাকাধীন শশাগ্রামের শ্রীমতী ছায়া বসু (স্বামী শ্রীজ্যোতিষ বসু), শেরপুরের নিয়োগীবাড়ির শ্রীমতী জ্যোৎস্না নিয়োগী (স্বামী শ্রীরবি নিয়োগী) সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন যে, 'খুন, ডাকাতি, জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীদের জেলে খাওয়া-পরা ও অন্যান্য বিষয়ের যে ব্যবস্থা আছে তার চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের ব্যবস্থা সরকার চালু করেছেন।'

শ্রীমতী ছায়া বসু আরও জানান যে তাঁর স্বামী শ্রীজ্যোতিষ বসু ১৯৬০ সালে গ্রেপ্তার হবার পর তাঁদের যে ছোট একটি বাড়ি ময়মনসিংহ শহরে ছিল তা সরকার বাজেয়াপ্ত করে নীলামে বিক্রি করে দেন। প্রাদেশিক গভর্নর ময়মনসিংহ-সন্তান জনাব আবদুল মোনেম খাঁর দরবারে সব আবেদন-নিবেদনই ব্যর্থ হয়।

বরিশালের বিখ্যাত জননেত্রী শ্রীমতী মনোরমা বসু (যিনি 'মাসীমা' বলে সর্বজন পরিচিতা) দীর্ঘ কারাবাসের পর ১৯৬৬ সালে মুক্তিলাভ করেন। শ্রীমতী বসু বরিশাল শহরের কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডের "মাতৃমন্দির" থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করে 'দেশরক্ষা আইনে আটক বন্দীদের নিদারুণ আর্থিক অনটন জর্জরিত বিধ্বস্ত পরিবারগুলির' জন্য সাহায্যের এক আকুল আবেদন জানান।

রাজবন্দীদের নিকট-পরিজনরা সরকারী জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাননি।

আগেই জানিয়েছি যে দীর্ঘকাল ধরে আটক পাবনার সাংবাদিক শ্রীপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী মীরা রায় স্থানীয় সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, কিন্তু, কোন কারণ না দেখিয়েই সরকারী চাপে এই

জনপ্রিয় শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়। অপরাধ তাঁর স্বামী আয়ুবী রোষের বলি একজন রাজবন্দী।

বরিশালের রাজনৈতিক কর্মী হিরণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি করে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বিভেদকামী সরকারবিরোধী এই কারণ দেখিয়ে তাঁকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়।

জাতীয় জীবনের সর্বস্তর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির এ ব্যাপক ধরপাকড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

সাপ্তাহিক "জনতা" লিখেছিলেন: 'গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী সম্ভবতঃ এ দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় দাবী।'

৭ই জুনের ঐতিহাসিক হরতালের পর পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের যে নতুন জোয়ার এসেছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং রাজনৈতিক কারণে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানা প্রত্যর্পণ।

পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র-ইউনিয়নের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব বটতলায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল ছাত্র-সভায় ঘোষণা করেন যে, 'অনতিবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্ত না করলে তাঁরা দুর্বার এক আন্দোলন গড়ে তুলবেন।'

পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা হাইকোর্ট বার-সমিতি অবিলম্বে দেশরক্ষা আইন ও প্রতিরক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ বন্ধ করবার দাবী জানান।

গত ১৮ই জুলাই (১৯৬৬) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করেন—পল্টন ময়দানে এক বিরাট জমসভায় উদাত্ত আহ্বানে জানান হয়: 'মজলুম জনতা—বুলন্দ্ আওয়াজ তোল—আটক নেতাদের মুক্তি চাই।'

রাজবন্দীদের নামগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ১৯৫৮ সালে আয়ুবী শাসন বা ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে জরুরী অবস্থা জারী হবার পর থেকে যাঁরা আটক হয়ে বা আত্মগোপন করে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।

এ ব্যাপারটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিরোধী সদস্য জনাব আহমেদুল কবির ১৯৬৬ সালের ২৬শে জুন ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদে সিভিল বাজেট আলোচনার সময় দেশরক্ষা আইনে আটক শত-শত ব্যক্তির বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানিয়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের কার্যকলাপকে যে-কোন সভ্য-দেশের পক্ষে লজ্জাজনক ও কলঙ্কজনক বলে অভিহিত করে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : 'এ সত্যিই গভীর দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশে রাজবন্দীদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।'

এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে "সংবাদ" (২৫শে জুন) মন্তব্য করে লেখেন : 'এই রাজবন্দীদের প্রায় সকলেরই জন্ম হিন্দু পরিবারে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতেছেন কিনা এ সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ যাই বলুন না কেন দেশবাসী ইঁহাদের অপরাধী বলিয়া মনে করেন না।

এই বন্দীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অনির্বাণ দেশহিতৈষণা প্রত্যেকটি দেশবাসীর গর্বের বস্তু।'

পূর্ব-পাকিস্তানের বহু মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁর তাঁবেদার গভর্নর মোনেম খানের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষ করে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের ঐতিহাসিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পরে।

ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলে ১৯৬৬-৬৭ সালে যে মুসলিম

নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, ন্যাশলাল আওয়ামী পার্টির সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি হাজী মহম্মদ দানেশ, বিখ্যাত কিষাণ নেতা আবদুল হাই, সামসুল প্রভৃতি হক। অন্যান্য সুপরিচিত মুসলমান বন্দীদের মধ্যে ছিলেন হাতেম আলী খান (সহ-সভাপতি, কিষাণ সমিতি), সিরাজ হোসেন খান (সম্পাদক, স্মারক ফেডারেশন), তাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ), আবদুল হালিম (যুগ্ম-সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), খন্দকার মুস্তাক আহমদ, আমজাদ হোসেন (আওয়ামী লীগ), নুরুল ইসলাম চৌধুরী প্রভৃতি।

পূর্ব-পাকিস্তানের আরো অনেক প্রগতিশীল মুসলিম নেতা—যেমন আলতাফ আলী, মুজফ্‌ফর আহমদ, ডাঃ আবদুল কাদের, মহিউদ্দিন আহমদ্‌, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সার প্রভৃতি এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন জেলে না থাকলেও পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁদের হয় দীর্ঘকাল বন্দীদশা নয়ত আত্মগোপন অথবা এ দুরকমের দুর্ভোগই সহ্য করে যেতে হচ্ছিল।

পূর্ব-পাকিস্তানের জেলে যে রাজনৈতিক কর্মীরা বন্দী হয়ে ছিলেন বা আছেন তাঁদের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ের অপরাধীদের মত রাখা হয়েছিল। একজন রাজনৈতিক কর্মীর একদিনের বরাদ্দ খরচ ছিল মাত্র দেড় টাকা—এর মধ্যে কয়লা, কাঠ ইত্যাদির খরচও ধরা হয়। আর দেওয়া হোত মাথাপিছু মাসিক পাঁচ টাকা করে হাতখরচ। এই নাম মাত্র হাতখরচ থেকেই সমস্ত নৈমিত্তিক প্রয়োজন তাঁদের মেটাতে হোত। এই পাঁচ টাকা হাতখরচ একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। যে কোন সভ্যদেশে যা দেওয়া হয় রাজনৈতিক বন্দীদের সেই ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতেও আয়ুব সরকার রাজী ছিলেন না।

ঢাকার দৈনিক "ইত্তেফাকের" মোসাফির (সম্পাদক জনাব

তফাজ্জল হোসেনের ছদ্মনাম) কারারুদ্ধ হবার কয়েকদিন আগে ৭ই জুনের সংখ্যায় তীব্র মন্তব্য করে লিখেছিলেন যে 'প্রত্যেকটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় শুধু নেতা ও কর্মীদের ধর-পাকড়ই নয়, বিভিন্ন পন্থায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সরকারের এই আচরণ লক্ষ্য করলে মনে হবে যে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা যেন ডিসপোসালের মাল—পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা যেন ইজারার রাজ্যে বাস করছে। ইজারাদার তাদের নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারেন।'

আমি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের টেনে 'উপদ্রুত পুনর্বাসন আইন' পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুব-শাহীতে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, রাজনৈতিক কর্মীদের বেপরোয়া ধড়-পাকড় ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে গিয়েছিলাম। এখন আবার পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চের মূল দৃশ্যে ফিরে যাব, কিন্তু তার আগে পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল অংশ (যাঁরা ইতিমধ্যেই সংখ্যায় বিপুল এবং যাঁদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে), তাঁদের দেশের সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের সম্মান ও নিরাপত্তা বিধানের এবং তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য যে কতটা উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র তার একটা পরিচয় দেব ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন সাহেবের 'মোসাফির' নামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ'-এ লেখা একটি অনবদ্য রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে: 'সরকারী পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দ্বারা দাঙ্গা প্রশমিত করা যায়, কিন্তু জনগণের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তথা জনগণের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। যাদের পাড়া-প্রতিবেশী হিসাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনেরা বসবাস করে তাদের মনোভাব এবং আত্মীয়-সুলভ আচরণ সংখ্যালঘু-দের মনে যে আস্থার ভাব জাগ্রত করিতে পারে পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনীর দ্বারা তাহা করা সম্ভব নয়। দুর্যোগের কালে পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতার মূল্য আছে। কিন্তু যে বিস্তৃত এলাকা-ব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে তাহাতে পুলিশ

কিংবা কোন কোন সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা তাদের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারে না।

আশা করি ক্ষমতাসীনরা দলীয়স্বার্থে যাহাই করুন না কেন, জাতীয়স্বার্থের পরিপূরক দেশের সমস্যাসমূহের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ কিংবা দেশের রাজনৈতিক এবং সমাজকর্মীদের নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিবার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ভবিষ্যতে আর কখনও গ্রহণ করিবেন না।

আমরা পুনরায় দেশের সংবাদপত্র এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে সক্রিয়ভাবে শান্তির পক্ষে এবং বাস্তুত্যাগ প্রতিরোধ কল্পে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানাইতেছি। আমাদের সকলের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিতে হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে পূর্ণ আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাদের জানমালের দায়িত্ব স্থানীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের ভাবালুতা ছাড়িয়া বাস্তবধর্মী এবং মানবতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইতে হইবে।' (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪)

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের উভয় অংশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এ কথা ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গেই পূর্ব-পাকিস্তানে আবার রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিলো। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে শহীদ সোহরাবর্দীর অসুস্থতা ও বিদেশে তাঁর মৃত্যু এবং ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীর সাম্প্রদায়িক হানাহানি পূর্ব-বঙ্গের রাজনীতিতে যে নিশ্চলতা এনে দিয়েছিল ধীরে-ধীরে সে নিশ্চলতার পর্দা উন্মোচিত হতে সুরু করলো।

মার্চ (১৯৬৪) মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্মেলন হোল। এ দুটির, একটি হোল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (N.D.F.) অপরটি আওয়ামী লীগের।

ইতিমধ্যে ঢাকায় মহাসমারোহে প্রতিবেশী একটি বিশাল দেশের

প্রধানমন্ত্রী সদলবলে সফর করে গেছেন। মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই। ইনি ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৪) ঢাকায় উপনীত হয়েছিলেন। চৌ-এন-লাই-এর এই সরকারী সফর ঢাকায় তথা পূর্ব-পাকিস্তানে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। চৌ তাঁর সফরান্তিক বিবৃতিতে গণচীন ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন ও ঐতিহ্যবাহী ধারার কথা ব্যক্ত করলেন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (National Democratic Front বা N. D. F.) যাতে ছিলেন সাবেক মুশলিম লীগের জনাব নুরুল আমিন। আওয়ামী লীগের জনাব আতাউর রহমান খান, কৃষক প্রজা পার্টির জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবু হোসেন সরকার। পাকিস্তানের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী মহম্মদ ইব্রাহিম এবং লাহোরের নবাবজাদা নসরুল্লা খান তাঁদের অধিবেশনে স্থির করলেন যে গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা জনাব সোহরাবর্দীর নীতি অনুযায়ী স্ব-স্ব রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করে ফ্রণ্টের নেতৃত্বে আন্দোলন করবেন।

কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশ (যে অংশের অধিকাংশই হলেন বয়সে তরুণ) জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সঙ্গে একত্র না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবরের যুক্তি ছিলো যে, জনাব সোহরাবর্দীর অবর্তমানে যুক্তফ্রণ্টের কোন সার্থকতা নেই। তবে সর্বদলীয় একটি সংগ্রাম পরিষদের মারফত একটি গণ-আন্দোলন সুরু করার জন্য পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ প্রস্তুত। শেখ মুজিবরের এই আহ্বানকে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবে রূপ দেন এবং এ প্রস্তাবকে অন্য দলগুলি কেউ অগ্রাহ্য করেননি।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ স্থির করেন যে ১৮ই ও ১৯শে মার্চ (১৯৬৪) সারা পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁরা "দাবী দিবস" পালন করে বৃহত্তর গণআন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজে বিপুল উদ্দীপনা এনে দেয়।

অপরদিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট স্থির করেন যে ১৫ই মার্চ (১৯৬৪) ফ্রণ্ট সারা প্রদেশব্যাপী 'ভোটাধিকার দিবস' পালন করবেন।

কিন্তু এ সময় রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছিল যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব কি করবেন ? এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ও আওয়ামী লীগের এই অধিবেশনের সময় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ঘটনাচক্রে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি দিয়ে ও ভারত-বিরোধী জিগির তুলেও এ দুটি রাজনৈতিক অধিবেশনকে ম্লান করা সম্ভবপর হয়নি। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল 'মর্ণিং নিউজ' ছাড়া ঢাকার আর প্রতিটি সংবাদপত্র প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের চেয়ে ঐ দুটি রাজনৈতিক অধিবেশনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলো।

আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কাউন্সিলপন্থী মুসলিম লীগ ফ্রণ্টের বাইরে থাকলেও তাতে আয়ুবের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। কারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এই দলগুলির মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সর্বশক্তিধর প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য এই যে উদ্যোগ সুরু হয়েছিল, এটা কয়েক বছরের উদ্যমহীনতার অবসানের দিকে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতি যে বিচিত্র তরঙ্গাভিঘাতের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল—হতাশা, নাটকীয় পরিবর্তন, ভগ্নস্বাস্থ্য সোহরাবর্দীর গ্রেফতার ও অবশেষে বিদেশে তাঁর মৃত্যু, অন্যদিকে সোহরাবর্দী ও ভাসানীর মধ্যে মতভেদ—সমস্ত মিলিয়ে যে ইতিহাস তৈরী হয়েছিলো এ সময় এটা যেন একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

যাই হোক পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ১৯শে মার্চ

আওয়ামী লীগের দাবী দিবসের শেষ দিনে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হোল।

এই সভায় একটি দৃপ্তভাষণে শেখ মুজিবর রহমান বললেন: 'বাংলার ভায়েরা আমার! স্পষ্ট করে আপনাদের কাছ থেকে জেনে যেতে চাই—আমরা যদি জেলে চলে যাই, পারবেন কি আপনারা হৃত অধিকার ছিনিয়ে আনবার জন্য গ্রামে-গ্রামে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে? জেলজুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা যেমন আজ বুক পেতে দিয়েছে, পারবেন কি আপনারা তেমনি করে ত্যাগ ও সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে? পারবেন কি আপনারা হাজারে-হাজারে আয়ুব সরকারের কারাগার ভরে তুলতে?'

লক্ষ কণ্ঠে জবাব উঠলো: পারব—পারব।

মওলানা ভাসানী আয়ুব-শাহীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন: 'বাঙালী সম্রাট অশোককে মানে নাই, মোগল-পাঠানের অনুগত হয় নাই। ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করে নাই। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় জনতার রুদ্ররোষে সে মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত। এবারও সরকার অবিলম্বে যদি ভোটাধিকারের দাবী মেনে না নেন, তবে দেশে আর এক রাষ্ট্রভাষার ঘটনা ঘটবে।'

দেশে আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি জমে উঠতে লাগলো।

এমন সময় ২৪শে মে (১৯৬৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম নায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নয়া দিল্লীতে অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন। এ দুঃসংবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। স্বতস্ফূর্ত সে শোক। পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যুতে 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় যে অশ্রুনিষিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছিল তা এ শোকাবহ ঘটনায় পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের অনুভূতিরই অভিব্যক্তি যা পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীকে ভারতীয় সকল মানুষের সঙ্গে বেদনায় একাত্ম করেছিলো।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় ভারত বা পাকিস্তান কোথাও এরকম আর একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ! "ইত্তেফাক" পণ্ডিত নেহেরুর প্রতি পূর্ব-বাংলার মানুষের সমস্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য উজাড় করে লিখেছিলেন: 'ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যকাশে নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা নামটি মুছিয়া গেল। দেরাদুনে চারদিন মাত্র অবকাশ যাপনের পর দিল্লীতে প্রত্যাগমনের একদিন বাদেই তিনি চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠের আলো ঝলসানো দিনে মধ্যাহ্নের স্তব্ধপ্রহরে ভারতের সন্তান, এশিয়ার সন্তান, বিশ্বমাতার সন্তান জহরলাল নেহেরু লোকান্তরে অন্তর্হিত হইলেন। কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর বিগলিত শোকাশ্রু তাঁহার মহাপ্রস্থানের পথ সিক্ত করিবে।

আসমুদ্র হিমাচল আজ শোকসাগরে ভাসমান, নেহেরু নাই। একদিন আগে তিনি ছিলেন, একদিন পরে তিনি নাই মর্মান্তিক সত্যের নিষ্ঠুর বাস্তবের শরাঘাতে কোটি অন্তর আজ রুধিরাপ্লুত।

জহরলাল নেহেরুর তুলনারহিত বিচিত্র জীবনের দিকদিগন্ত-প্লাবী বর্ণচ্ছটা আজ শুধু একান্তে বসিয়া ভাবিবার জিনিস। সারি-সারি শব্দ সাজাইয়া কথার পিঠে কথা সাজাইয়া তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। হ্যারোয় শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ নেহেরু যেদিন পরাধীন ভারত-উপমহাদেশে পদার্পণ করেন, সেদিন স্বরাজ্যের সাধনা কেবলমাত্র অর্ধস্ফুট। সেদিন জাতীয় আন্দোলনে নরম-পন্থীর প্রত্যয়হীন কণ্ঠ বড় বেশী কম্পমান, সেদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ রাজমুকুটের 'অনুগত বিরোধী-দল' মাত্র। জাতীয় আন্দোলনের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে নেহরু আসিলেন তারুণ্যের তেজ লইয়া, যৌবনের অপরাজেয় শক্তি লইয়া। বিংশ শতাব্দীর গণজাগরণের আত্মবিশ্বাসের বাণী লইয়া। সেই হইতে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দেড়-যুগ পর্যন্ত তাঁহার জীবন-জ্যোতি ছিল চিরপ্রভ সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। অন্ধকারের অপুষ্ট ছায়া যে কখনো তাঁহার

জীবনাকাশে নামিবার উপক্রম করে নাই, মেঘের পাতলা আস্তরণে কখনো যে তাঁহার জীবনজ্যোতি স্তিমিত হয় নাই, তাহা নয়, কিন্তু ক্ষণিকের বিভ্রমের মতো তাহা অচিরেই কাটিয়া গিয়াছে, আবার তিনি দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছেন সগৌরবে। পৃথিবীর সর্বদীপ্ত ক্ষণজন্মা পুরুষদের মধ্যে নেহরুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

বিদেশের অভিজাত শিক্ষায় শিক্ষিত, আজন্ম প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত নেহরু তৎকালীন নরমপন্থীর রাজনীতিতে উপমহাদেশের মুক্তির সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া নামিয়া আসিয়াছিলেন সেই কোটিতট-আচ্ছাদনকারী গণমানুষের সমাজে, যেখানে দারিদ্র্য নিঃসীম, যেখানে দুঃখ অথৈ বারিধির মত সীমাহীন, যেখানে ব্যাধির একচ্ছত্র রাজত্ব। অক্লেশে বিদেশী ধড়াচূড়া পরিত্যাগ করিয়া তুলিয়া নিলেন সাধারণের বেশ তাঁহার অনভ্যস্ত দেহে। আর ঘুরিয়া বেড়াইলেন কৃষকের মধ্যে, শ্রমিকের মধ্যে, তিনি জানিলেন শহর নয়, শহরের সুসজ্জিত বৈঠকখানা নয়, গ্রাম—অসংখ্য অগণিত গ্রাম, গ্রামের অর্ধভুক্ত, প্রায়-নগ্ন চাষী-মজুর, নির্জ্ঞান নিরক্ষর জনগণই আসল ভারত। জনগণের মুক্তিতেই পরাধীন ভারতের মুক্তি, জনগণই স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনগণের শক্তিতে সেই যে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কখনো কোন কারণেই, কোন অবস্থায়ই তাহা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। জনতার শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন বলিয়াই বিদেশী শাসকের নির্যাতনের ভয়ে কদাপি তিনি ভীত হন নাই। পুলিশের লাঠির আঘাত মাথায় তুলিয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, আটবার কারাবরণের ক্লেশ তাঁহাকে হতোদ্যম করিতে পারে নাই। জনতার ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্যকে এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা তিনি সর্বদা সমুন্নত রাখিবার বিরামহীন প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই যে এক মহৎ প্রাণ, এক অসাধারণ মহৎ প্রাণ, এ প্রাণ কখনো ক্ষুদ্র সংস্কারের বন্দীশালায় নিজেকে সমর্পণ করেন নাই।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ আর গোত্রের ঊর্ধ্বে মানুষের মনুষ্যত্বে প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলিয়াই বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, আজীবন তিনি আপোষহীন লড়াই করিয়া গিয়াছেন, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নেহরুর মধ্যেই লাভ করিয়াছিল নিরাপত্তার সব চাইতে বড় ভরসা, তাঁর মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিল মর্যাদার আশ্বাস। রাজনৈতিক পর্যায়ে নেহেরুর সহিত যাঁহাদের বনিবনা ছিল না, এমন কি যাঁহারা প্রতিপক্ষ তাঁহারাও নেহেরুর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

বর্তমান কালের—এবং বর্তমানকালের সবকালের ইতিহাসে জওহরলাল নেহেরুর নাম বহুবিধ কারণে অক্ষয় মর্যাদার অধিকারী। বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি শুধু নূতন ভাব ও ধারণা কল্পনারই আমদানী করেন নাই, বাস্তব অবদানও রাখিয়া গিয়াছেন। শিবির বিভক্ত বর্তমান বিশ্বে নিরপেক্ষ-বাদিতার আদর্শ তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় কণ্টকিত বর্তমান উত্তপ্ত যুগে তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে শান্তির বাণী। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ বারে-বারেই বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এশিয়া, আফ্রিকার ঐক্যবোধের চেতনা তাঁহার কণ্ঠেই বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি জাতিসঙ্ঘে আজ যে একটি তৃতীয় শক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অনুভূত হইতেছে, তাহাতে এককভাবে তাঁহার দানই বোধকরি সর্বাধিক। প্রাচীন ভারতের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা আর আধুনিক দুনিয়ার ভাবস্রোতে অবগাহন করিয়া নেহেরু সারা বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করিয়াছিলেন। মহামানবের জন্ম দেশ কালের ঊর্ধ্বে,—তিনি বিশেষ দেশের হইয়াও বিশ্বের, বিশেষ কালের হইয়াও সর্বকালের। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্, মনীষী ও মানব-দরদী নেহেরুর মৃত্যু তাই বিশ্বের এক অপূরণীয় ক্ষতি।'

আয়ুবের বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক নির্বাচন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, সারা পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেল, যদিও পাকিস্তানের—বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন মানুষ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে এ নির্বাচন হবে একটি প্রহসন মাত্র।

পাক-সংবিধানের গায়ে মৌলিক গণতন্ত্রের তকমা এঁটে দারুণ সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজির ছক কষেও শেষ পর্যন্ত যে স্বৈরাচারী আয়ুবকে এমন চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট আয়ুব যে পাক-গঠনতন্ত্র রচনা করেছিলেন তাতে ছিল পাক-প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা একচ্ছত্র ও সর্বময়। পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের প্রতি-পর্বে, প্রতি-পরিচ্ছেদে তিনি বিরাজমান। এরকম সুরক্ষিতপদে অধিষ্ঠিত থেকেও তাঁর কর্তৃত্ব যে বিরোধীরা চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হবে, এরকম সম্ভাবনা ছিল ডিকটেটর আয়ুবের ধারণার অতীত।

'PODO' এবং 'EBDO' আইনের বলে পাকিস্তানের বিরোধী-নেতারা নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পাকিস্তানে আয়ুবের বিরুদ্ধে কোন যোগ্য-প্রার্থী দাঁড় করানো সম্ভব হবে এবং পাঁচ বছর নিষিদ্ধ হয়ে নিষ্ক্রিয় ও সংযোগছিন্ন অবস্থায় থেকে বিরোধী-দলগুলি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করে ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচনে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহসী হবে, এ ধরনের সম্ভাবনাও ছিল পাক-ডিকটেটর্-এর গণনার বাইরে। উপরন্তু ১৯৫৪ সালের পরে যুক্তফ্রণ্টের শোচনীয় অন্তরদ্বন্দ্বের ইতিহাসের পরে বিরোধী-দলগুলি যে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং সব চেয়ে বড় কথা যে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পারিক ভেদ-বিদ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের এই দুই অংশের বিরোধী শক্তি-গুলি এক হয়ে একজন মাত্র প্রার্থী আয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে—বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে এতখানি দূরদৃষ্টি ও সম্মিলিত উদ্যম প্রেসিডেন্ট আয়ুব আশা করেননি।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুবের আশা চূর্ণ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউনসিলরস্ মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলাম সংযুক্তভাবে পাকিস্তান-স্রষ্টা কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহর সহোদরা কুমারী ফতেমা জিন্নাহ-কে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনীত করে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টও কুমারী ফতেমা জিন্নাহ্-কে সমর্থন জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলির এই ঐক্যবদ্ধ মোর্চাতে প্রথম-প্রথম প্রেসিডেন্ট আয়ুব বিশেষ বিচলিত বোধ করেননি। রাজনীতিতে যাঁর একমাত্র পরিচয় কায়েদে আজম জিন্নাহ-র ভগিনীরূপে সেরকম একজন রাজনীতি অনভিজ্ঞা বৃদ্ধা মহিলাকে পাকিস্তানের মত গোঁড়া মুসলিম দেশে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়ে বিরোধীরা কোন ফায়দাই ওঠাতে পারবে না—এই ভরসায় প্রেসিডেন্ট আয়ুব হালকা উক্তি করে বলেন : 'নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার পক্ষে মিস্ জিন্নাহ্ হবেন খুবই সহজ প্রার্থী।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে উলেমা ও মোল্লাদের লাগিয়ে দেন মসজিদে-মসজিদে মহল্লায়-মহল্লায় প্রচার করবার জন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে নারীকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নির্বাচিত করা শরিয়ত বিরোধী।

প্রথম পর্যায়ে মিস্ ফতেমা জিন্নাহ্‌কে কিন্তু মার্শাল আয়ুব খান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিশেষ পাত্তাই দেননি। তাই সংযুক্ত বিরোধী-দলের নয় দফা নির্বাচনী ইস্তাহারের জবাবে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন ইস্তাহার বা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেননি। পেশোয়ারে লাল কোর্তার দেশে মিস্ জিন্নাহ্‌র বিপুল সম্বর্ধনা দেখে আয়ুব খান ক্ষুব্ধ হন বটে কিন্তু নিজের সুরক্ষিত ব্যূহ বলে বিবেচিত পঞ্জাবে মিস্ জিন্নাহ্‌র সমর্থনে বিস্ময়কর জন-জাগরণ দেখে প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। নির্বাচনে পশ্চিম-পাকিস্তানে তিনি বিপুল সমর্থন লাভ করবেন—এই ছিল আয়ুবের বিশ্বাস। তাই তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের ভোট যাতে

পূর্ব-পাকিস্তানের ভোটকে প্রভাবান্বিত করতে পারে সেজন্য পশ্চিম-পাকিস্তানে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। পশ্চিম-পাকিস্তানে মিস্ জিন্নাহ্‌র পক্ষে বিপুল জন-সমর্থন দেখে তাড়াতাড়ি আয়ুব তাঁর নির্বাচনী অভিযানের স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করেন। তিনি প্রথমে পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং পরে পূর্ব-পাকিস্তানে এক ব্যাপক নির্বাচনী সফরে বের হন এবং একটি ইলেকশন ম্যানিফেস্টোও প্রকাশ করেন।

একটু আগে সম্মিলিত পঞ্চবিরোধী দলের নয়-দফা নির্বাচনী ইস্তাহারের কথা উল্লেখ করেছি। এতে বিরোধী দলের মূল বক্তব্য ছিল দুটি—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি-তে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সভা-সমিতি, সংগঠন, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দল ও নেতাদের অধিকার অপহরণের সমস্ত আইন বাতিল করে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সমপর্যায়ে উন্নয়ন, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি প্রবর্তন।

নির্বাচনী অভিযানের মধ্যম পর্যায়ে প্রকাশিত আয়ুব ইস্তাহারটি একটি বিচিত্র রাজনৈতিক দলিল বলা যেতে পারে। কনভেনশন লীগের প্রার্থী হলেও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ইস্তাহারটি প্রচার করেছিলেন নিজের নামে। 'আমি মনে করি', 'আমি করবো', 'আমি আহ্বান জানাই'—তিনি কি-কি মনে করেন, কি কাজ করবেন এবং রাষ্ট্রের কি করা উচিত—এমনি ভাবে তিনটি পরিচ্ছেদে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভাগ করেছিলেন ইস্তাহারটি। পাকিস্তানের সংবিধানে আয়ুব যেমন সর্বত্র বিরাজমান, তেমনি তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল আয়ুবের 'আমি', 'আমি'। তবুও তিনি বড়াই করতেন: 'আমি একজন মৌল গণতন্ত্রী, ডিকটেটর নই।' নির্বাচনী ইস্তাহারটি সর্বত্র 'ইসলামী জাতীয়তা', 'ইসলামী রাষ্ট্র' ও 'ইসলামী সৌভ্রাত্রের'

আহ্বান। অর্থাৎ সেই পুরানো বস্তাপচা ধর্মের জিগীর। ইস্তাহারটি প্রথমেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি করে দেবার জন্য খোদাতাল্লাহ্‌র দরবারে তিনি শোকরিয়া জানিয়েছেন, যে রাষ্ট্রের জনগণ প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ্ ও প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্য নির্বাচন করতে পারে না, যেখানে আইন সভার মন্ত্রী অপসারণের বা বাজেট পাস করার অধিকার নেই, যে দেশে প্রেসিডেন্ট যে-কোন আইন যখন ইচ্ছা খারিজ করে দিতে পারেন অর্থাৎ যে দেশে শাসনতন্ত্র একজন মাত্র ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ, সে দেশেও নাকি 'জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠাই আয়ুবের আদর্শ'। পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর যে অবিচার করা হচ্ছিল তা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়ে আয়ুব তাঁর ইস্তহারে বলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সমতুল্য পর্যায়ে উন্নীত করাও তাঁর লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নিবাচিত হলে তিনি কি-কি করবেন তার একটি ২৩ দফা ফিরিস্তিও আয়ুব খান তাঁর ইলেকশন ম্যানিফেস্‌টো-তে দিয়েছিলেন। নানা ফাঁকা প্রতিশ্রুতির এই ফিরিস্তিতে ছিল—(১) কর-বোঝার সমবণ্টন, (২) শিল্প বাণিজ্যে কার্টেল ও মনোপলি দূর করা, (৩) হিন্দুস্থান থেকে আসা মুসলিম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, (৪) পূর্ব-পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৫) জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, (৬) দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, (৭) শিক্ষা বিস্তার, (৮) কাশ্মীরের মুক্তি (৯) সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রাম ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কাজের প্রতিশ্রুতি। ২৩ দফার একটিতে তিনি একথাও বলেন যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার তিনি রক্ষা করবেন। পূর্ব-পাকিস্তানে অন্ততঃ দশ হাজার মৌল গণতন্ত্রীর নির্বাচন সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধদের মার্জিনাল বা প্রান্তিক ভোটের ওপর নির্ভরশীল—তাই তাঁর ইসলামী ইস্তাহারে প্রেসিডেন্ট আয়ুব দায়ে পড়ে দু-এক লাইন আশার বাণীও সংখ্যালঘুদের শুনিয়েছিলেন। আয়ুবের ইস্তাহারের সমালোচনা

করে বিরোধী পক্ষ বলেন : 'জনাব ফিল্ড মার্শাল সাহেব, এখন এত ভাল কাজ করবেন বলছেন—তাহলে গত ছয় বছরে আপনার এই সাধু সঙ্কল্প কোথায় ছিল ?' সম্মিলিত বিরোধী দল আয়ুবের নির্বাচনী ইস্তাহারের আখ্যা দেন 'প্লাস্টিকের গোলাপ'। 'এই গোলাপী ইস্তাহারে জৌলুস আছে, প্রাণও নেই, গন্ধও নেই।'

আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে জনমনে কি বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা বিরোধী দল তো বটেই প্রেসিডেণ্ট আয়ুব স্বয়ং অনুভব করতে পেরেছিলেন পশ্চিম-পাকিস্তানে মিস ফতেমা জিন্নাহ্‌র বিস্ময়কর সম্বর্ধনা দেখে। পশ্চিম-পাকিস্তানের জন সমর্থনের ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করে মোহতারেমা জিন্নাহ বলেই ফেলেন যে জনমত তাঁর পক্ষে অর্থাৎ বিরোধী দলের পক্ষে রায় দিয়েছে। জনমতের এই ধারা লক্ষ্য করে আয়ুব বিশেষ বিব্রত হয়ে ওঠেন এবং পাকিস্তানের সমস্ত রেডিও, পাবলিসিটি, সরকার-নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্ট বোর্ডের সংবাদপত্র, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের গভর্নররা, মন্ত্রীরা, ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীরা—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আয়ুবের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে। ১৯৫৯ সালের তথাকথিত নির্বাচনের পর প্রেসিডেণ্ট ৮০০০০ মৌল গণতন্ত্রীদের সেণ্ট্রাল অডিটের পরীক্ষা ছাড়াই ১০০ কোটি টাকা 'ওয়ার্কস প্রোগ্রামে'র নামে অবাধে খরচ করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সালের নবনির্বাচিতদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য আরও ২০ কোটি টাকার 'ওয়ার্কস প্রোগ্রামে'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের ভেকধারী ডিকটেটর আয়ুব নিজের সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যে ৮০,০০০ মৌল গণতন্ত্রীদের এই ১২০ কোটি টাকার পরোক্ষ উৎকোচ দেওয়া হয়েছিল এ কথা বিরোধী পক্ষের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বড় আশা করেছিলেন যে ১২০ কোটি টাকার প্রলোভনে লুব্ধ ৮০০০০ মৌল গণতন্ত্রী তাঁর প্রধান নির্বাচনী প্রচারক ও সংগঠক হবে, কিন্তু বিপুল জনজাগরণ দেখে ভোট হারাবার আশঙ্কায় মৌল গণতন্ত্রীরা অধিকাংশই প্রকাশ্যে আয়ুবের সমর্থনে

এগিয়ে আসতে সাহস পাননি। এই নির্বাচনে এটাই হয়েছিল প্রেসিডেন্ট আয়ুবের আতঙ্ক ও আশঙ্কার মূল কারণ। প্রেসিডেন্টের প্রচার-যন্ত্র মিস্ জিন্নাহকে জনসমক্ষে হেয় করে তাঁর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার উদ্দেশ্যে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিলো। বৃদ্ধা কুমারী বিকৃতরুচি পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাঁর বড় ভাই কায়েদে-আজম ফতেমা জিন্নাহ্-কে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতেন, তিনি নির্বাচিত হলে দেশটা রসাতলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিস্ জিন্নাহ্র সমর্থনে পূর্ব-পাকিস্তান যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। পূর্ব-বঙ্গে তাঁর সফরকে বর্ণনা দিতে গিয়ে সংবাদপত্রের সমস্ত বিশেষণই যেন নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। "গণ বিস্ফোরণ" "দশ দিনের ভূকম্পন" (মোহতারেমা জিন্নাহ্ দশ দিন পূর্ব-পাকিস্তানে ছিলেন), 'গণসমুদ্র,' "বাঁধভাঙ্গা গণজোয়ার", "অভূতপূর্ব", "অকল্পনীয়"—এমনি নানা বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছিল মিস জিন্নাহ্র সম্বর্ধনা সভাগুলির বর্ণনায়। দর্শন-অভিলাষী জনতার চাপে ঢাকা থেকে চাঁটগা যেতে ফতেমা জিন্নাহ্র ট্রেন প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা লেট হয়েছিল এবং পথে তিনশো জায়গায় ট্রেন থামাতে হয়েছিল। ঢাকার জনসভা এমন সুবিশাল রূপ ধারণ করেছিল যে মাইকের সঙ্গে চল্লিশটি স্পীকার যুক্ত করেও অর্ধেক জনতার কাছেও মিস্ জিন্নাহ্র কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া যায়নি। গভর্নর মোনেম খান সাহেবের এলাকা ময়মনসিংহ শহরে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের জনতা বিরোধী-প্রার্থীকে সমর্থন জানায়। দশদিনে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় এক কোটি জনতা মোহতারেমা জিন্নাহ্কে দেখতে আসে, শুনতে আসে ও তাঁকে অভিনন্দন জানায়। মিস্ জিন্নাহ্র একটি নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকবার সুযোগ আমার হয়েছিল—চট্টগ্রামে ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৬৪)। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে মাদারে মিল্লাত ফতেমা জিন্নাহ্র (জাতির জননী) প্রথম পরিচিতি সভা। উৎসাহী জনতার অরণ্যে আমিও মিশে গিয়েছিলাম—মুহুর্মুহু অযুতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল: "মাদারে মিল্লাত

জিন্দাবাদ", "সম্মিলিত বিরোধী দল জিন্দাবাদ", "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। সেই একই দিনে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর নির্বাচনী-সফরে চট্টগ্রামে এসেছিলেন কিন্তু স্থানীয় স্টেডিয়ামে বক্তৃতা করতে এসে জনতার সমবেত কণ্ঠে "মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে তাঁকে বহুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং তাঁর ভাষণের বিভিন্ন পর্যায়ে "শেম" "শেম" "জবাব চাই" "মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে তাঁর বক্তব্যে ক্রমাগত ছেদ পড়তে থাকে। অপর দিকে আয়ুব সমর্থকদের সুপরিকল্পিত উপায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও মাদারে মিল্লাত সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর সমবেত কণ্ঠের "জিন্দাবাদ" ও "হর্ষ" ধ্বনির মধ্যে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন এবং কুমিল্লার জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি পবিত্র কোরাণ শরীফ উপহার গ্রহণ করে আবার তুমুল জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে বিজয়িনীর মত পরিচিতি-সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। মোহতারেমা জিন্নাহ্ তার বক্তৃতায় বিরোধী পক্ষকে ভোট দেবার জন্য জনমণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন : মনে রাখবেন এই ভোট—

- পূর্ণ গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী সরকার গঠনের জন্য ভোট,
- সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার এবং মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য ভোট,
- রাজবন্দীদের মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহারের জন্য ভোট,
- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার জন্য ভোট,
- খাজনা ও ট্যাক্স কমানোর জন্য এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিলের জন্য ভোট,
- নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য ভোট,
- কৃষকদের অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের জন্য ভোট,
- বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভোট,
- ছিন্নমূল মোহাজেরদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভোট।

যে সাংবাদিকরা সে সময় নানা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত আয়ুব খান জয়ী হবেন তাঁরাও স্বীকার করেছিলেন যে খোদ পশ্চিম-পাকিস্তানেও আয়ুব সম্বর্ধনায় গণজমায়েত হয়েছিল মিস্ জিন্নাহ্র নির্বাচনী সভার এক ষষ্ঠাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ। আয়ুবের পূর্ব-পাকিস্তান সফরের প্রারম্ভে ঢাকার বিমান বন্দর থেকে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে শহরে নিয়ে আসার বিজ্ঞপ্তি ছিল, কিন্তু পর্যাপ্ত জন জমায়েতের অভাবে শোভা-যাত্রার প্রস্তাব শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়। আয়ুবের সভায় লোক আনার জন্য সমস্ত এলাকায় সরকারী আমলাতন্ত্র উদ্যোগী হয়েছিল এবং ট্রেন, স্টীমার, বাস, লঞ্চ ও খেয়ার চলাচলে ভাড়া-মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতি এলাকায় সমস্ত বাস ও ট্রাক জেলা শাসকরা তলব করে আয়ুবের সভায় গণজমায়েতের জন্য লোক নিয়ে আসেন। ২৮শে অক্টোবর (১৯৬৪) প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান তাঁর নির্বাচনী সফর উপলক্ষে ঢাকায় আসেন। সেদিনই বিকেল সাড়ে-তিনটায় ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে তিনি যে সভা করেন তাতে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। এই সভায় আয়ুব খান বক্তৃতা সুরু করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল—জনতার মধ্য থেকে জুতো, চটি, ছাতা, ইট—যে-যা হাতের সামনে পাচ্ছিলেন মঞ্চের ওপর আয়ুবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলেন। প্রচণ্ড আয়ুব-বিরোধী ধ্বনিতে সভাস্থল কল্লোলিত হয়ে উঠলো। প্রবল বিভ্রান্তির মধ্যে সভা ভেঙ্গে গেল। প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান তাঁর বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁর ক্রীড়নক রাজ্যপাল মোনেম খান সাহেব-কে নিয়ে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি দেখেছিলাম যে শত-শত সরল গ্রাম্য মানুষ হাতে চাটাই ও লণ্ঠন নিয়ে অসহায় অবস্থায় ঢাকার রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা আশে পাশের খোলা মাঠে-ময়দানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে অভুক্ত ও ক্লান্ত

দেহে আশ্রয় নিয়েছে। এঁরা অনেকে আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সহ 'বিনা পয়সায় ঢাকা শহর ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে দূর-দূরান্তর থেকে—এমন কি যশোর, খুলনা থেকে ওঁদের মিটিং-এ এনে এখন তাঁদের ফেলে সরকারী কর্তারা গায়েব হয়ে গিয়েছেন। ওঁরা এখন কি খাবেন, কোথায় থাকবেন, কি করে বাড়ি ফিরে যাবেন ইত্যাদি দুর্ভাবনায় আকুল হয়ে উঠেছেন। আমার বেশ মনে আছে, এরকম একটি সরল কৃষক (ময়মনসিংহ জেলা থেকে আসা) ও তার বারো বছরের ছেলের আকুল কান্নায় বিচলিত হয়ে আমি তাঁকে অর্থ-সাহায্য করেছিলাম। তিনি অবশ্য জানতেন না বা কখনও জানতেও পারবেন না যে আমি ছিলাম আয়ুবের দুষমন হিন্দুস্থানের একজন হিন্দু নাগরিক।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের সংহতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চান। বিরোধী-পক্ষকে আক্রমণ করে তিনি বারম্বার বলেন যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্ট যেমন নিজেরা কলহ করে বহু বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সেভাবে ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচনে সংযুক্ত বিরোধীরা এবং তাদের প্রার্থী মোহতারেমা ফতেমা জিন্নাহ্ জয়ী হয়ে তারই পুনরাবৃত্তি হবে এবং পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৪ পশ্চিম-পঞ্জাবের লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনী সভায় পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলেন যে, 'চিরকাল পাঠান, হিন্দু, মোগল ও ব্রিটিশের শাসনে থেকে পূর্ব-পাকিস্তানীরা এই সর্বপ্রথম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে'—সুতরাং বিরোধী-দল ক্ষমতায় এলে আবার পূর্ব-পাকিস্তান তার স্বাধীনতা হারাবে এবং এবার দুশমন হিন্দুস্থানের কাছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের এই উক্তিতে ঢাকার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড বিরক্তি, বিস্ময় ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর দুদিন পরে অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর ঢাকায়

আয়ুব খানের জনসভায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আমি দেখেছিলাম তা এই অসন্তোষেরই অভিব্যক্তি। ঢাকার বিদগ্ধ মহল প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'ফিল্ড মার্শাল সাহেব! যদি না জানেন তবে জেনে রাখুন যে ঈশা খাঁ, কেদার রায়, সিরাজদ্দৌলা, সূর্য সেনের পূর্ব-বাংলা চিরকালই স্বাধীনচেতা মানুষের জন্ম দিয়েছে। ইবনে বতুতার বর্ণনা পড়ুন—শক, হুন, পাঠান, মোগল কি করে এক দেহে লীন হয়েছে এই পূর্ব-বাংলার মাটিতে।' ঢাকার দৈনিক সংবাদ 'ইতিহাসের এই বিকৃতি'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখলেন :

'কনভেনশন লীগের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে অজস্র ধন্যবাদ। বোধ হয় এক অসতর্ক মুহূর্তেই পাঁচ কোটি পূর্ব-বঙ্গবাসী সম্বন্ধে তাঁহার আসল মনোভাব গত ২৬শে অক্টোবর লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব বলেনঃ 'যুক্তফ্রণ্টে পাকিস্তান-বিরোধী এবং এক ইউনিট-বিরোধী ব্যক্তি ব্যতীতও, পশ্চিম-বঙ্গের সহিত পূর্ব-পাকিস্তানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী কিছু লোক রহিয়াছে। আফসোসের বিষয়, এই সব ব্যক্তিরা বুঝিতে পারে না যে, চিরকাল পাঠান, মোগল, হিন্দু এবং বৃটিশের অধীনে থাকার পর এই সর্বপ্রথম পূর্ব-পাকিস্তানীরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানীরা যে সব সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছে, এই সব ব্যক্তিরা সেগুলিকে নস্যাৎ করিয়া দিতে চায়।'

'সারা পূর্ব-বাংলায় রাষ্ট্র-বিরোধীরা একেবারে দিবারাত্র তৎপর রহিয়াছে এবং আমাদের মুরুব্বী অভিভাবকেরা এক মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হইলেই ইহারা এ-দেশের পাঁচ কোটি নাবালক নাগরিককে ফুসলাইয়া বিভ্রান্ত করিয়া পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিম-বাংলার সহিত বেমালুম জোড়া দিয়া দেবে—পূর্ব-বঙ্গবাসীর দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার উপর এই কটাক্ষ নূতন ব্যাপার নহে। গত সতের বছর ধরিয়াই পূর্ব-

বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই জঘন্য প্রচারণা চালান হইতেছে। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান সাহেবও অতীতে কয়েকবার এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন এবং বর্তমানে নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে অহরহঃ এই প্রচারণায় লিপ্ত রহিয়াছেন। ফিল্ড মার্শালের এই সব মন্তব্যের কোন জবাব এযাবত আমরা দেই নাই। এই নিবন্ধেও দিব না। 'সার্বভৌমিকত্ব' লাভ লাভ করিবার পর বিশেষ করিয়া তাঁহার আমলে পূর্ব-বঙ্গবাসীদের জন্য দুগ্ধ ছানা ও ক্ষীরের যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করিব না। সত্য বলিতে কি, এসব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না। মনে কেবল এই ফরিয়াদ, এই প্রশ্নই জাগে, 'কোন্ পাপে বারবার আমাদের এই সব অপমান সহ্য করিতে হইতেছে?'

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। পূর্ব-বাংলার বর্তমান অধিবাসীদের রাষ্ট্র-বিরোধীদের কবলে পড়িবার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। এ-দেশের শুভাশুভ বিচার শক্তিহীন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাঁচ কোটি মানুষকে তাঁহার বিরুদ্ধে ভোটদানের ঘোরতর বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিতে গিয়া ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন: পূর্ব-বঙ্গবাসী চিরকাল মোগল, পাঠান, ইংরাজ, হিন্দুর গোলামী করিয়াছে।' অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া পূর্ব-বঙ্গে ননী ও ক্ষীরের নহর বহাইয়া দিবার জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্মীগণ জীবন-যৌবন পণ করিয়াছেন। এই প্রচারের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া জনাব আয়ুব খানের উপরোক্ত মন্তব্য পূর্ব-বঙ্গবাসীর প্রতি আসলে কি পর্বতপ্রমাণ অবজ্ঞার ভাব বিরাজ করিতেছে, সেই সত্যটিকেই জ্বল-জ্বল করিয়া দুনিয়ার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে।

মধ্যযুগে বাদশাহদের ঘুম ভাঙ্গিত খোজা কৃতদাসদের বন্দেগী গানে।

এ সব গানের ধুয়া ছিল : জাহাঁপনা! চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা অপেক্ষা আপনি মহীয়ান! আপনি সকল গুণের সকল জ্ঞানের আকর! আপনার ইঙ্গিতে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়, বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে। আপনার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে, দুনিয়ার সকল কাজ বিকল হইয়া যাইবে।' ফিল্ড মার্শাল আয়ুব সাহেবের চারি পার্শ্বের স্তাবকগণ দিবা-রাত্র চীৎকার করিতেছেন : 'প্রেসিডেণ্ট আয়ুব মহামানব', 'প্রেসিডেণ্ট আয়ুব লৌহ-মানব', 'প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ্', প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী', 'প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বড় ন্যায় পুরুষ, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকিলে এই দেশ ও দেশের দশ কোটি মানুষ একেবারে সোজা এবং পলকে জাহান্নামে যাইবে', 'প্রেসিডেণ্ট আয়ুব কেবল এ-দেশের নয়, এশিয়া-আফ্রিকারও ত্রাণকর্তা।' এইসব রুচি-বিরুদ্ধ প্রচার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই সব প্রচার মানুষকে যে কতটা বিভ্রান্ত হইতে পারে, তাহাই শুধু আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এই বিভ্রান্তির ফলেই ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ইতিহাসবিদ্ সাজিয়াছেন এবং গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন, পূর্ব-বঙ্গবাসী চিরকাল মোগল, পাঠান, ইংরাজ, হিন্দুর অধীনে ছিল।' আমরা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, 'এই তত্ত্বটি আপনি কোথা হইতে বাহির করিলেন? এ-দেশের বর্তমান না হয় আপনার সরকারের ছত্রছায়ায় বিরাজ করিতেছে। এ-দেশের ভবিষ্যৎ আপনার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবে বলিয়া আশা করিবার অধিকারও না হয় আপনার রহিয়াছে। কিন্তু এ-দেশের অতীত ইতিহাসকে বিকৃত করিবার, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতির অবমাননা করিবার পূর্বে তাঁহার একটু দ্বিধাসঙ্কোচ হওয়া উচিত ছিল না কি?' (২৮ অক্টোবর, ১৯৬৪)

পূর্ব-পাকিস্তানে যখন তাঁর উক্তি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ঘোষণা করলেন যে তিনি এসব কথা বলেননি—ঢাকার সংবাদপত্রগুলি তাঁর উক্তিকে বিকৃত করে প্রচার করেছে।

কিন্তু পূর্ব-বাংলার সাংবাদিকরা আয়ুবের প্রাক্তন সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আহমদ্ "মাই চীফ্" শীর্ষক গ্রন্থে (যার মুখবন্ধ স্বয়ং আয়ুব খান লিখেছিলেন) বাঙালীদের সম্পর্কে আয়ুব সাহেব তাঁর লায়ালপুর ভাষণের বহু পূর্বেই যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা—উদ্‌ধৃত করে দেখিয়ে দেন যে পূর্ব-বঙ্গবাসীদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কত ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন। ব্রিগেডিয়ার আহমদ্ এই পুস্তকে জানান যে তাঁর প্রভু জেনারেল আয়ুব একদিন তাঁকে নাকি বাঙালীদের সম্পর্কে বলেছিলেন ; 'It would be no exaggeration to say that up to the creation of Pakistan they (East Bengalees) had not known any real freedom or sovereignity. They have been in turn ruled either by the Caste Hindus, Moghals, Pathans or the British. In addition they have been and still are under considerable cultural or linguistic influence. As such they have all inhibitions of down trodden races and have not yet found it possible psychologically to adjust to the requirements of their new born freedom. Their peculiar complexes, exclusiveness, suspicion and sort of defensive agressiveness probably emerge from this historical background.'

'অর্থাৎ এ বলা হয়ত অতিরঞ্জন হবে না যে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পর্যন্ত পূর্ব-বঙ্গবাসীরা প্রকৃত স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব কি তা জানতো না। পালাক্রমে তারা বর্ণ-হিন্দু, পাঠান, মোগল এবং ব্রিটিশ দ্বারা শাসিত হয়েছে। এ ছাড়া ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে তারা ছিল অন্য প্রভাবিত এবং এখনও তাই আছে। এই অবস্থায় এদের মধ্যে নিগৃহীত জাতিসুলভ মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে এবং

আজও পর্যন্ত মানসিক দিক থেকে নবজাত আজাদীর প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি। এদের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা, মনোবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য, সন্দেহ এবং এক ধরনের আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্ভবত এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।'

মিস্ জিন্নাহর প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন দেখা দিয়েছিল কেন? পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নাহ্-র বোন বলেই কি তাঁর এত সম্মান? না তা নয়। মিস্ জিন্নাহ্ হয়ে উঠেছিলেন একটি মতবাদের প্রতিনিধি। আয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানে যে বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তি গড়ে উঠেছিল মোহতারেমা জিন্নাহ্ ছিলেন তাঁদেরই প্রতিভূ। পূর্ব-বাংলার এক জনসভায় তিনি নিজেই বলেছিলেন: 'My acceptance of Precidential nomination is historic and a milestone in our history.' অর্থাৎ 'প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য আমার মনোনয়ন গ্রহণ হলো ঐতিহাসিক।' পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কাছে মাদারে মিল্লাত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: 'জমহুরিয়াত লে কে রহেঙ্গে'—'আমি গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্র নিয়েই আমি থাকবো।' এই কারণেই পূর্ব-পাকিস্তান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল "মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ" বলে।

এ সময় পূর্ব-পাকিস্তানের বহু স্বভাব-কবি মোহতারেমা ফতেমা জিন্নাহর সমর্থনে ছড়া গান ইত্যাদি রচনা করে গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে গেয়ে বেড়াতেন। এ রকম একটি "ভোটের গান"—"বাকস ভইর‍্যা ট্যাস দিব, ভোটের বেলা নাই" এখানে উদ্‌ধৃত করলাম। এই "ভোটের গানটি" রচনা করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রখ্যাত স্বভাব কবি রহমান বয়াতী।

'জোট কইরাছি ভোট দেব ভাই নয় দফায়
ভোট দেব না তাদের যারা
সাত টাকাতে তেল খাওয়ায়।

ছুখের কথা বলব কত
আমার ছুঃখ শত শত
দিবানিশি খাটি তবু
তেল আনিতে মুন ফুরায়।

ডাল পিঁয়াজের পাঁচসিকা সের
গিন্নি করে গোসা
মাছ কিনিতে পাইছি ভাইরে
চিঙ্গইর মাছের খোসা
বলুম কত এদের নামে
সকল কিনি ডবল দামে
তবু, আছি যেন স্বর্গ ধামে
দালালেরা তাই শোনায়॥

চাউলের কথা বলব কি ভাই
পাটের কথাই কই।
এই পাটের রশি গলায় দিয়া
গাছে ঝুইলা রই।
তাঁতীরা সব মরছে ভাতে
কি আসে যায় বল তাতে
মিল মালিকের ট্যাক্স হ'লি ডে
হইছে খোদার খাসি প্রায়॥

আমার দেশের গরীব চাষীর
খাজনা না হয় মাফ।
উঠ্‌তে বসতে ছোবল মারে
ট্যাক্সের জাতি সাপ।

সার্টিফিকেট করেন জারী
নিলাম করে ঘর ও বাড়ি
ওরে ট্যাক্স দিতে রসিদ নিতে
ঘুষ লাগে ভাই সব জা'গায়

কর্তা আইছে দালালেরা
গিয়া বাড়ি বাড়ি।
হুকুম দখল করেন সবার
যত ঘোড়া-গাড়ি!
আনব মানুষ তাতেই চড়ে
ইস্‌পিশাল টেরেন ঠিক যে করে
তবু খালি ময়দান থাকে পড়ে
লক্ষ লোকের ঢাক পিটায়॥

এরা মিলের মজুর কইরা ভাড়া
আইনা করে জড়।
গাঁয়ের মানুষ ধইরা নিয়া
সভা করে বড়।
বলব কি সেই সভার পরে
কর্তারা সব পড়েন সরে
শেষে ভাড়ার মানুষ পায় না ভাড়া
ভাত খাবে কি বাড়ি যায়

আমার ক্ষ্যাতে ভাইরে যখন
নোনাপানি আসে,
সোনার ফসল যখন আমার
বানের জলে ভাসে,

দেশদরদী লীগের নেতা
তখন তিনি কন না কথা
আর মরুভূমির নুন সরাইতে
সবার আগে সে যে ধায়॥

এই মরুভূমি করতে আবাদ
বানছে নতুন বাঁধ।
পিণ্ডিতে দেয় টাকার পাহাড়
নাম ইসলামাবাদ।
বলব কি আর নগরবাসী
মোদের কান্না ছাড়া নাইরে হাসি
ওরে আমরা যখন বানে ভাসি
হয় না টাকা তার বেলায়।
যেই ভাষাতে মা বোল বলি
করি কাঁদা হাসা।
মোরা বুকের লহু দিয়া রাখছি
সেই না মুখের ভাষা।
এখন তারা নানান ছলে
আরবী উর্দুর কথা বলে
দোষ নাহি ইংরাজী বোলে
যত জ্বালা এ বাংলায়॥

তোমার আমার ভোট নাহি ভাই
কেমন কুটিল মন্ত্র।
কর্তা ইচ্ছা কীর্তন হবে
আজব গণতন্ত্র।
কইতে না পাই মনের কথা

নাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
সবখানে অরাজকতা
ইচ্ছামত আইন বানায়।
আমি বাক্‌সো ভইরা ট্যাক্‌সো দিব
ভোটের বেলা নাই।
এমন আজব কথা কেহ কোথা
শুনছনিরে ভাই।
ভোটাধিকার পাইব যেদিন
ট্যাকসো মোরা দেব সেদিন
ঢালী ঢুলী কিষাণ কুলি
এই কথা আজ কইয়া যাই॥

ইস্কুলে, মিলে মাস্টার শ্রমিক
করতেছে হরতাল
শুধু দুই বেলা চায় পেট ভরিয়া
খাইতে ভাত ও ডাল,
গুণ্ডা পুলিশ আইনা পরে
শিক্ষক শ্রমিক দমন করে
আরো সমন জারি করে
ভইর‍্যা রাখে জেলখানায়॥

ফাতেমাকে ভোট না দিলে
বইলা দিলাম ভাই
জন্মের মত আশার মুখে
পড়বে তোদের ছাই।
তাই সবারে করি মানা
ওদের স্বরূপ আছে জানা
ওরাই তারা ভাইরে যারা
মানুষে গোরে গরু ঠাওরায়॥'

অবশেষে জানুয়ারী মাসের দুই তারিখে (১৯৬৫) ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান অনেক দিন বাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর সব দুর্ভাবনার অবসান ঘটলো। "এশিয়ার গৌরব" আয়ুব খান স্বরচিত শাসনতন্ত্রের গতি একটু দ্রুত করে দিয়ে আবার তাঁর তৈরী মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাঁধে চেপে প্রেসিডেন্টের গদীতে ফিরে এলেন। তিনি প্রায় একুশ হাজার ভোটের ব্যবধানে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফতেমা জিন্নাহ্‌কে পরাজিত করে পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বনে বসলেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে নির্বাচনে পরাজিত হলেও জঙ্গী শাসক আয়ুব গদি ছেড়ে সরে দাঁড়াতেন না। একটা কোন অজুহাত খাড়া করে ক্ষমতায় আসীন থেকে যেতেন। কিন্তু স্বরচিত নির্বাচনে জয়ী হয়েও জয়ের মধ্যেও অনেক ফাঁক দেখতে পেলেন "এশিয়ার গৌরব"। তিনি দেখলেন যে আয়ুবের জয়ের সংবাদে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ খুশী হতে পারেনি। বেতারে আয়ুব খানের জয়লাভের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার নাগরিক ও ছাত্রসমাজের মাঝে বিষাদের ছায়া নেমে আসে।

পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি মাত্র ২৫০০ ভোটে জিতেছিলেন। এই জয়ের মধ্যে আরও ফাঁক এইখানে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের হৃদ্‌ভূমি, ঢাকা বিভাগে এবং চট্টগ্রাম বিভাগেও আয়ুব খান পরাজিত হয়েছিলেন। রাজধানী ঢাকা শহরও তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে, প্রধান বন্দর চট্টগ্রামও তাই। তিনি জিতেছিলেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে যেগুলি পূর্ব-বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চল। পূর্ব-পাকিস্তানের কেন্দ্রভূমি থেকে তাঁর সিংহাসন যে নিশ্চিতভাবে টলেছিল এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহের আর কোন অবকাশ ছিল না। চিন্তার যথেষ্ট খোরাক ছিল করাচী শহরেও। পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর-বন্দর, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কেন্দ্র এবং কার্যত রাজধানী ছিল করাচী। এই রাজধানী সুনিশ্চিতভাবে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

পেশোয়ার, লাহোর এমন কি রাওয়ালপিণ্ডির মত শহরেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বিপুল-ভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন উপজাতীয় এলাকায় যেখানে নির্বাচকেরা সকলেই সরাসরি সরকারের মনোনীত ব্যক্তি। আয়ুব বাজীমাৎ করেছিলেন বড় বড় সামন্ত-প্রভু অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলেও।

বিজয়ের এই চেহারাটা বোধহয় তাঁর কাছে খুবসুরৎ ঠেকেনি। রেডিও-র সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়া আধ ঘণ্টা যদিও আয়ুব খান দেশবাসীকে অনেক হিতোপদেশ দিয়েছিলেন ও সবাইকে ভাবের বাণী বিতরণ করেছিলেন তবুও বোঝা গিয়েছিল যে তিনি খুব খুশী হননি। বুঝতে যেটুকু বাকি ছিল সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর-ই লড়িয়ে "লেড়কা" সৈনিক থেকে শিল্পপতি ক্যাপ্টেন গওহর আয়ুব।

আয়ুব খানের বিজয় দিবসের পরদিন অর্থাৎ তেশরা জানুয়ারী (১৯৬৫) বিকেলে ট্রাক বোঝাই গুণ্ডার দল, অস্ত্রশস্ত্র আর আগুন ধরাবার জন্য পেট্রোল নিয়ে গান্ধারা শিল্পের অধীশ্বর ক্যাপ্টেন গওহর আয়ুব নেমে পড়লেন করাচীর রাস্তায়। উদ্দেশ্যে আয়ুবের জয়ে বিজয়োল্লাস। পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর ও বন্দর করাচী। গাড়ি ছোটালেন তারই কয়েকটি পাড়ার দিকে—উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত-পাড়া লিয়াকতাবাদ, নাজিমাবাদ ও গোলিমা। যদিও নির্বাচনী অভিযানের সময় "মুসলিম জাতি"র জন্য দরদে আয়ুব ভগ্নকণ্ঠ আর্তনাদে দশদিক মুখর করে তুলেছিলেন এবং দরদের প্রমাণ হিসেবে ভারত ও হিন্দু বিদ্বেষের কুৎসিত বিজ্ঞাপন ছাপাতেও তাঁর বাধেনি—তবুও সেই হিন্দু-ভারত থেকে আগত মুসলিম উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর অনুরাগী ভক্তের দল কি করলেন? লিয়াকতাবাদের পথে-পথে মানুষকে হত্যা করল তারা, ঘরে-ঘরে আগুন লাগাল নির্বিচারে, লুট করলো দোকানপাট অবিবেকী লোভের তাড়নায়। জীবন্ত দগ্ধ হোল নারী-পুরুষ-শিশু। অসহায়ের দল আবার উদ্বাস্তু হয়ে

ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাল। করাচী বিশেষতঃ করাচীর বহিরাগত উদ্বাস্তুরা আয়ুবের বিপক্ষে গিয়েছিল বলেই যে গওহর আয়ুবের এ ধোলাই-এর ব্যবস্থা তা বুঝে সবাই ভবিষ্যৎ ভেবে শিহরিত হোল। "এশিয়ার গৌরব" এক বিবৃতিযোগে "গভীর শোক" প্রকাশ করলেন। কিন্তু করাচীতে ১৪৪ ধারা চালু থাকা সত্ত্বেও পুত্র-রত্ন গহর আয়ুব কি করে যে এত বড়ো শোভাবর্ধক শোভাযাত্রার অনুমতি পেয়েছিলেন তা তিনি কাউকে জানতে দিলেন না। "এশিয়ার গৌরবে"র পক্ষেই শুধু এ রকম অসাধারণ বাক-সংযম—অসাধারণ বাক-সংযম সম্ভব!

যে তুমুল গণবিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলন এই নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে সেবার দেখা গিয়েছিল, যাতে বহু রক্তপাত জেল ও অত্যাচারের বন্যা বয়েছিল,—পৃথিবীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা বিরল। এ ছাড়া মোহতারেমা ফতেমা জিন্নাহ্‌র পেছনে যে বিপুল গণসমর্থন ছিল তাতে আজো পর্যন্ত কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও আয়ুব-শাহীকে পরাজিত করা সম্ভবপর হোল না কেন, তার বিশ্লেষণ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেই করতে হয়েছিল। দূর থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তা থেকে বলা যায়:

১. এটা শুধু গৌণ নির্বাচনই ছিল না। সাধারণ Electoral College আর ৮০ হাজার মৌল গণতন্ত্রী এক কথা নয়। মৌলিক গণতন্ত্রীরা একটা স্থায়ী স্বার্থ, এরা প্রায় রাজকর্মচারী। নানা বিষয়ে মাতব্বরি করা, সরকারী অর্থের ওপর ভাগ বসানো ইত্যাদি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার অধিকারী এরা ছিল এক স্থায়ী শ্রেণী। কাজেই এদের ওপর প্রভাব বিস্তারকরা প্রগতিশীল শক্তিগুলির পক্ষে সহজ কথা ছিল না। এছাড়া বহু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও গণতন্ত্র চেতনাহীন ব্যক্তি মৌল গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই আয়ুবের পক্ষে তাদের অর্থ ও পদের লোভ দেখিয়ে বশে আনতে মোটেই

অসুবিধে হয়নি। শোনা যায় এই নির্বাচনে কোন-কোন জায়গায় প্রতিটি ভোটের দাম উঠেছিল দু-হাজার থেকে সাত হাজার টাকায়।

২. একটা ব্যাপক জনচেতনা ও গণআন্দোলন যত বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল গণসংগঠন সে পরিমাণে হয়নি। বিরোধী দলগুলি সুসংগঠিতভাবে আন্দোলন চালিয়েছিল যতটুকু, তার চেয়ে ঢের বেশী সক্রিয় ছিল সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের ঢেউতেই দলগুলি দোলা খাচ্ছিল। অথচ জনসাধারণের আবেগ যতটা ছিল, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চেতনা ততটা স্পষ্ট ছিল না। গ্রামে-গ্রামে কমিটি করা, কমিটিগুলির দৈনন্দিন সুষ্ঠু কাজ পরিচালনা করা—এসব বিশেষ করা হয়নি। যদি প্রত্যক্ষ ভোট থাকতো তবে এই ভোটের ঢেউতেই আয়ুব-শাহী ভেসে উলটে যেতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশেষ হাত ছিল না, কেননা মাঝখানে ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা।

৩. যে পাঁচটি বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে মিস জিন্নাহ্‌কে আয়ুবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁদের মতামত একরকম নয়, তাঁদের পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা ও কাজকর্মও কিছুটা বিভ্রান্তিসৃষ্টি করেছিল। আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (N. A. P.) এ দুটি দল প্রগতিশীল হলেও অপর তিনটি দলের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা সুস্পষ্ট। তারা অনেকে মোল্লাতন্ত্রী কথাবার্তা বলেছে—অথচ গণতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র এক সাথে চলা শক্ত।

৪. আয়ুব-শাহীর একটি মোক্ষম যুক্তি ছিল যে বিরোধী পাঁচ পার্টি ভোটে জেতার পরদিনই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি সুরু করে দেবে এবং সামরিক শাসনের পূর্বে পাকিস্তানের যে অবস্থা ছিল সেই অরাজক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে। এ অভিযোগ খণ্ডন করবার মত যথেষ্ঠ যুক্তি বিরোধী-দল দেখাতে পারেনি।

৫. পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার ও সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহারটা একটা প্রধান সমস্যা। যদিও বিরোধী দলগুলি একবাক্যে সাখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ঠ প্রচার ও কাজ

করেছিলেন, ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের কেউ কেউ প্রাণও দিয়েছিলেন, তবুও সংখ্যালঘুরা সেখানে নিজেদের সর্বদা নিরাপদ মনে করেননি। তাঁরা পড়েছিলেন উভয় সঙ্কটে। তাঁরা আয়ুব-শাহীকে পছন্দ না করলেও নির্ভয়ে বিরোধী-দলগুলিকে সবাই ভোট দিতে সাহস করেছিলেন কিনা সন্দেহ। আয়ুব-শাহী যদি জিতে যায় তবে তাঁদের ওপর কি করা হবে এই ভয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এ সত্ত্বেও, এ পরাজয় সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের সন্দেহ ছিল না যে সূর্য পূর্বদিক থেকেই উঠবে—যদিও আকাশ সেখানে তখনও ছিল মেঘে ঢাকা। তাদের এ সন্দেহও ছিল না যে আয়ুবতন্ত্র বা খয়ের খাঁ-তন্ত্র একদিন এই ভোটের ধাপ্পা থেকে নিস্তার পাবে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল নির্বাচনের ফলাফলে বিশেষ বিস্মিত হননি। বরঞ্চ প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নির্বাচনী কলেজের প্রায় ত্রিশ হাজার সদস্য আয়ুব খানের সরাসরি বিরোধীতা করে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের দাবীতে এগিয়ে এসে বিরোধী-পক্ষীয় প্রার্থী মিস্ ফতেমা জিন্নাহ্‌কে যে ভাবে ভোট দিয়েছিলেন তাকে পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। নির্বাচনী কলেজের সদস্যরা ভাল করেই জানতেন যে "বুনিয়াদি গণতন্ত্র"-এর পরিবর্তে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থই ছিল "বুনিয়াদি গণতন্ত্র"-এর দৌলতে দেশে তাঁদের সুবিধাভোগী শ্রেণীসুলভ যে প্রভাব-প্রতিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা লোপ পাওয়া। এ সত্ত্বেও নির্বাচনী কলেজের প্রায় ৩০ হাজার সদস্য যেভাবে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন তা নির্ভুলভাবে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের এক বলিষ্ঠ অবদানের নিদর্শন হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরে ঢাকার জনপ্রিয় "দৈনিক ইত্তেফাক"-এ এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম: 'যে সঙ্কুচিত ভোটাধিকার ও বলয়বদ্ধ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, সেই ব্যবস্থাকে জনগণ কোন সময়েই গণতান্ত্রিক বলিয়া মানিয়া নেয় নাই। তবু অবস্থাধীনে উক্ত পদ্ধতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল এজন্যেই যে উহা ছাড়া নিয়মিতান্ত্রিক সংগ্রামের আর কোন পথ খোলা ছিল না। তবে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল যে, যাঁহারা এই পদ্ধতির উদ্ভাবক তাঁহারা আর কিছু না হোক, অন্ততঃ তাঁহাদের পদ্ধতির নির্বাচনে সততা রক্ষা করিবেন। পরিতাপের বিষয়, সেই প্রত্যাশা অসত্য প্রমাণিত হইয়াছে। হাজার-করা একজনের ভোটে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল ক্ষমতাসীন দল তার উপরও ভরসা করিতে না পারিয়া সর্ব পর্যায়ে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়াছেন।...শাসনতন্ত্র থাকার অর্থই যেমন গণতন্ত্র থাকা নয়, তেমনি নির্বাচনের অর্থই গণতান্ত্রিক আচরণ নয়। বিভিন্ন স্বৈরতান্ত্রিক দেশের ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। সিংম্যান রী ক্ষমতাসীন থাকা কালে বার বৎসরে তিনবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে; কোন বারই তিনি শতকরা নব্বুই ভোটের নিচে পান নাই। চিয়াং কাইশেকের ফরমোজায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কখনও তিনি শতকরা নিরানব্বুই ভোটের নিচে পান না। ফ্রাঙ্কো ও সালাজার নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং বরাবরই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া থাকেন।...স্বেচ্ছাচারী শাসনে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কদাপি উহাতে পরাজয় বরণ করেন না। কিন্তু পরাজয় বরণ না করিলেও সেই সব স্বেচ্ছাচারী শাসকের প্রতি দেশের জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব কাহারো জানিতে বাকী থাকে না।... নির্বাচনের ফলাফলে জনগণ কিছুই হারায় নাই; কারণ, নূতন করিয়া কিছু তাহাদের হারাইবার ছিল না।...হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের

সঙ্কল্প লইয়াই জনগণ নির্বাচনের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে নিয়োজিত হইয়াছিল।...এই সংগ্রামে নৈতিক জয় হইয়াছে জনসাধারণেরই।... এই নৈতিক জয় অবশ্যই একদিন কার্যকরী জয়ে পরিণত হইবে।'

নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক জয় লাভের পরে আয়ুব খান যে সমস্ত বাগড়ম্বর করে বেড়াচ্ছেন তার উল্লেখ করে ঢাকার একটি সংগ্রামী সাপ্তাহিক "জনতা" তাঁদের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

'ক্ষমতাসীনদের ভূয়া বাগাড়ম্বর

'ক্ষমতাসীন মহল এখন দাবি করিতেছেন যে, জনসাধারণ বর্তমান প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছে এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানাইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন মহলের এ হেন দাবির সহিত সারা দেশে বিরাজমান বাস্তব অবস্থার কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।...এই নির্বাচনের মধ্য দিয়া এদেশের কোটি-কোটি মানুষের কাছে বাস্তবে আজ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে বিশেষ ব্যবস্থা বা পদ্ধতি এক ব্যক্তির শাসনকেই টিকাইয়া রাখা বা প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত সে পদ্ধতিতে জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটিতে পারে না। সুতরাং এই নির্বাচনের ফলে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণের দাবি দুর্বল না হইয়া নিশ্চিতভাবে আরো জোরদার হইবে।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর দেশের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের পক্ষ থেকে বর্তমান কর্তব্যপ্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ঢাকার আরো একটি সংগ্রামশীল দৈনিক "সংবাদ" তাঁদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিলেন :

'সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও সংহতির আহ্বান

পাকিস্তানের দশকোটি মানুষ যাহা চাহিয়াছে নির্বাচনী ফলাফল

উহার বিরুদ্ধে গিয়াছে।...নির্বাচনের ফলাফল প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রয়োজনকে আরও করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে মাত্র, তিল পরিমাণও হ্রাস করে নাই।...যে কোন সংগ্রামে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য জনতার সমর্থন ও অংশ গ্রহণ সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি। কাজেই,...গণতন্ত্রের পতাকাকে সমুন্নত রাখিতে হইবে, জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য পরিচালিত সংগ্রামকে অব্যাহত রাখিতে হইবে।...সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অপরিহার্য শর্ত হইতেছে গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখা। সম্মিলিত বিরোধীদল তথা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের কাছে দেশবাসীর আজ ইহাই একমাত্র দাবি।'

সাপ্তাহিক "জনতা"ও এই কর্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করে লেখেন :

'জনগণের সকল অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম এইরূপ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে এদেশের মানুষের অব্যাহত আন্দোলনই জনগণ ও উহার নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ সফলতার গ্যারান্টি।'

ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হোলেন। বিজয় উল্লাসে ক্ষমতায় মদমত্ত আয়ুবের শুধু জয় আর জয়ের মধ্য দিয়েই ১৯৬৫ সাল সুরু হোল।

দু-একটা সহজ ও সাধারণ সত্য মাঝে-মাঝে স্মরণ করা দরকার, নয়তো পাক-ভারত সম্বন্ধের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান জটিলতার কোন অন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিন্দু ও মুসলমানের এক দেশ হতে পারে না, এই যুক্তির সমর্থনে দেশে যখন দাঙ্গা হাঙ্গামার একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন দেশটা দু-টুকরো করে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য নিয়েই এটা হোল যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এভাবেই মিটবে। কিন্তু মিটলো না। বরঞ্চ দেশ-বিভাগের ১৮ বছর পরে ১৯৬৫ সালে দেখা গেল যে, সে

পুরোনো সমস্যাই ক্রমে যুদ্ধের আকার নিচ্ছে। যা ছিল লাঠি ছোরার মারামারি—তাও সর্বদা নয়, মাঝে-মাঝে এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে—তা সেদিন ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি দেশে অনির্বান ঠাণ্ডা লড়াই, অহরহ সীমান্ত সংঘর্ষ এবং একটা ঘনায়মান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পরিণত হচ্ছিল। উপরন্তু দুই দেশেরই যাবতীয় সম্পদ ও শক্তি এই যুদ্ধদেবতার জন্য উৎসর্গ করার তোড়জোড় চলছিল। দুই দেশে একটা বিরাট্ যুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ গঠনের কাজে ঢিলে দিয়ে যুদ্ধের জন্য সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করার তাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভারত চতুর্থ পরিকল্পনায় আত্মরক্ষা খাতে ৫০০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করেও যথেষ্ঠ মনে করেনি, কারণ বৈদেশিক অর্থ পুষ্ট পাকিস্তানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। আর পাকিস্তান তো যুদ্ধের খরচ বাড়িয়েই চলেছিল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পাকিস্তান-কে যুদ্ধ করার ক্ষমতাটা সৃষ্টি করে দিল কে? নিঃসন্দেহে মূলতঃ ব্রিটেন ও আমেরিকাই। SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানকে প্রলুব্ধ করেছিল কারা? এই আমেরিকা, ব্রিটেনই। পাকিস্তানের হাতে বিনামূল্যে প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিল কে? আবার উত্তর—এই আমেরিকা ও ব্রিটেনই। ওরা অবশ্য বহুবার বলেছে যে 'এসব অস্ত্রশস্ত্র তো আমরা ভারতের বিরুদ্ধে লাগাবার জন্য দিইনি—দিয়েছিলাম কম্যুনিস্ট চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগাবার জন্য।' তার অর্থ দাঁড়ালো এই যে বিশ্বে কম্যুনিস্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তিগুলির যে সংগ্রাম, তারই প্রয়োজনে সদ্য স্বাধীন আফ্রো-এশিয় দেশগুলিকে সশস্ত্র করে তোলার নীতি ছিল অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের। পৃথিবীর বৃহৎ দুই জোটের সংগ্রামী প্রয়োজনেই পাকিস্তান ও অন্যান্য আফ্রো-এশিয় দেশগুলির যা মূল্য।

পাকিস্তানের কম্যুনিসমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এমন কোন আশু তাগিদ ছিল না। চীন ও রাশিয়াকে রুখবার নামে সে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়েছিলো, কিন্তু তুদিন বাদেই ঘোষণা করেছিল যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সে অস্ত্র নিয়েছে—সে আক্রমণ ভারত থেকেই আসুক বা অন্যদেশ থেকেই আসুক। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কচ্ছের লড়াই ও পরে সেপ্টেম্বর সংঘর্ষের সময় খোলাখুলিভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে লাগাতে সুরু করলো আর চীনের সঙ্গে সুরু করলো মিতালী। যে চীনের কম্যুনিসম-কে রুখবার জন্য পাকিস্তান অ্যাংলো-আমেরিকান গোষ্ঠী থেকে অস্ত্র পেলো, সেই চীনের থেকে এখন সে সমর উপকরণ নিতে সুরু করলো।

১৯৬৫ সালের নির্বাচনে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব আরও পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্টের গদী দখল করবার পর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতে সুরু করেন। মূলতঃ তুটি বিষয় নিয়ে তিনি এ হুমকি দেন···প্রথমটি কচ্ছের রাণের জলাভূমি, দ্বিতীয়টি সেই মান্ধাতার আমলের পুরোনো প্রশ্ন কাশ্মীর নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের এ যুদ্ধং দেহী মনোভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন—ঢাকার দৈনিক "ইত্তেফাক"-এর 'মিঠেকড়া' কলামে "ভীমরুল" বা প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আহমেতুর রহমান (ইনি ১৯৬৬ সালে কায়রোর কাছে পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস্-এর একটি শোচনীয় বিমান তুর্ঘটনায় নিহত হন) পাক-ভারত সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে লিখলেন: 'পাকিস্তানকে এভাবে বন্ধুবিহীন করিয়া এবং শত্রু পরিবেষ্টিত করিয়া জনাব আয়ুব সামরিক বিশেষজ্ঞতার দাবীতে কি করিতে চান? চারিদিকে সকলেই যদি শত্রু হইয়া থাকে তবে একজন 'সমর-বিষারদ' পুনরায় ক্ষমতাসীন হইয়া কি করিবেন? তিনি কি বলিতে চান যে সকলের বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া দরকার? বিগত ছয় বৎসরে আমরা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের বহু লম্বা-লম্বা কথা শুনিয়াছি এবং বহু

লম্ফ-ঝম্ফ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে লম্ফ-ঝম্ফ করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরেই জনাব আয়ুব উত্তরের বিপদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ভারতের সহিত যুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব তুলিয়া বসেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে আয়ুবের প্রস্তাব কানে তোলে নাই। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সেই অবজ্ঞার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কিংবা বুঝিতে পারিয়াও যখন সে প্রস্তাব বার-বার উত্থাপিত হইতে লাগিল—তখন উহাকে 'strange' 'তামাশা' ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নাকচ করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ আগা-মাথা-হীন একটি প্রস্তাব সম্পর্কে স্বৈরাচারী সরকার যে মতই পোষণ করুন কোন দায়িত্বশীল সরকার উহা লইয়া নাচিতে পারে না। দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল উত্তরের সেই বহু কথিত বিপদ মন্ত্রবলে যেন কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ করিয়া উত্তরের সেই বিপদকে পরম বন্ধু বলিয়া প্রচার করা হইতে লাগিল। বন্ধুত্ব লাভ আসলে কতটা ঘটিল তাহা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না বটে, তবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ সে কাহিনী বলিতে-বলিতে মুখে ফেনা তুলিয়া ফেলিলেন। একই সঙ্গে ভারত-বিরোধী বাক্যের জেহাদ চলিতে লাগিল তড়িৎ গতিতে। যথা নিয়মেই কাশ্মীর প্রশ্ন লইয়া লম্ফ-ঝম্ফ করা হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন ভারতের বিরুদ্ধে একটা-কিছু কাণ্ড বাধাইয়া ফেলিতেই ক্ষমতাসীনরা মনস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন।

বর্তমানে সেই লম্ফ-ঝম্ফ চরমে উঠিয়াছে এবং এমন সব কথাবার্তা বলা হইতেছে যেন বিরোধী দলের জন্যই কাশ্মীরকে হাতের মুঠায় আনা যাইতেছে না।

আমাদের কথা বলিতে গেলে আমরা মনে করি সকল প্রতিবেশীর সঙ্গেই পাকিস্তানের সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তোলা উচিত। আমরা জানি ইতিহাসে কোন যুদ্ধই কোন সমস্যার সমাধান করে নাই, বরং প্রতিটি যুদ্ধই নূতন-নূতন সমস্যার জন্ম দিয়াছে। এ যুগে এই

'যুদ্ধ-বিরোধী চেতনা সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। ফলে ছোট-ছোট রাষ্ট্রের কথা তো ওঠেই না—এমন কি বড়-বড় শক্তিগুলিও আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করে না। এমতাবস্থায় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তাকে বরাবরই আমরা অবাস্তর বলিয়া গণ্য করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সমস্যাসমূহের মীমাংসা হওয়া উচিত। তাই প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টির গুরুত্বকে আমরা ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় ভারতের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ নন। বস্তুতঃ কোন কোন সময়ে এমন কথা বলাও হইয়াছে যে সমস্যার সমাধান কল্পে আলাপ-আলোচনার পথ নিঃশেষিত হইলে 'অন্যবিধ পন্থা' অবলম্বন করা হইবে। একথার একটাই অর্থ হইতে পারে—ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সত্যিই তাহা মনে করেন তাহা হইলে ভারত যখন উত্তরের বিপদে বিব্রত ছিল তখনই সেই 'অন্যবিধ পন্থা' অবলম্বনের মাহেন্দ্রলগ্ন ছিল। ক্ষমতাসীন দলের Strategist তখন কি করিতে ছিলেন? তবে কি তিনি যুদ্ধবিরোধী ফিল্ড মার্শাল? যদি তাই হয় তাহা হইলে এত লম্ফ-ঝম্ফ কেন?'

কচ্ছের রাণের জলাভূমি নিয়ে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেধেছিল ব্রিটেনের মধ্যস্ততায় তা নিয়ে একটা যুদ্ধ বিরতি হয়েছিল—একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনালের কাছে দুই দেশের মধ্যে কচ্ছের বিবাদের প্রশ্নটি সালিশীর জন্য পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু সে বছরই আগস্ট মাসে আয়ুব-শাহী হানাদার বেশে ছ-সাত হাজার সুশিক্ষিত সৈনিককে কাশ্মীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে কাশ্মীরকে ভেতর থেকে দখল করবার একটি পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাদের এই অ্যাডভেনচার ব্যর্থ হোল—কাশ্মীরীরা পাকিস্তানের প্রসারিত হস্ত গ্রহণ না করবার জন্যই প্রাথমিক পরাজয় ঘটলো।

আয়ুব-শাহীর। এর প্রতিশোধ নিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সেনা-বাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানলো ছাম্ব-জৌরিয়ান রণক্ষেত্রে খোলাখুলি-ভাবে হানাদারদের বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। এখানে সুরু হয়েছিল এ যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরে ভারতকে লাহোর ও অন্যান্য স্থানে রণাঙ্গণ খুলতে হোল—প্রধানতঃ ছাম্ব-জৌরিয়ানে পাকিস্তানী যান্ত্রিক সমর বাহিনীর বিরাট আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য এবং ভিন্নমুখী করার জন্য। এ স্তরেও ভারতীয় অভিযান মূলত আত্মরক্ষা-মূলক ছিল যদিও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাদের আক্রমণও সংঘটিত করতে হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান মার্কিন প্যাটন-ট্যাঙ্ক ("কম্যুনিস্ট" দমনের জন্য মার্কিন সরকারের কাছ থেকে খয়রাতি পাওয়া) ও অন্যান্য আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলে আপন শক্তির দম্ভে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণাত্মক রণকৌশল নিয়েছিল। কিন্তু মূলত দুর্বল পক্ষের আক্রমণভঙ্গী বেশিদিন আক্রমণাত্মক রাখা সম্ভব হয় না। ফলে পাকিস্তানের আক্রমণ শীগগিরই স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে আসে এবং লড়াইয়ের initiative ভারতের হাতে এসে যায়। অবস্থা গুরুতর দেখে আয়ুব-শাহী পৃথিবীর সর্বত্র সাহায্যের জন্য আবেদন করে বেড়ান। জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল শ্রী উ থান্ট নয়াদিল্লী ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ছুটে আসেন—ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানাতে নিউ-ইয়র্ক থেকে তাঁর এই আগমন। (এখানে উল্লেখনীয় যে ১৯৬৪ সালের মে মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পরলোকগমন করবার পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন)। অবশেষে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) স্বস্তি পরিষদ (Security Council) যুদ্ধবিরতির কড়া নির্দেশ দেন যা উভয়পক্ষ মেনে নেয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত-পালিত প্রেসিডেন্ট আয়ুবের মত মুসলিম লীগের ঐতিহ্যবাহীরা সর্বদাই চেয়েছিলেন

ঘৃণা-বিদ্বেষের সম্প্রসারণ এবং তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাই যখনই আয়ুব সরকার দেখেন যে প্রগতিশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তখনই তারা সেই মাথা নুইয়ে দেবার যে প্রধান অস্ত্রটি ব্যবহার করতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি তা হোল সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও ভারত বিদ্বেষ।

বিশেষ করে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে গোটা সরকারী প্রচার-যন্ত্রের একমাত্র কাজই, হয়ে উঠেছিল জনসাধারণকে বোঝান যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবই পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা এবং ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র একটা রাজনৈতিক ধাপ্পামাত্র। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—টেলিফোন, ডাক-বিনিময়, রেল ও বিমান চলাচল ইত্যাদি। দুই দেশের মধ্যে খবরাখবর পাবার কোন উপায় ছিল না একমাত্র রেডিও ছাড়া। কিন্তু সে সময় রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচার এমন ভীষণ এক বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যাঁরা সে প্রোগ্রাম একবার শুনেছেন তাঁরা দ্বিতীয়বার তা শুনতে দ্বিধাবোধ করেছেন। হিন্দুদের জাত তুলে ধর্ম তুলে নেহাত গালাগাল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ ছাড়া তাতে আর কিছু ছিল না, যদিও পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় নব্বুই লক্ষ হিন্দু আছেন। একটি উদাহরন দিচ্ছি। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) রাত্রে ঢাকা রেডিও শুনছিলাম। রাত দশটায় কাজী মনসুর-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো:

"মুসলিম চরণে দলেছে বিপুলা পৃথিবী,
বীর মুজাহীদ পাঞ্জা লড়ে ঝঞ্ঝার সাথে
বর্বর পিশাচ ব্রাহ্মণ্যবাদকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলব
চল রে দিল্লী চল।
ব্রাহ্মণ্যবাদকে ধুলার সাথে মিশিয়ে দাও
ইত্যাদি।"

কথিকাটির লেখক ছিলেন জনাব রফিকুল ইসলাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর একটি কথিকায় "ব্রাহ্মণ্য সমাজবাদে"র বাপান্ত

করে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী বললেন: 'হিন্দুস্থান কথাটা জঘণ্য গালিগালাজ বলে শিশুরাও মনে করে।' এই কথিকাটি লিখেছিলেন জনাব সিরাজুল হক। রেডিও পাকিস্তানের প্রচার শুনে মনে হোত যে পাকিস্তান যেন একমাত্র মুসলমানদেরই দেশ—আর কারো নয়। রেডিও পাকিস্তান ভারতবর্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি—রেডিও পাকিস্তান কখনও ভারত বলেনি—বলেছে হিন্দুস্থান এই অর্থে যে ভারতবর্ষ যেন শুধু হিন্দুদেরই স্থান আর একমাত্র ব্রাহ্মণদের। এর অর্থ কি রেডিও পাকিস্তান করতে চেয়েছিল এই যে পূর্ব-পাকিস্তানে যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু আছেন পাকিস্তান তাঁদের দেশ নয় আর একইভাবে ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানের দেশ ভারতবর্ষ নয়। আসলে আয়ুব-শাহীর আমলে একদল স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে-ভরা নেতা পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দখল করে বসে ছিল—এই অর্বাচীনের দল ছিল সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। এদের সদা সর্বদা ভীতি ছিল যে কখন তাদের রাজত্ব তাদের হাত থেকে ফস্‌কে যায়—পাকিস্তানের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি কখন তাদের চরম আঘাত আনে। তাই তাদের ছিল এত আতঙ্ক, এত ত্রাস এবং পাকিস্তানকে ধরে রাখতে একমাত্র বিদ্বেষ-প্রচার ছাড়া আর কোন হাতিয়ার তারা খুঁজে পায়নি। আয়ুব-শাহী কি বস্তু ছিল, তার আদর্শটাই বা ছিল কি এটা বুঝতে হলে পাকিস্তান রেডিও শোনা প্রয়োজন ছিল। সে সময় রেডিও পাকিস্তান শুনলে এটাও বোঝা যেত যে কেমন করে ভারতে হিন্দু জঙ্গী সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দাঙ্গা সৃষ্টি করতে তারা উসকানি দিচ্ছিলো। "হিন্দুস্থানকে খতম্‌ করো" এ ধরনের আন্দোলন ও আওয়াজের শিকার কারা হতে পারতো তা বোঝা দরকার। সুখের বিষয় পূর্ব-বঙ্গে সাধারণ মুসলমানরা এ জাতীয় জেহাদে কোন উৎসাহই পাননি—তাঁরা এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। ফলে ঐ জেহাদের জীগির মাঠেই মারা গেছে। বস্তুত হিন্দুরা যদি সত্যি সত্যি হিন্দুদের

ভালবাসেন—পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতিও একটা টান রাখেন, আর পাকিস্তানের মুসলমানরাও যদি ভারতের মুসলমানদেরও ভালবাসেন ও তাঁদের প্রতি তাঁদের কোন প্রাণের টান থাকে তবে নিশ্চয়ই তাঁরা কোথাও—এখানেই কি বা ওখানেই কি কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উসকানি দিতে পারেন না। অপর দেশে স্বধর্মীয়দের প্রতি টান থাকা একটা অপরাধ নয়, বরঞ্চ সেটাও মানবতারই একটা অঙ্গ। সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি আমাদের টান থাকুক, পাকিস্তানের সকল মানুষের প্রতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের টান থাকুক এবং ওদেরও টান থাকুক আমাদের সকলের প্রতি—সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি, এতে কোন দোষ নেই। বরঞ্চ এটাই চাই।

ঢাকায় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর লড়াই সুরু হবার পরেই যখন ঢাকা রেডিও থেকে রবীন্দ্র-সংগীত ও অন্যান্য ভারতীয়-সংগীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেল তখন একটি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: ঢাকা রেডিও থেকে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার বন্ধ করা হোল কেন? (এই সম্পাদক সাহেবও পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া বন্ধ করবার জন্য সুপারিশ জানিয়েছিলেন। সরকারী মহলে তাঁর দাপট ছিল প্রচণ্ড)। উত্তরে তিনি অম্লান বদনে বলেছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে নাকি পাকিস্তানের মানুষের ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এর পরেও ১৯৬৭ সালে আরেকবার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর আয়ুব-শাহীর প্রবল আক্রমণ এসেছিল। সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসব।

পাক-ভারত সংঘর্ষের পরে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যে এ যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। ফলে এ সময় আয়ুবী শাসন কাঠামোর বিরুদ্ধে নতুন করে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের অভিজ্ঞতাই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কাছে তাদের তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দারুণ বিপদ সম্পর্কে নতুন সচেতনতা এনে দেয়। এই

সংঘর্ষের সময় পূর্ব-পাকিস্তান বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। নিজস্ব কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় ও বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাতুর শাস্ত্রীর ঘোষণা 'ভারতের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের কোন বিবাদ নেই' পূর্ব-বঙ্গের মানুষের মনে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। আয়ুব সরকারের জনৈক মন্ত্রী বলেন যে চীনের জন্যই পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে—তখন বিভ্রান্ত পূর্ব-পাকিস্তানীরা স্বভাবতই এই প্রশ্ন তোলেন যে, এ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যুক্ত থেকে লাভ কি? আয়ুব যে শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলে পূর্ব-পাকিস্তানকে তার নিজস্ব দাবী-দাওয়া ভুলে যাবার ফরমান দিতেন সেই শক্তিশালী কেন্দ্র যে প্রকৃত বিপদের দিনে তাঁদের কোন কাজেই আসবে না, আসতে পারে না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এ বিষয়ে তাঁদের নতুন করে সচেতন করে দেয়। তাছাড়া এই প্রশ্নও তাদের মনে জাগে যে আয়ুব যদি কাশ্মীরের জন্য অথবা অন্য কিছুর জন্য ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেন তাহলে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে সেই যুদ্ধের দায় বহন করবেন কেন? উপরন্তু এটাও তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আয়ুবের নীতির ফলে যদি চীন ও ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের কোন লাভ নেই। আয়ুবের সমর্থনে যদি চীন পূর্বদিকে এগিয়ে আসে এবং তারপর চীন ও ভারতের বিপুল বাহিনী যদি পূর্ব-পাকিস্তানকে তাদের রণাঙ্গণ করে তোলে এবং যথানিয়মে অন্যান্য শক্তি এসে সেই মহাযুদ্ধে যোগ দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত যারই জয় হোক পূর্ব-বঙ্গ তাতে সম্পূর্ণ ধ্বস্তবিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী-দলের নেতা জনাব নুরুল আমিন ১৯৬৬ সালের ১৫ই মার্চ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: 'তখন (অর্থাৎ সেপ্টেম্বর লড়াই-এর সময়) পূর্ব-পাকিস্তান শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের পীঠস্থান রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিল না, সারা বিশ্ব থেকেই এই প্রদেশ বিচ্ছিন্ন ছিল। যুদ্ধকালীন এই বিচ্ছিন্নতার

আলোকে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানের কোন অংশ নেই। জনাব নুরুল আমিনের বক্তৃতা থেকেই শুধু নয়, অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রেও পূর্ব-বাংলার মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই। সংঘর্ষ বিরতির অল্পকাল পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের অভ্যন্তরে দাবী ওঠে যে দেশরক্ষার দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। কারণ সঙ্কটকালে বহু দূরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করলে পূর্ব-পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য। এই দাবী অতি দ্রুত এত জোরদার হয়ে ওঠে যে ১৯৬৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব-বাংলাকে দেশরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলবার প্রস্তাব পাস হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ আশা করেছিল যে পাকিস্তানের মিলিটারী বাহিনীতে পূর্ব-বাংলার সামরিক শক্তি দ্রুত গড়ে তোলা হবে। একথা বুঝতে বাঙালীদের অসুবিধে হয়নি যে কোন দেশের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মমর্যাদার অন্তিম ভিত্তি হোল তার সামরিক শক্তি। একথা উপলব্ধি করে খাজা নাজিমুদ্দিনের মত ইংরাজ আমলের একজন আমলাতান্ত্রিক নেতা পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দাবী জানিয়ে বলেন : 'পূর্ব-বঙ্গের সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী হোল এই যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালীকে তাদের ন্যায়সঙ্গত ও যথাযোগ্য অংশ দিতে হবে।' শুধু নাজিমুদ্দিন নন—পূর্ব-বাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নেতা পাক-বাহিনীতে বাঙালীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার দাবী জানান। ১৯৫০ সালে পাক-গঠনতন্ত্রের মূল নীতি সম্পর্কে আলোচনা কালে পূর্ব-বাংলা থেকে সমস্বরে এই দাবী উত্থিত হয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ব-বাংলার ঐতিহাসিক নির্বাচনের সময় পূর্ব-বঙ্গের লক্ষ লক্ষ জনতা

সর্বসম্মতভাবে এই দাবী প্রবলভাবে পুনরুচ্চারিত করে। ১৯৬৪-৬৫ সালের বুনিয়াদি গণতন্ত্রী নির্বাচনের সময়ও পূর্ব-পাকিস্তানে এই দাবী উত্থাপিত হয়। কি গণ-পরিষদে, কি প্রাক মার্শাল ল যুগের জাতীয় পরিষদে অথবা আয়ুব-তন্ত্রে গঠিত জাতীয় পরিষদে—প্রতি পর্বে পাক-কেন্দ্রীয় আইন সভায় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা অবিচ্ছিন্নভাবে দাবী তোলেন যে পাক-বাহিনীতে Bengali Regiment বা বাঙালী ফৌজ গড়ে তুলতে হবে, পূর্ব-পাকিস্তানকে দেশরক্ষার দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে, পূর্ব-বঙ্গে নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টারস স্থাপন করতে হবে। পূর্ব-ভূখণ্ডে সামরিক রিক্রুট ও শিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পূর্ব-বাংলায় জল-স্থল-বিমান বাহিনীর অফিসারদের শিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে—এককথায় দেশরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানীদের দিতে হবে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই দাবীর প্রতি কর্ণপাত করার সামান্য প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক নেতৃগণ। একটি উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সাল এই সতেরো বছরে পাকিস্তানের দেশরক্ষার বাজেটে যত ব্যয় হয়েছিল তার শতকরা ৯২ ভাগ খরচ হয় পশ্চিম-পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করেন ৪৭৬ কোটি টাকা। এই অঙ্কের মধ্যে ৪৬৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য এবং পূর্ব-বাংলার জন্য মাত্র ১১ কোটি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সামরিক বাজেটের ৯৮·৯৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং মাত্র ১·০৫ শতাংশ পূর্ব-বাংলার জন্য। দেশরক্ষা ব্যবস্থায় বাঙালীকে আনুপাতিক স্থান দেওয়ার জন্য প্রবল আন্দোলনের পরও যে এ সম্বন্ধে পিণ্ডি-চক্র কোন ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেনি, তার নিদর্শন ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট। এই বছর পাকিস্তান সরকার ডিফেন্স বাজেটে

১০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এবং তার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নগণ্য পরিমাণ ১ কোটি টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য। অর্থাৎ এ বছরের সামরিক বাজেটের ৯৯.১ শতাংশ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এবং করুণা করে পূর্ব-বাংলার জন্য মাত্র .৯ শতাংশ। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দুজন ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানী কোন মিলিটারী অফিসারকে মেজর-জেনারেলের চেয়ে উচ্চতর কোন পদমর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাঁদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন নামেই পূর্ব-পাকিস্তানী—তিনি প্রকৃত পক্ষে উর্দুভাষী। অপরজন মেজর-জেনারেল মজিদ। তিনি ১৯৫০ সালে মেজর-জেনারেল হন এবং তিনি মেজর জেনারেল আয়ুব খানের চেয়েও সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একটি অবিশ্বাস্য অভিযোগ এনে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তিনি নাকি ইরাকের বাদশাহ ফয়জলের পাকিস্তান সফরের সময় তাঁকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানী আরেকজন উচ্চপদধারী অফিসার কর্নেল উসমানীর (যার যথাসময়ে জেনারেল হওয়া উচিত ছিল) প্রোমোশন কোন অজ্ঞাত কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়। কমোডর রশিদের এ্যাডমিরাল মর্যাদায় উন্নীত হয়ে পাকিস্তানে নৌবাহিনীর প্রধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁকেও অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করে একটি অসামরিক পদে নিযুক্ত করা হয়।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে কর্নেল কুদ্দুস ও লেঃ কর্নেল কলিমুল্লাহ্ নামে পশ্চিম-পাকিস্তানের দুজন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে সেনা-নিয়োগ ও প্রতিরক্ষা-প্রচারের একটি দল পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। তাঁরা ১৯শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকালটির ডীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-সমাবেশে মন্তব্য করেন যে সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানী অর্থাৎ বাঙালী অফিসারের সংখ্যা শতকরা পাঁচ জন মাত্র। এই অনুপাতে

সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেও যে পূর্ব-পাকিস্তানীদের সংখ্যা কত নগণ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শুধু সেনাবাহিনীতেই নয় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের সংখ্যাল্পতা প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই প্রতীয়মান হতে পারে।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের যে শীতকালীন অধিবেশন হয়েছিল তার প্রথম দিনই সরকার-দলীয় সদস্য জনাব মহতাবউদ্দীন (রাজশাহী) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সংখ্যা জানাতে গিয়ে বলেন যে দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৮·১ ভাগ—পশ্চিম-পাকিস্তানীদের ৯১·৯%।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিচার চলবার সময়ও তাঁর উকিল জনাব জহিরুদ্দিনও পাকিস্তানের উভয় দেশের মধ্যে পর্বত-প্রমাণ বৈষম্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে একই তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রাক্তন স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী, নুরুল আমীন, শাহ আজিজুর রহমান, মজিউর রহমান প্রভৃতি বিরোধী-দলভুক্ত নেতারা দেশরক্ষা-দপ্তরে চাকরিতে আন্ত-আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষময় ফলাফল সম্পর্কে একাধিকবার হুঁশিয়ারি জানান।

মাহফুজা খাতুন নামে রাওয়ালপিণ্ডি-প্রবাসী পূর্ব-পাকিস্তানের এক বিশিষ্টা মহিলা সমাজ-কর্মী ঢাকার জনপ্রিয় 'দৈনিক সংবাদে' একটি পত্রযোগে অভিযোগ করেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যে সামান্য ক'জন পূর্ব-বঙ্গবাসী আছেন তাঁদের কিন্তু উপর মহলে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিদিন রেডিও-পাকিস্তান থেকে যে বিশেষ ফওজি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে. তা পশ্চিম-পাকিস্তানে তো বটেই, পূর্ব-

পাকিস্তানেরও প্রতিটি কেন্দ্রে শুধু উর্দু ভাষাতেই প্রচারিত হয়। বাংলার জন্য এক মিনিটও বরাদ্দ নেই। পত্রলেখিকা মন্তব্য করেছেন—তাই স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে আমাদের সৈনিকরা সবাই কি উর্দুভাষী ?

১৯৬৬ সালের জুন মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধীদলীয় সদস্য ডাঃ আলিম-আল-রাজী পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্রের ২৩৮নং ধারা সংশোধন করবার দাবী জানিয়ে আশঙ্কাকুল কণ্ঠে বলেন যে এই ধারা অনুযায়ী দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে অন্তত লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল অথবা তার সম মর্যাদা সম্পন্ন কোন সামরিক কর্মচারী হতে হবে—কিন্তু শাসনতন্ত্রের এই অদ্ভুত বিধানের ফলে এক-আধ বছর নয়—আগামী দুই দশকের মধ্যেও কোন পূর্ব-পাকিস্তানীর দেশরক্ষা মন্ত্রী হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ রাজী আরও মন্তব্য করেন যে দেশরক্ষা মন্ত্রীকে প্রাক্তন বা কর্মরত জেনারেল হতে হবে, বিশ্বের কোথাও এ ধরনের বিধির নজির নেই। তিনি প্রশ্ন তোলেন : পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের ছেলে জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতীয় সেনবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু কোন পূর্ব-পাকিস্তানী সুদূর ভবিষ্যতেও তাঁর দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা সেনাবিভাগের প্রধান হবার কথা কল্পনা করতে পারেন কি ?

পাকিস্তানে এ ব্যাপারে বাঙালীদের অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে খানিকটা প্রশমিত করবার আশায় নেহাতই লোক-দেখান ভাবে 'বেঙ্গল টাইগার্স' বা 'বঙ্গ-শার্দূল' নামকরণ করে একটি রেজিমেণ্ট গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সে দেশের মানুষের জিজ্ঞাসা এই শার্দূলদের মধ্যে বঙ্গজ ক'জন ?

১৯৬৬ সালের জুন মাসে মহাসমারোহপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর লড়াইয়ে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিতে চট্টগ্রাম শহরের চাবি বঙ্গ-শার্দূলদের হাতে অর্পণ করে পূর্ব-পাকিস্তানের

জি. ও. সি. মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান তাঁদের স্তুতিবাদ করে বলেন যে পূর্ব-বঙ্গ রেজিমেণ্টের অসামান্য সাফল্যে সারা দেশ-জাতি গর্বিত ও আনন্দিত।

শূন্যগর্ভ তোষণপর্বের এখানেই শেষ নয়—সরকারী প্রচার-যন্ত্র বঙ্গ-শার্দুলদের বন্দনায় সুললিত বীরগাথা রচনা করে দিগ্‌বিদিগ দুন্দুভিত করে তুললেন।

এরকম একটি কাব্যসৃষ্টির যে বঙ্গানুবাদ সরকার-পোষিত শায়েররা করেছিলেন তার অংশ-বিশেষ উদ্‌ধৃত করছি :

ক্ষুরধার তরবার বজ্রফণা
পূর্ব-পাকিস্তানী অগ্নিকণা
তাহাদের জানাই সালাম।
নির্ভয়ে গেল তারা শত্রু দলে
দুর্জয় হোল তারা বাহুর বলে
পূর্ব-পাকিস্তানী অগ্নিকণা
তাহাদের জানাই সালাম।

ধানের গানের দেশ তোদের জানি
এই বাহাদুর কেশ দেখে অবাক মানি
মুজাহিদী হাতে হায়দারী তলোয়ার
বিজয়মাল্য নিল তারা জিনি
পূর্ব-পাকিস্তানী অগ্নিকণা
তাদের জানাই সালাম॥

কিন্তু তাঁদের স্তুতিবাদের প্লাবনে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা হাবুডুবু খাবেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের প্রচার-বিষারদদের এই আশায় ছাই দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'পূর্ব-পাকিস্তানী অগ্নি-কণাদের' মধ্যে কটি কণার উদ্ভব বাংলার মাটিতে। কিন্তু জবাব মেলেনি তার।

বাস্তবক্ষেত্রে পাক-সেনাবাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের যোগদান কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যাহত হচ্ছে তার একটি বিশদ বিবরণ কিছুদিন আগে ঢাকার একটি ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সব পরীক্ষা নেওয়া হয় তাতে অংশ গ্রহণেচ্ছুদের জন্য আবেদন-পত্রের ফরম্ পর্যাপ্ত সংখ্যায় পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত রিক্রুটিং সেণ্টার-গুলিতে প্রায়ই সরবরাহ করা হয় না। এছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনিকাল ইত্যাদি বিভাগে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত সার্ভিস কমিশনে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদনপত্রের ফরম্ সব নিয়োগ-কেন্দ্রে পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞাপিত হলেও কার্যত দেখা যায় যে প্রতি একহাজার প্রার্থীর জন্য ফরম্ দেওয়া হয়েছে মাত্র দশ-বারো খানা। বহু ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে দরখাস্তের কোন ফরম্ প্রদেশের রিক্রুটিং কেন্দ্রগুলিতে একেবারেই এল না বা যখন একটানা দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে আবেদন-পত্র প্রার্থীদের হস্তগত হোল তখন রাওয়ালপিণ্ডির হেড-কোয়ার্টার্সে তা গ্রহণের সর্বশেষ দিনটি অতিক্রান্ত প্রায়, যদিও প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিতেই সর্বদাই বেশ ফলাও করে ঘোষণা করা হয় যে ফরমগুলি প্রদেশব্যাপী সব নিয়োগকেন্দ্র ও প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাওয়া যাবে।

দৈনিক সংবাদ 'সামরিক বাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের যোগ্য প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে'-শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'সামরিক বাহিনীর সকল শাখায় পূর্ব-পাকিস্তানীদের যথাযোগ্য সুযোগ দানের দাবীটি সঙ্কীর্ণ মনোভাব-প্রসূত অন্যায় আবদার নয়—একটি অতি ন্যায্য দাবী।'

কিন্তু যখনই এবং যতবারই এ সমস্যাটির কথা রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তিনি দার্শনিক সুলভ উত্তর দিয়ে বলেছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক
ততক্ষণ সে কোথাকার পূর্ব কি পশ্চিম-পাকিস্তানের সে প্রশ্ন অবান্তর

ভাবখানা এমন যেন তাঁরা সমদর্শিতার প্রতিমূর্তি। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর বোধ হতে পারে কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে তা নয়—কারণ তাঁরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছেন যে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্যক্তিরাই পাকিস্তানী বলে গণ্য হচ্ছেন—পূর্বাঞ্চলীয়রা নয়।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর তল্পীবাহকরা অহরহ নানা অজুহাত সৃষ্টি করে সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব না থাকার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। তাঁরা সচরাচর যে সব আজব যুক্তি উপস্থাপিত করেন তা হোল, বাঙালীরা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি, সামর্থ্য ও মানসিক দৃঢ়তার অধিকারী নয়—পূর্ব-পাকিস্তানীরা সৈনিক বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহী নয় ইত্যাদি নানা সব উদ্ভট কথা।

আয়ুব সরকারের লেজুড়ধারী সংবাদপত্র 'দৈনিক পাকিস্তান' পারিষদ্ কহে শতগুণ নীতি অনুসরণ করে মন্তব্য করেন: 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে বাঙালীরা এতদিন তেমন বাঞ্ছনীয় সংখ্যায় যোগদান করে নাই—বাঙালীরা অধিক সংখ্যায় যোগদানের অন্তরনিহিত প্রেরণা ও উৎসাহ অনুভব করে নাই।' অর্থাৎ সোজা কথায় দৈনিক পাকিস্তানের মতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিজেদেরই দোষ—সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে তাদেরই তো অনীচ্ছা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাক-সেনাবাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের সংখ্যাল্পতার মূল হেতু অনেক গভীরে নিহিত।

পাকিস্তানের বর্তমান জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিচিত্র মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন।

এ গোষ্ঠীর মুখ্য নট প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বাঙালীদের যোগ্যতা বিষয়ে কি ধারণা তার খানিকটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক:

মহম্মদ আহমেদ নামে এক পাকিস্তানী কর্নেল 'মাই চীফ' শীর্ষক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের যে জীবন-চরিতটি প্রণয়ন করেছেন তাতে তিনি

সকৌতুকে বর্ণনা দিয়েছেন যে ১৯৪৮ সালে যখন মেজর জেনারেল আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তানের জি. ও. সি. তখন তিনি সে প্রদেশের অধিবাসীদের মনে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে জেলায়-জেলায় সামরিক কুচ-কাওয়াজের ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ আয়ুব সাহেব নাকি আবিষ্কার করেছিলেন বাঙালীরা এতই কাপুরুষ ও নির্বীর্য যে তারা দূর থেকে কোন সৈনিক দেখতে পেলে বা এমন কি পটকার আওয়াজ শুনতে পেলেও পড়ি-মরি করে পালিয়ে যায়।

১৯৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক শীতার্ত রাত্রে লণ্ডন নগরীতে ডরচেস্টার হোটেলে বসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আয়ুব খান 'পাকিস্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যত সমস্যাবলীর উপর একটি জিনিস রচনা করেছিলেন।

এই থিসিসে পূর্ব-পাকিস্তানীদের বিষয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ অভিমত তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে বাঙালীরা মূলতঃ ভীরু এবং তাদের মধ্যে পদানত-জাতি-সুলভ ন্যাকারজনক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান পুরোমাত্রায়।

পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের শৌর্য বা ক্ষমতার প্রতি প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যতই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করুন না কেন, তিনি ও তাঁর জঙ্গী সাকরেদরা তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে পূর্ব-বাংলার রাজনীতি সচেতন, জাত্যাভিমানী, প্রগতিবাদী ও সঙ্ঘবদ্ধ জনতা সম্পর্কে সজাগ ও সদা সতর্ক—তাই তারা বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে তাঁরা হয়ত মাঝে-মাঝে বিস্মৃত হন যে 'পূর্ব-পাকিস্তানী-অগ্নিকণারা যে-কোন মুহূর্তে স্ফুরিত হয়ে উঠতে পারে।'

পাক-ভারত যুদ্ধ ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রসঙ্গ যখন এসে পড়ল, তখন যুদ্ধবিরতি ও ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাসখণ্ড

চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও পাকিস্তানে যে বেপরোয়া সমর-সজ্জার আয়োজন হচ্ছিল সে বিষয় এখন কিছু বলছি :

১৯৬৬ সালের জুন মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব উকাইলি গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে পাকিস্তানের নয়া বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে কিঞ্চিৎ ব্যয় সঙ্কোচ ভারতের প্রতি তাঁর দেশের সদিচ্ছামূলক মনোভাবেরই পরিচায়ক। অবশ্য একমুখে এই সদিচ্ছার কথা বলে পরক্ষণেই হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও—যা পাকিস্তানের জঙ্গী-শাহীর মন্ত্রী প্রবরদের স্বভাবসিদ্ধ—বাধেনি উকাইলি সাহেব বা তাঁর সাঙ্গাতদের।

যেমন পাক-প্রেসিডেন্টের সুযোগ্য পুত্র ক্যাপ্টেন গহর আয়ুবও ভারতের উদ্দেশ্যে একপ্রস্থ নিন্দাবাদ মিশ্রিত উপদেশ বর্ষণ করে বলেন যে তাঁদের প্রতিরক্ষা খাতে খরচ খানিকটা কমান হোল সেটা মন্দ কথা নয়, কিন্তু পাকিস্তানকে সামরিক শক্তিতে হিন্দুস্থানের সমকক্ষ হতেই হবে—প্রতিটি হিন্দুস্থানী কামানের জন্য চাই একটি পাকিস্তানী কামান, প্রতিটি হিন্দুস্থানী জওয়ানের জন্য একটি পাকিস্তানী জওয়ান।

সরকার দলভূক্ত একজন পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতা সে বছরই ১৪ই জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে জ্বালাময় ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়ে ততোধিক নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘোষণা করেন : আমরা পাকিস্তানীরা বরঞ্চ চানা-মটর ভক্ষণ করে গ্রাসাচ্ছদন করব, তবুও আমাদের পহেলা নম্বরের দুষমন হিন্দুস্থানের সঙ্গে লড়তে পেছপাও হবো না।

পাক-নেতারা প্রতিরক্ষাখাতে কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করেই (অবশ্য পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এই তথাকথিত ব্যয়সঙ্কোচকে এক ভাঁওতা বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর তাদের ওপর যে বিশেষ প্রতিরক্ষা কর চাপান

হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে)—দিক্‌বিদিকে বাহবা কুড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছেন, কিন্তু ভারত যে মাত্র সেদিনও এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে এবং এর আগেও বহুবার উভয় দেশের সৈন্য সংখ্যা ও সমরায়োজন হ্রাস করবার প্রস্তাব পাকিস্তানের সকাশে করেছিল—যাতে প্রেসিডেন্ট আয়ুব সম্মত হলে এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা খাতে আরও অনেক বেশী ব্যয়সঙ্কোচ করতে পারত—সে কথা ভুলেও উচ্চারণ করেননি।

বরঞ্চ ভারতের এ উদার প্রস্তাবের জবাবে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ৩রা এপ্রিল (১৯৬৬) পূর্ব-পাকিস্তান সফরান্তে লাহোর বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেই বলেন: 'কাশ্মীর সমস্যার ফয়সলা হবার পূর্বে পাকিস্তান এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তাও করতে পারে না।'

এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর শাসকচক্রের মনোভাবের প্রতিফলন করে সরকার-নিয়ন্ত্রিত "দৈনিক পাকিস্তান" লেখেন: 'ভারতের সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবটি আরেকটি প্রতারণামাত্র। পাকিস্তান কখনও এর খপ্পরে পড়িবে না।' (সম্পাদকীয় : সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নে—৬।৪।৬৭)।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব যেন ভারতের এই আন্তরিক প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ১৮ই এপ্রিল (১৯৬৬) রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চতম পর্যায়ের অফিসারদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে এক-নাগাড়ে হিন্দুস্থানী জুজুর ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন: পাকিস্তানকে যে-কোন প্রকারে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে। এজন্য যে কোন সম্পদ তা যতই দুর্মূল্য হোক না কেন দেশ যোগাবে।

প্রতিরক্ষা বাজেটে নামমাত্র ব্যয়-সঙ্কোচ করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বহির্বিশ্বে জনমতকে তার স্বপক্ষে যতই প্রভাবিত করার চেষ্টা করুক না কেন, তারা যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না এবং নিজেদের

সামরিক শক্তি সীমায়িত রাখতে চায় তবুও বাস্তব অবস্থা এই যে গত পাক-ভারত লড়াই-এর পর থেকে পাকিস্তান সর্বপ্রকার উপায়ে, সম্ভাব্য সব সূত্রে নিরন্তর সামরিক-শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির যে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই পূরণ করা ছাড়াও তার শক্তি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে—তার সমরযন্ত্রকে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী করে তুলেছে।

একমাত্র পশ্চিম-পাকিস্তানেই নতুন পাঁচটি ডিভিশন গঠন করা হয়েছে—এর মধ্যে একটি সাঁজোয়া।

বিগত সংঘর্ষে পাকিস্তান বহুসংখ্যক প্যাটন-ট্যাঙ্ক, F-104, সুপারসনিক জেট, F-86 জঙ্গী বিমান হারিয়েছিল—অবশিষ্ট যেগুলি ছিল তার একটি বিরাট অংশ সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছিল। অবশ্য মার্কিন যন্ত্রাংশ পাকিস্তানের অনায়াসলব্ধ হওয়ায় সহজেই তাদের সাঁজোয়া বাহিনীর অকেজো মারণাস্ত্রগুলিকে এবং বিমান বহরের পঙ্গু বিমানগুলিকে মেরামত করে যুদ্ধোপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

পাকিস্তানের বড় মুরব্বী চীন ১৯৬৬ সালের প্রথম থেকে দেড় বছরের মধ্যে পাকিস্তানকে অন্তত দুটি পদাতিক ডিভিশনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, শ-আড়াই ট্যাঙ্ক, ১২০টি Mig-15 ও Mig-19 বিমান ও দুই স্কোয়াড্রনের উপযোগী IL-28 বোমারু বিমান সরবরাহ করে। এছাড়াও তারা দিয়েছে বহু কামান, গোলা ও বিমানের যন্ত্রাংশ।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব শুধু চীনের উপর ভরসা করেই ক্ষান্ত থাকেননি—তিনি ইরান, তুরস্ক, সৌদী আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক আঁতাত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অস্ত্রের জন্য সারা ইউরোপও তিনি চষে বেড়িয়েছিলেন।

কম্যুনিস্ট বিরোধী সামরিক জোটের সরিক হিসাবে পাশ্চাত্য কয়েকটি শক্তিশালী দেশ থেকে ইরান ও তুরস্ক যে অস্ত্র-শস্ত্র ও

সামরিক যন্ত্রপাতি পাচ্ছিল তার একটা বড় অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তানে।

এই প্রসঙ্গে F-86 স্যাবার জেট বিমান নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয়েছিল সে কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশ্চিম জার্মানী NATO-র সহ-সদস্য ক্যানাডা থেকে এই ধরনের বিমান নিজের জন্য সংগ্রহ করে তার উপর পাকিস্তান বিমান বহরের প্রতীক চিহ্ন এঁকে ইরাণের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। যখন এই গুপ্ত পথে ক্যানাডার বিমান পাকিস্তানে হস্তান্তরিত হবার ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ল তখন ইরাণ নিজের মুখ বাঁচানর জন্য সাফাই গেয়েছিল যে এই বিমানগুলি তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মেরামতির জন্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল।

১৯৬৭ সালে জানুয়ারীর প্রথম দিকে পাকিস্তানের ছজন সেনাধ্যক্ষ গোপনে সৌদী আরব সফরে গিয়েছিলেন বাদশাহ ফয়জলের মাধ্যমে ও অর্থানুকূল্যে পশ্চিমী সমর-সম্ভার সংগ্রহের ধান্দায়।

পাকিস্তান তার নৌবহরের শক্তিবৃদ্ধি করতেও নিশ্চেষ্ট নেই। বিশেষ করে অধিক সংখ্যায় সাবমেরিন সংগ্রহে তারা তৎপর। ইন্দোনেশিয়ার পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পাকিস্তানকে যে চারটি ডুবোজাহাজ দিয়েছিলেন সেগুলি ছাড়াও চীন পাঠিয়েছিল তিনটি সাবমেরিন।

ব্যাপক সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি ছাড়াও পাকিস্তান তার সেনাবাহিনী সন্নিবেশের ধারায় নানা পূর্ণবিন্যাস সাধন করেছিল।

কচ্ছের রাণের উত্তরে নিয়োজিত পাক-বাহিনীর সঙ্গে আরও দুটি ডিভিশন যুক্ত করা হয়। রাজস্থান সীমান্তেও শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিম-পাঞ্জাব, অধিকৃত কাশ্মীর ও পূর্ব-পাকিস্তানে পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়।

পশ্চিম-পাঞ্জাবে যেখানে লাহোর বিপর্যয়ের কথা বিস্মৃত হতে

পাক সামরিক নেতাদের দীর্ঘ-দিন লাগবে—ইছোগিল খালকে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। যে pill-boxগুলি ভারতীয় বাহিনী ধ্বংস করেছিল সেগুলি পুনর্নির্মিত করা ছাড়াও দ্রুততর সেনা চলাচলের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নয়া সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ অঞ্চলটিকে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের দ্বিতীয় একটি ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিয়ালকোট এলাকাতেও একই ব্যবস্থা।

কোন-কোন স্থানে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার অত্যন্ত কাছাকাছি পাক-সেনা-সন্নিবেশ করা হয়। উরি-পুঞ্চ এলাকায় প্রায় রোজই বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসতো, যা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, সে অঞ্চলে নতুন রাস্তাঘাট ও সামরিক ঘাঁটি নির্মিত হচ্ছিল।

যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা ও শ্রীনগর-লাডাক যোগাযোগকারী পথের সমান্তরাল মুজাফ্‌রাবাদ-কেল রোডকে দীর্ঘতর করে স্কারদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য—যথাশীঘ্র এ সড়কটিকে সম্প্রসারিত করে চীনের সিনকিয়াং-এর সঙ্গে যুক্ত করে সরাসরি চীন থেকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম বা প্রয়োজনে চৈনিক সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা।

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট আয়ুব একটি ঢিলে দুটি পাখী বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথমতঃ বিগত যুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের এই অভিযোগ দূর করবার অজুহাতে দুটি ইনফ্যানট্রি ডিভিশন সেখানে আমদানী করা হয়। এই সঙ্গে পঞ্চাশটি চীনা ট্যাঙ্কও।

কুমিল্লায় অবস্থিত অকেজো বিমান ঘাঁটিটির সংস্কার সাধন করে সেখানে কয়েক স্কোয়াড্রন ফাইটার ও বোমারু বিমান প্রস্তুত রাখা হয়।

নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও মুজাহিদ্ বা আনসার বাহিনীর মতো আধা-সামরিক বাহিনীর সংখ্যাও তিনি দ্রুত-বাড়িয়ে চলছিলেন। এদের তালিম দিচ্ছিলেন চীনা-সমরবিদ্‌রা।

এই সর্বাত্মক সমর-সজ্জার সাফাই গাইতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট

আয়ুব ও তাঁর তল্পীবাহকরা যত্র-তত্র কাশ্মীরের বাহানা তোলেন,— কিন্তু তাঁর সমস্যা-জর্জরিত দেশে বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের সচেতন মানুষের মনে কাশ্মীর নিয়ে পুনরায় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত যে বিশেষ কোনো আবেদন সৃষ্টি করে না, তা উপলব্ধি করতে পেরে তাঁরা যত্র-তত্র ইসলামের জিগীর তুলে রণোন্মাদনা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনে এ সমস্যা কি ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকার সর্বাধিক প্রচারিত প্রগতিশীল দৈনিক ইত্তেফাক নির্ভীক মন্তব্য করেছিলেন: 'আজ জনাব আয়ুব খান এদেশের জনগণকে দেশ শাসনের উপযোগী নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করিয়া কোন্ মুখে আবার কাশ্মীরের জনসাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রাধিকার দাবী করিতেছেন বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর।

'পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষেরই যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নাই, সেখানে কাশ্মীরের জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেন তাঁহারা কোন্ মুখে?

কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের মুখ আজ কোথায় আর পার্লামেন্টারী যুগেই বা কি ছিল?

প্রকৃত পক্ষে এই কাশ্মীর সমস্যাকে ক্ষমতাসীনরা এখন হাতের পাঁচ হিসাবে গণ্য করিয়া আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা দেখে দিলে কাশ্মীর-কাশ্মীর বলিয়া বা সীমান্তে সৈন্যসমাবেশের প্রশ্ন তুলিয়া ডামাডোল সৃষ্টিতে যত্নবান হন (নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যদের বরাবরে—১২।১২।৬৪)'

পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র-ইউনিয়নের মুখপত্র "ঝড়ের খেয়া"-তে 'একুশের আহ্বান' শীর্ষক একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধে ছাত্র-নেতা সাইফুদ্দিন আহামদ্ মন্তব্য করেন: 'যুদ্ধ যে ঘটে গিয়েছে এবং সে যুদ্ধ যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আনতে পারেনি এই বাস্তবকে আমরা কি

অস্বীকার করতে পারি? এই পটভূমিতে আমাদের রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে যে কোন যুদ্ধ ঘটার নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।' (পৃষ্ঠা: ১০)।

জাতীয় পরিষদের একটি বাজেট অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরোধী সদস্য জনাব আবুল কাশেম সশ্লেষে বলেন যে পাকিস্তানের রণসজ্জা যে প্রধানতঃ ভারতেরই বিরুদ্ধে তা দেশের সকলেই বোঝেন, কিন্তু রণ-দামামা পেটানর চেয়ে কি অপর পক্ষের সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

তাঁর দেশের বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে শঙ্কাকুল করে তুলেছিল—কারণ ভারতের বিরুদ্ধে রণদুন্দুভি তাঁর জঙ্গী শাসনের মূলধন, তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের মূল উৎস।

কাজেই শেষ উপায় হিসাবে ইসলামের ধ্বনি তুলে, যখন-তখন আল্লার নামে কসম খেয়ে রণলিপ্সা জাগিয়ে তুলতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এ প্রচেষ্টা যে কত উদ্ভট পর্যায়ে গিয়ে পৌছাতে পারে তার একটি নজির হোল ২৬শে মে (১৯৬৭) লাহোরে আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলামের চতুর্থ অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের ভাষণ, যাতে তিনি শ্রোতাদের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রলাপোক্তি করেন যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের গুরুত্ব রামায়ণ-মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের থেকে কিছু কম নয়—বরঞ্চ রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের চেয়ে এই লড়াই ছিল হাজারগুণ প্রচণ্ড ও যুদ্ধ-শেষে পাকিস্তান হয়েছিল অতুল গৌরবের অধিকারী।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও ক্ষমতাশীন দলের এই সাম্প্রদায়িক ও জেহাদী অপ-প্রচেষ্টায় মদত যোগাচ্ছিল সরকারের প্রচার-যন্ত্র ও তাদের কুক্ষিগত ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলি।

উদাহরণ স্বরূপ বিভাগ-পূর্বকাল থেকেই সুপরিচিত "দৈনিক আজাদ" "এছলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বাদ" শীর্ষক একটি তীব্র প্ররোচনা-মূলক সম্পাদকীয়তে লেখেন: 'আমাদের এবাদত

বন্দিগী শ্রম সাধনা, জীবন ও মরণ সবই কেবলমাত্র আল্লার জন্য ইহাই যাহাদের প্রাণের কথা, কোন অবস্থাই তাহাদিগকে হতাশ করিতে পারে না। এই পূণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত মুছলমানের প্রাণশক্তিই হিন্দুস্থানী দুষমনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিরাপত্তার সর্বশেষ আশ্বাস-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং আজো পাকিস্তানীরা আল্লার দরবারে অবনত মস্তকে এ সুকরিয়া আদায় করিতে পারে যে ইহাই ভবিষ্যতেও পাকিস্তানের নিরাপত্তার আশ্বাস-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। সেদিন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান অত্যন্ত দক্ষতার সহিত যে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন, জাতি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সশ্রদ্ধ ও সপ্রশংস মনে স্মরণ করিবে। সমস্যার পাহাড় জাতির সামনে পড়িয়া আছে। তবে আমরা বিশ্বাস করি বীরের রক্তস্রোত বৃথা যাইবে না। কোন দুঃখ, কোন বেদনা, কোন সংঘাত, সংগ্রামই আপনাতে শেষ নহে এবং মুসলমানদের জীবনে কারবালা বারবারই আসিতেছে, আরো আসিবে। এই সঙ্গে মহাপুরুষের অমর বাণীও এ জাতির জন্য প্রেরণাস্থল হইয়া থাকিবে; এছলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বাদ!'—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

সমর সজ্জা ছাড়াও পাকিস্তানের সর্বত্র বিশেষ করে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে নানাভাবে "হিন্দুস্থানে"র বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মাদনা জাগানোর নিরলস প্রচেষ্টাকে আয়ুব-শাহীতে ক্রমেই জোরদার্ করে তোলা হচ্ছিল।

বিশেষ করে মুজফফরাবাদের "আজাদ-কাশ্মীর" রেডিও থেকে প্রচারিত "কাশ্মীর বনাম স্বরণ সিং" নামে একটি নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠানে "হিন্দুস্থান অধিকৃত কাশ্মীর"-এ মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের উদ্ভট ও অলীক অনেক কাহিনী শোনান হোত—যেমন ভারতে "বহু কাশ্মীরী" গাছের পাতা উদরস্ত করে জীবন রক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছেন বা ভারত নাকি শীগগিরই স্ব-নির্মিত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কাশ্মীরী মুসলমানদের বিনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছে।'

বেতার ছাড়া সরকার-কবলিত সংবাদপত্রগুলি এবং আয়ুবের তথাকথিত হুকুম বরদার নেতাদের নির্লজ্জ তর্জন-গর্জন তো ছিলই।

আয়ুব ও তাঁর সাকরেদদের কথাবার্তার ধরনে মনে হোত যেন ভারতের পক্ষ থেকে জম্বু ও কাশ্মীর শিশুর হাতে মোয়ার মত পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার অঙ্গীকার ছাড়া অন্য কিছুই তাদের খুশী করতে পারে না।

ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র উজীর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পদচ্যুতির মাত্র কদিন আগেই করাচী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে পাকিস্তান রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের এক অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলেন যে ভারত যদি জম্মু ও কাশ্মীর ছেড়ে দেয়, তবেই শুধু পাকিস্তান তার সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসবার কথা ভাবতে পারে।

ভুট্টোর ওজারতি সাঙ্গ করে দিলেও তাঁর কাশ্মীর-নীতির সঙ্গে আয়ুব ভিন্নমত ছিলেন এমন অনুমান করবার কোন হেতু নেই। তিনিও ১৯৬৬ সালের ১লা ও ১৪ই আগস্ট যথাক্রমে মাস-পয়লা ও আজাদী-দিবসের বেতার ভাষণে ভারত-বিরোধী জিগীর তুলে বলেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যা নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা ছাড়া পাক-ভারতের যে কোন বৈঠকই হবে ব্যর্থ ও অপ্রয়োজনীয়।

ভুট্টোর সুযোগ্য উত্তর সাধক পাকিস্তানের নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ শরীফউদ্দীন পীরজাদাও কম যাননি। ১৯৬৬ সালের ২৯শে জুলাই করাচীতে হোটেল মেট্রোপোলে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে সমবেত ইয়ার-দোস্তদের তিনি বলেন যে পাকিস্তান কাশ্মীরবাসীদের জন্য আত্মাহুতি দেবে।

আর এক পর্দা সুর চড়িয়ে আজাদ-কাশ্মীরের ক্রীড়নক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ খান হুঙ্কার দেন যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা না হলে কস্মিনকালেও উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

পাকিস্তানের কাশ্মীর দপ্তরের উজীর চৌধুরী আলী আকবর খান

পেশোয়ারের চক ইয়াদগারে এক মিলাদ্-মহাফিলে ইসলামের নামে জেহাদী-জিগীর তোলেন, 'রসুলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। ইসলামের জন্য জান-মাল কোরবানি করুন। কাশ্মীরী মুসলমান ভাইদের আমরা উদ্ধার করবই।'

চরম প্রতিক্রিয়াশীল ইংরাজী দৈনিক "মর্নিং নিউজ" ১৫ই জুলাই (১৯৬৬) এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে কাশ্মীরী ভাইদের প্রতি অভয়বাণী উচ্চারণ করেন, 'সূর্যালোকের তমহরণের মতই হিন্দুস্থানের কবজা থেকে কাশ্মীরের মুক্তিও অবধারিত।'

"আজাদ" ২০শে জুলাই (১৯৬৬) দেশবাসীকে উপদেশ দেন যে কাশ্মীর প্রসঙ্গে আশার আলো জ্বালাতে হলে নয়া পথ ও পদ্ধতির কথা ভাববার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।'

৯ই আগস্ট ১৯৬৬ তারিখে (আয়ুব তখন পূর্বাঞ্চল সফরে ঢাকায় ছিলেন) সারা পাকিস্তানে 'আবদুল্লা দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়ে শেখ সাহেবের জন্য দরদের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়।

এর কদিন আগেই "কাশ্মীর শহীদ দিবস" পালন করে "সামাল-সামাল" রব তুলে বলা হয় 'হিন্দুস্থান পাক-ওয়াতনের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে—হুঁশিয়ার।'

আয়ুব-শাহী ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষ করে কাশ্মীর প্রসঙ্গে মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে স্পষ্টতই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল—

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত ও গতি বিপথগামী করা;

(খ) পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়াও পশ্চিম-পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান আয়ুববিরোধী জনমতকে প্রশমিত করা;

(গ) সারা পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক যুদ্ধায়োজন করা।

নানা ডামাডোলের মধ্যে ভারতে অনেকেরই হয়ত দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল যে ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি পাক-সেনাবাহিনীর সর্ববিভাগে নতুন লোক নিয়োগের ব্যাপক হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। জেলা

ও মহকুমা শহরগুলিতে—এমন কি বড় বড় গ্রামেও সৈনিক জীবনের বিভিন্ন আকর্ষণ, সম্মান ও মহত্বের কথা উদ্দীপ্ত ভাষায় ও চিত্রে বর্ণনা করে সুদৃশ্য পোস্টার এবং সংবাদপত্রগুলিতে বৃহদাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল—প্রচারিত হচ্ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান।

লক্ষণীয় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও উপজাতি প্রধান স্থানগুলিতেই সেনা সংগ্রহ অভিযান ব্যাপকতর করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—বান্নু, কোহাট, পেশোয়ার ও লাণ্ডিকোটালে চারটি বিশাল ফৌজী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আংরেজী জমানা চালু থাকবার সময় যেভাবে এ ফৌজী মেলাগুলির আয়োজন করা হোত—যাতে উপজাতীয় সর্দাররা বৃটিশ সেনা বাহিনীতে দলে দলে যোগ দেবার জন্য তাদের জাত-ভাইদের প্রলুব্ধ করত—এবারও অনেকটা সে ধরনেই এই জওয়ানি-মীনাবাজারের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল।

উপজাতীয় অঞ্চলে সেনা সংগ্রহ প্রচেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব বড়লাটি কায়দায় ১৯৬৬ সালের ১লা জুন কোয়েটায় ও ৩রা জুন কালাত বিভাগের মাস্তুং-এ দুটি উপজাতীয় দরবার (tribal durbar) বসিয়ে তাতে ততোধিক জবরদস্ত কায়দায় পৌরোহিত্য করেছিলেন।

পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবজ্ঞা ও বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কথা আজ দুনিয়ার কোথাও অজ্ঞাত নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুব হঠাৎ তাঁদের তোয়াজে প্রায় বেসামাল হয়ে বলেন, 'দেশরক্ষা ও কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একযোগে আপনাদেরও লড়তে হবে। আপনাদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের জন্য আমরা গর্বিত।'

আয়ুবের ক্রীড়াপুত্তলি তথাকথিত দুই উপজাতীয় নেতা সর্দার মোহম্মদ খান জোগেজাল (কোয়েটা) ও মীর মোহম্মদ ইয়ার খান (কালাৎ) প্রভুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে যুদ্ধের জিগীর তুলে বলেন—

'কাশ্মীর উদ্ধারের সংগ্রামে আমাদের মহান নেতা আয়ুব খান সাহেবকে মদৎ দিতে পিছিয়ে থাকবো না।'

সেপ্টেম্বরের ব্যর্থ অভিযানের পর আয়ুব উপলব্ধি করেছিলেন যে কাশ্মীর উপত্যকায় সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমেরিকান পদ্ধতির চেয়ে চীনা গেরিলা কৌশল অনেক বেশী কার্যকর। সুতরাং তিনি পিকিং-এ তাঁর চীনা সাকরেদদের আনুকূলে প্রভূত সংখ্যায় চীনা-সমরশিক্ষাবিদ্‌দের পাকিস্তানে এনে জড়ো করেছিলেন। উদ্দেশ্য দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পাকিস্তানী জওয়ানদের গেরিলা লড়াই-এর রীতিনীতিতে তালিম দেওয়া।

'আজাদ কাশ্মীর' ও তার আশেপাশে আটটি 'শিক্ষা-শিবির' স্থাপন করে দলে-দলে যুবকদের 'লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর' এই জেহাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়েছিল। এমন কি, আজাদ-কাশ্মীরের প্রেসিডেণ্ট আবদুল হামিদ খান প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কাশ্মীরী যুবকদের জঙ্গীবিদ্যা অর্জনের জন্য হাজারে-হাজারে চীন দেশে পাঠান হোক।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের হুন্‌জা (HUNZA) ও বালটিস্তান (BALTISTAN) এলাকায় চীনা সমরকুশলীরা অত্যন্ত কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের হুন্‌জা ও চীনের ইয়ারখণ্ডের (YARKAND) মধ্যে সুপ্রাচীন যাত্রী-সড়কটি পুনরায় উন্মুক্ত করার ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব ধারণ করেছিল। নিঃসন্দেহে এ পথ দিয়ে চীন বহির্বিশ্বের অগোচরে যে কোন ধরনের সমরসম্ভার পাকিস্তানে রপ্তানী করতে সক্ষম।

চীনারা যে হারে পাকিস্তানে শুভেচ্ছা মিশন পাঠিয়ে দেশের দুই অংশে যত্রতত্র ভারতের বিরুদ্ধে অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা বর্ষণ করে যাচ্ছিলেন (যার প্রতিটিতে কাশ্মীরই ছিল মুখ্য প্রসঙ্গ), তাতে পাকিস্তানের কাশ্মীর-রাজনীতিতে তাদের কুচক্রী ক্রিয়াকলাপ ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

চীনে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিধ্বস্ত—কিন্তু চীনা

উলেমাদের একটি দলকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাকিস্তানে পাঠান হয়েছিল। দলপতি হাজী শেখ মোহাম্মদ আলী চাংচী একাধিক বক্তৃতায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গালভরা বুলি আউড়ে বলেন যে হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত 'কাশ্মীরী মুসলমান' ভাইদের শুধু তাঁদের সমর্থন নয়, প্রীতি ও সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যেও তাঁরা এ সফরে এসেছেন।

কম্যুনিস্ট চীনের সেক্যুলার ভাবাদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আশ্বাস-বাণী শোনান, 'আমরা আপনাদের সহযোগী সহকর্মী—বিপদে আপদে আপনাদের পাশে পাশেই আছি। কাশ্মীরে হিন্দুস্থানীদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হবেই হবে।'

পিকিং-এ 'আফ্রো-এশিয় লেখক সম্মেলন-এর নামে অনুষ্ঠিত একটি প্রহসনে চীনের পদলেহী তথাকথিত এক লেখক গোষ্ঠী সাড়ম্বরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন, 'এই সভা আন্তরিকভাবে কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করে।'

যুদ্ধের কিনারে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের আস্ফালন যে কতো বিপদজনক হতে পারে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে এ উপমহাদেশের কোটি-কোটি মানুষের হয়েছিল। সুতরাং পাকিস্তানের জঙ্গীশাসক চক্রের মতিগতি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ভারতের ছিল।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানে যে সব ভারতীয় নাগরিক এবং পশ্চিম-বঙ্গে যেসব পাকিস্তানী নাগরিক ছিলেন তাঁরা সকলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায়, তাঁরা নিজ-নিজ দেশে ফিরতে পারছিলেন না। অনেকে শত্রু দেশের নাগরিক হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে বা পশ্চিম-বঙ্গে অন্তরীণও হয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালের শেষাশেষি ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একটা সমঝোতায় এলেন যে, সে বছর ৩০শে ডিসেম্বর থেকে পশ্চিম-বঙ্গের হরিদাসপুর (বনগাঁর কাছে) এবং পূর্ব-পাকিস্তানের যশোর জেলার বেনাপোলের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং এই সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে উভয় বঙ্গে অবরুদ্ধ ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাগরিকরা ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে স্বদেশে ফিরতে পারবে।

এই ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৬৫) হরিদাসপুর—বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের কিছু সংখ্যক কর্মচারী তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে পশ্চিম-বঙ্গে এলেন। এর আগের দিন অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের বহু কর্মচারী সপরিবারে ঐ একই সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। দুই দেশের হাই কমিশন-কর্মীদের এই গমনাগমনের ব্যাপারে বলা হচ্ছিল যে এঁরা অধিকাংশই ভিসা ও মাইগ্রেশন বিভাগের কর্মী এবং এঁদের অনেকেরই কার্যকালও শেষ হয়েছে বা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ বা যাতায়াত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার দরুণ ভিসা বা মাইগ্রেসন সংক্রান্ত কর্মীদের কোন কাজই নেই,—সুতরাং তাঁদের যার যার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে

৩১শে ডিসেম্বর খুব ভোরে আমি শিয়ালদা স্টেশন থেকে বনগাঁর গাড়িতে উঠলাম। বনগাঁ থেকে যশোর রোড ধরে হরিদাসপুর সীমান্তে যাওয়া যায়। স্টেশনে দেখলাম যে ঐ ট্রেনের জন্য খুব ভীড়। অধিকাংশই যাচ্ছেন বনগাঁ হয়ে হরিদাসপুর সীমান্তে। যাত্রীদের মধ্যে মুসলমান আছেন কিন্তু সপরিপারে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। তাঁরা সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক। পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় কলকাতা ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়েছিলেন—এখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম-বঙ্গে এসেছিলেন নানা সাময়িক কার্যোপলক্ষে—আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে,

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে এসেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গা পূজার আগে ও পরে পশ্চিম-বঙ্গে কিছুদিন কাটাতে। পাকিস্তানগামী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল যাঁর ছেলেমেয়েরা পশ্চিম-বঙ্গে থাকেন। ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করেন, মেয়েদেরও বিয়ে হয়েছে এদিকে, কিন্তু ভদ্রলোক নিজে ও বৃদ্ধা স্ত্রী পাকিস্তানেই থাকেন। সেখানে তাদের বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তি আছে, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর ছোট ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করবার জন্য। পশ্চিম-বঙ্গ থেকে পূর্ব-বঙ্গে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন এরকম কয়েকটি বর বা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ করতে পূর্ব-বঙ্গে গিয়েছিলেন এরকম কয়েকটি পুত্রও পাকিস্তানে আটকে পড়েছিলেন।

যুদ্ধের সময় যে সব হিন্দু পাকিস্তানী নাগরিক এখানে আটকা পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁদের পরিবারস্থ অনেকে বা অন্য সকলেই হয়ত পাকিস্তানেই ছিলেন। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে দু-দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এঁরা বা পাকিস্তানে এঁদের আত্মীয়স্বজন পরস্পরের কোন খবরাখবর পাননি—দু-চারজন হয়ত বহু কষ্টে রেডক্রশ বা বিদেশ মারফত চিঠিপত্র বা সংবাদ আদান-প্রদান করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। দারুণ দুর্ভাবনায় এঁদের বা দেশে এঁদের স্বজনদের দিন কেটেছে। অনেকে পাকিস্তান থেকে আসবার সময় তাঁদের স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কারো কাছে নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য খরচ-পত্রের টাকা রেখে এসেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় দেশে তাঁরা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। অনেককে বাধ্য হয়ে গয়নাগাঁটি বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী—এমন কি বাড়ির আসবাবপত্রও বিক্রি করতে হয়। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের থেকে ঋণ করতে হয়। তবে অনেকেই তাঁদের প্রতিবেশী বাঙালী মুসলমানদের থেকে আত্মীয়সুলভ ব্যবহার পেয়েছিলেন—

তাঁরা সর্বদা এঁদের খোঁজখবর করেছিলেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের অসহায় অবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

বনগাঁর ট্রেনে কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁরা পাকিস্তানী নাগরিক—ভারত ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এঁদের কয়েকজন কলকাতায় বিভিন্ন অফিসে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, কারও কলকাতায় বই-বাঁধাই-এর ব্যবসা ছিল বা শিয়ালদা বাজারে দোকান ছিল। যাঁরা চাকরি করতেন তাঁরা পাক-ভারত লড়াই সুরু হবার পর কর্তৃপক্ষের থেকে চাকরি খতম হবার নোটিশ পেলেন—তাছাড়া নিজ-নিজ থানা এলাকার বাইরে না যাবার নির্দেশও পেলেন পুলিশ দপ্তর থেকে। যাঁদের চাকরি খোয়াতে হয় তাঁদের অনেকেই বহু বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন এবং তাঁদের নিয়োগকারীদের ইচ্ছা ছিল না যে বিনাদোষে সহসা তাঁদের বরখাস্ত করা হোক, কিন্তু সরকারী হুকুমনামার বিরুদ্ধে তাঁদের করবার বিশেষ কিছু ছিল না। একই ব্যাপার ঘটেছে পাকিস্তানেও।

সেপ্টেম্বরের যে পাক-নাগরিকদের চাকরি গেল তাঁদের এর পরও কলকাতায় মাস তিন-চার থাকতে হোল বিনা উপার্জনে। সে সময় তাঁদের অনেককেই অন্ন জুগিয়েছিলেন বর্তমানে কলকাতায় বসবাস-কারী এককালে তাঁদের গ্রামবাসী হিন্দু প্রতিবেশীরা, যাঁরা অবশ্য বহু দিন হোল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে এখন পশ্চিম-বঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়েছেন। তাঁরা চিরকালের জন্য পাকিস্তান ত্যাগ করে চলে এলেও তাঁদের গ্রামকেও ভোলেননি, গ্রামের মুসলমান প্রতিবেশীদেরও ভোলেননি। শিয়ালদা স্টেশনে সেদিন তাঁদের দেশের মুসলমান বন্ধুদের বিদায় জানাতে অনেক হিন্দু ভদ্রলোক এসেছিলেন এবং তাঁরা অনেকে নাম করে করে গ্রামের মুসলমান প্রতিবেশীদের সালাম জানাতে বলছিলেন, যদিও তাঁদের সঙ্গে এঁদের হয়ত কোনোদিনও আর দেখা হবে না, শুধু স্মৃতিতেই

তাঁদের ছেড়ে আসা গ্রামগুলি আর তাদের মানুষগুলি জেগে থাকবে অম্লান হয়ে।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-বঙ্গের নানা জায়গায় বিশেষ করে কলকাতায় পূর্ব-পাকিস্তানের বহু মুসলমান নাগরিকরা যাঁরা চাকরি করতেন বা ব্যবসা করতেন তাঁরা ছিলেন পূর্ব-বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের একটা বড় যোগসূত্র। এঁরা প্রতি বছরই দেশে নিজেদের গ্রামে যেতেন এবং তাঁদের গ্রামের যে সব হিন্দুরা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে এসেছেন তাঁদের কাছে গ্রামের বার্তা ও বর্তমান গ্রামবাসীদের যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান তাঁদের শুভেচ্ছা-বাণী বহন করে আনতেন এবং দেশে যাবার সময়ও তাঁদের প্রাক্তন গ্রামবাসী হিন্দুদের শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে যেতেন। এ সব মুসলমানদের অনেকেই দেশবিভাগের আগে থেকেই কলকাতায় ছিলেন এবং কলকাতার উপরই তাঁদের জীবন ও জীবিকার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁরা দেশ বিভাগের পরও কলকাতা বা পশ্চিম-বঙ্গকে কোনও দিন বিদেশ বা শত্রুদেশ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হননি। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে তাঁদের যে অগণিত আত্মীয়-স্বজন তাঁদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁরাও কলকাতা বা পশ্চিম-বঙ্গকে নিজের জায়গা বলেই মনে করতেন, কারণ তাঁরা সচেতন ছিলেন যে তাঁদের প্রিয়জনরা বা পরিবারের কর্তারা কলকাতায় থেকেই রুজি-রোজগার করেছেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়েই।

কলকাতায় পাক-নাগরিকদের যাঁদের নিজস্ব ব্যবসা বা দোকান ছিল তাঁদের অনেকে যুদ্ধের পরও ব্যবসা চালু রেখেছিলেন সত্যি, কিন্তু তাঁদেরও নিজ-নিজ থানা এলাকার বাইরে যাবার হুকুম ছিল না— ফলে ব্যবসা-পরিচালনাতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন তাঁরা বললেন যে লড়াইর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে ভবিষ্যতে কোনও দিন তাঁরা আবার

ভারতে ফিরে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা করে খেতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এঁদের মধ্যে যাঁরা খানিকটা আশাবাদী তাঁরা বললেন যে, তাঁরা আপাততঃ কলকাতায় তাঁদের পরিচিত কারও হাতে ব্যবসার ভার দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন—ইনশাল্লা ভবিষ্যতে যদি অবস্থা আবার ভাল হয়, যাতায়াত আবার সুরু হয়, তবে তাঁরা আবার ফিরে আসবেন। কয়েকজন দেখলাম খুবই সাহসী—তাঁরা বললেন যে, 'দেশে গিয়ে যদি কিছু করতে না পারি তবে বিবি-বাচ্চাদের খাওয়াব কি—তখন হয়ত বাধ্য হয়েই আবার লুকিয়ে সীমানা পার হয়ে ভারতেই ফিরে আসতে হবে। তখন তো আর পাশপোর্ট ভিসার বালাই থাকবে না—কলকাতায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে মিশে যাব। পুলিশ আর তখন আমাদের পাত্তা পাবে কোথায়?'

এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ভারত থেকে পাক-নাগরিকদের যে পাকিস্তানে ফিরে যেতেই হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। যাঁদের ইচ্ছা তাঁরা যাবেন। যাঁদের ইচ্ছা তাঁরা ভারতে থেকেও যেতে পারতেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যাতায়াত আর কোনও দিন পুনঃ-প্রবর্তিত না হয়, তাঁরা যদি ভবিষ্যতে আর কোনও দিন দেশে ফিরতে না পারেন এই আশঙ্কাতেই প্রায় সকলেই দেশে ফেরবার যে সুযোগ পাওয়া গেল তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন।

ট্রেনে যেতে যেতে একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতার বেনিয়াপুকুর অঞ্চলের অধিবাসী। বাঙালী। কলকাতাই তাঁর দেশ। তিনি তাঁর বোন ও বোনের চারটি শিশু-সন্তানকে হরিদাসপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। বোন ভারতীয় নাগরিক—কোনও দিন পাকিস্তানে যাননি, যদিও তাঁর বিয়ে হয়েছিল কলকাতায় চাকরি-রত একটি পাকিস্তানী যুবকের সঙ্গে। যখন মেয়ের বিয়ে দেন তখন তার বাবা-মা স্বপ্নেও ভাবেননি যে এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কখনও উদ্ভব হতে পারে যে দু-দেশের মধ্যে

যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুপাত্র বিবেচনা করেই পাকিস্তানী যুবকটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। জামাই স্ত্রীকে পাশপোর্ট-ভিসা ইত্যাদির ঝামেলার দরুণ আগে কোনদিন দেশে নিয়ে যাননি—যুদ্ধের পর চাকরি খুইয়ে তিনি আগেই দেশে ফরিদপুরে তাঁর গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর ভারতীয় স্ত্রী স্পেশাল পারমিট নিয়ে শিশু-সন্তানগুলি-সহ পাকিস্তানে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলা একে তো কোনদিন পাকিস্তানে যাননি, তার উপর কলকাতায় তাঁর বুড়ো বাবা-মা, ভাই-বোন, পিতৃমাতৃকুলের সব আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে যাচ্ছেন,—মনে আশঙ্কা যে ভবিষ্যতে হয়ত আর কোনও দিন কলকাতায় আসতে পারবেন না, তাঁদের আর কখনও দেখতে পাবেন না, এমন কি তাঁদের চিঠিপত্রও লিখতে পারবেন না। তাই নানা আশঙ্কায় পীড়িত হয়ে ভদ্রমহিলা দেখলাম অঝোরে কাঁদছেন—সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে নানারকম উপদেশও দিচ্ছেন, বুড়ো আব্বা-আম্মার উপর নজর রাখতে বলছেন, ছোট বোনটির বিয়ের যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়, সে কথাও বলছেন—ভাইও অশ্রুসজল চোখে বোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি বললাম, 'আর তিন-চার দিন পরেই তাসখণ্ডে শাস্ত্রীজী আর আয়ুব খাঁর মধ্যে দেখা হবে,—শীগগিরই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি বাচ্চাদের নিয়ে আবার কলকাতায় আসতে পারবেন। অত ভাববেন না।' ভদ্রমহিলা তাসখণ্ড কোথায় বা সেখানে যে বৈঠক বসবে তার তাৎপর্য কি কতটা উপলব্ধি করতে পারলেন জানি না, কিন্তু আমার আশ্বাসবাণীতে তাঁর বিষণ্ণ অশ্রুসিক্ত মুখেও যেন কিছুটা আশার দীপ্তি ঝলক দিয়ে উঠল।

যদিও ৭ই জানুয়ারী (১৯৬৬) পর্যন্ত হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান থেকে শুধু ভারতীয় নাগরিক এবং ভারত থেকে শুধু পাকিস্তানী নাগরিকরাই আসতে বা যেতে পারছিলেন, তবুও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিট নিয়ে পাকিস্তানী নাগরিকরা ভারতে আসতে এবং ভারতীয় নাগরিকরা পাকিস্তানে যেতে অনুমতি

পেয়েছিলেন। উপরে উল্লিখিত ঘটনাটি এর একটি উদাহরণ। পশ্চিম-বঙ্গ থেকে কয়েকজন হিন্দু যুবক পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু পাত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন—তাঁরা স্পেশাল পারমিট নিয়ে তাঁদের নব পরিণীতা পাকিস্তানী বধূদের ভারতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

বনগাঁ থেকে সাইকেল রিক্সা করে হরিদাসপুর সীমান্তে যেতে হোল। সাইকেল রিক্সার যেন মিছিল—সকলেরই গন্তব্যস্থল সীমান্ত। ভোর বেলা থেকেই সীমান্তে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে আগমন-নির্গমন সুরু হয়ে গিয়েছে। পথ একই—সেই সুপ্রাচীন যশোর রোড। আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক শুধু একটি কাঠের গুঁড়ি ও দুটি গেট, যদিও সরকারী প্রতিবন্ধক পর্বত প্রমাণ। ওপারে পূর্ব-বাংলার মাটি ও মানুষ আর ওদের পতাকা দেখা যাচ্ছে—ওরাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এপারে পশ্চিম-বাংলার মাটি, মানুষ ও পতাকাকে।

সারাদিন এপার থেকে ওপারে অর্থাৎ পাকিস্তানে অনেকে গেলেন, আবার ওপার থেকে এপারে অর্থাৎ ভারতে অনেকে এলেন। লক্ষণীয় ছিল যে এপার থেকে যাঁরা গেলেন অর্থাৎ পাকিস্তানী নাগরিকরা তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু—ধুতি-পরা পুরুষ, শাখা-সিঁন্দুর-পরা মহিলারা; আবার ওপার থেকে যাঁরা এলেন অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকরা তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান—লুঙ্গি, পাজামা, আচকান-পরা পুরুষ, বোরখা-পরা মহিলারা। অনেকেই রমজানের উপবাস করছেন। এই ভারতীয় নাগরিকদেরও কেউ-কেউ পাকিস্তানে চাকরি করতেন, ব্যবসা করতেন বা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়েছিলেন। উভয় পারে একই চিত্র। একই দৃশ্য।

মাঝে-মাঝে করুণ দৃশ্যের অবতারণাও হচ্ছিল—বৃদ্ধ বাবা-মা সন্তানদের থেকে, বোনেরা ভাইদের থেকে, ভাইরা বোনেদের থেকে, বন্ধুরা বন্ধুর থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছেন বা যাচ্ছেন। বিদায়ের

ক্ষণে আকুল ক্রন্দন, কবে আবার দেখা হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা। একটি হিন্দু কিশোরী মেয়ে তো কিছুতেই তার বাবার সঙ্গে পাকিস্তানে ফিরবে না। বাবা উপায়ন্তর না দেখে মেয়েকে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে চললেন সীমান্তের দিকে। মেয়েটির বুক ফাটা ক্রন্দন সমবেত সকলের এবং বেষ্টনীর ওপারে পাকিস্তানী অফিসারদেরও বিষণ্ণ করে তুলল। কিন্তু তার বাবা বললেন যে সোমত্ত মেয়েকে তিনি ভারতে কার কাছে একা রেখে যাবেন—তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

পাকিস্তান সীমান্তের অফিসারদের মুখে শোনা গেল যে ভারতীয় হাই-কমিশনের কর্মচারীদের আসতে বেশ দেরী হতে পারে। বেলাবেলি তাঁদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু আসতে বোধ হয় রাত হয়ে যাবে, কারণ নারায়ণগঞ্জ থেকে খুলনা পর্যন্ত যে বিশেষ স্টীমারে তাঁরা আসছিলেন তা ঘন কুয়াশার জন্য বহুক্ষণ আটকে ছিল এবং খুলনায় পৌঁছাতে অনেক দেরী হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সব কাজেই যাঁরা দুরভিসন্ধির সন্ধান করেন, তাঁরা বললেন যে 'এসব বাজে গাল-গল্প, সব পাকিস্তানের কারসাজি। ভারতের ডিপ্লোমেটিক স্টাফ দিনের বেলায় খুলনা থেকে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত ট্রেনে আসবার সময় দুধারে মিলিটারী ছাউনি ইত্যাদি কিছু যাতে দেখতে না পান সে জন্য প্ল্যান করেই কুয়াশার অজুহাতে তাদের স্টীমার আটকে রাখা হয়েছে।' অবশ্য সেদিন রাত্রে যখন ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনের কর্মীরা সপরিবারে এসে হরিদাসপুরে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা সকলেই বললেন যে কুয়াশার কাহিনী সত্যি, কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত আরামেই ঢাকা থেকে ভারত-সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। পথে পাক-কর্মচারীদের সুব্যবস্থা ও সৌজন্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন তাঁরা।

যাই হোক সারাদিনটাই সীমান্তে কাটাতে হোল। কাষ্ঠ-বেষ্টনীর ওপারে দাঁড়ান পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আলাপ হচ্ছিল ভারতীয় কর্মচারী ও সাংবাদিকদের। ভারত-

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবধান যতই দুস্তর হোক না কেন, হরিদাসপুর সীমান্তে পাকিস্তানী অফিসারবৃন্দ ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক ইঞ্চি মাত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ-বেষ্টনীর পরিধিটা মাত্র। পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার ও কনেস্টবল যাঁরা সেদিন ওখানে কর্তব্যরত ছিলেন তাঁরা সবাই বাঙালী মুসলমান। তাঁরা এপারের পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই আলাপ করছিলেন। তাঁরা এপারের পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে তাঁদের পূর্ব-পরিচিত অর্থাৎ প্রাক-দেশবিভাগ যুগের কেউ আছেন কিনা সাগ্রহে অনুসন্ধান করছিলেন। ওপারের একজন পুলিশ কর্মচারী এপারের একজন পুলিশ অফিসারকে 'বড় বাবু' বলে সম্বোধন করে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আসেন বড়বাবু, একটু কথাবার্তা কই।' বড়বাবু তাঁর আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে বেষ্টনীর ধারে এগিয়ে গেলেন এবং দু-পারের দুই পুলিশ কর্মচারী এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে লাগলেন যে কে বলবে যে তখনও পর্যন্ত দু-দেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিরন্তর পরস্পরের প্রতি রাইফেল উঁচিয়েই আছে। ওপারের কর্মচারীরা তাঁদের দেশের হালচাল, দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার কথা বললেন—আমাদের অফিসাররাও বললেন। দুজনের ভাষাই এক, দুজনের জীবনের সমস্যাই এক। যুদ্ধ তাঁদের দুজনের জীবন ধারণের সমস্যাকে বাড়িয়েই তুলেছে,—দেশের কোন উপকার বা দেশের কোন সমস্যার সমাধান করেনি বিন্দুমাত্র। একথা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীরা বলতে পারেন না—বললে আয়ুবী শাসনে তাঁদের কোতল হোত, কিন্তু এপারের বাঙালী দোসরদের পেয়ে প্রাণের কথা গোপনে বললেন। নিজেদের দেশ পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁরা পশ্চিম-পাকিস্তানী তথা অবাঙালীদের দাপটে জর্জরিত ও ব্যতিব্যস্ত নিজেদের প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত,—তাই সেদিন রাত্রে যখন তাঁরা দেখলেন যে ঢাকা থেকে আসা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের পঞ্চাশজন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র চার জন বাঙালী

তখন তাঁদের মনে ভেসে উঠেছিল নিজেদের দেশে অবাঙালীদের প্রাধান্য বিস্তারের অপ্রিয় স্মৃতিগুলি এবং তাঁরা ম্লান হেসে আমাদের বললেন, 'আপনাদেরও একই অবস্থা—আমাদের তুই দেশের একই হাল। বাঙালীর কোন স্থান নেই।'

নির্জন নিঃস্তব্ধ যশোর রোডের ওপর আমরা গভীর রাত্রে দাঁড়িয়ে আছি। তু-পাশে বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়া যেন সন্ধ্যাকে আরও তাড়াতাড়ি আহ্বান করে এনেছে। ওপারে একটা, এপারে একটা—এই তুটো পেট্রোম্যাকস্ জ্বালানো হোল—তুটো বাতির আলো পরস্পরের দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে মিলে-মিশে একত্রে নিঃস্তব্ধ বেনাপোল-হরিদাসপুর সীমান্তকে আলোকিত করছিল। হঠাৎ মনে হোল যে এই মিলিত আলো যেন পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার মানুষদের মনের সব কালো ও সন্দেহ তার উজ্জ্বলতা দিয়ে দূর করে দিয়েছে।

পাকিস্তানী কর্মচারীরা আমাদের থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, নতুন বছর আসতে আর মাত্র তুঘণ্টা বাকী। শুভ নববর্ষ, খোদা হাফিজ! আমরাও বললাম, শুভ নববর্ষে আমাদের একমাত্র কামনা হোক যে শীগগিরই আমাদের যেন আবার দেখা হয়। তবে এভাবে নয়— আপনাদের দেশে আপনাদের বাড়িতে আর আমাদের দেশে আমাদের বাড়িতে। শুভরাত্রি!

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর প্রায় চার বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিমান ও রেল চলাচল বন্ধ। আজকাল কলকাতা থেকে পূর্ব-বঙ্গে যেতে হলে স্থলপথে ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ সীমান্তে হরিদাসপুর দিয়েই যেতে হয়। বিত্তবান ব্যক্তিরা বিমানে নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুতে গিয়ে সেখান থেকে আবার বিমানে ঢাকা যেতে পারেন। রেল ও বিমান পথ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার বা সেখান থেকে পশ্চিম-বঙ্গে আসবার রাস্তা না হয় আছে, কিন্তু তবুও তু-দেশের মানুষেরই পাশপোর্ট ভিসার

এত ঝামেলা যে সেসব অতিক্রম করে অনেকেরই প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহা খানের শাসন সুরু হবার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানী নাগরিকরা শুধু বৈধ পাশপোর্ট ও ভিসা থাকলেই ভারতে আসতে পারতেন না। ভারতে আসবার জন্য তাঁদের Exit Permit নামে একটি বিশেষ অনুমতিপত্র সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হোত। স্পষ্টতই এই প্রথা চালু করবার পেছনে আয়ুব-শাহীর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানী মানুষের ভারতে আসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। এছাড়া, ভিসা পাওয়াও সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং মুশ্‌কিল হচ্ছে যে এ বিষয়েও পাকিস্তান সরকার সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করছে। কলকাতায় পাকিস্তানী দূতাবাসে কোন ভারতীয় হিন্দু নাগরিক পূর্ব-পাকিস্তানে যাবার জন্য ভিসার আবেদন করলে তাকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। তাকে বলা হয় যে তার ভিসার বিষয়টি ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও অনুমতির জন্য পাঠান হয়েছে। হিন্দুদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ অনুমতি কোন দিনই আর আসে না অর্থাৎ সোজা কথায় ভারতীয় হিন্দুদের পূর্ব-পাকিস্তানে যাবার অনুমতি পাকিস্তান সরকার দেন না। যে মুষ্টিমেয় কজন ভাগ্যবান ব্যক্তি (হিন্দু) ভিসা পান, তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে যে কত মাসের পর মাস অপেক্ষা করে তবে তাঁরা এই ভিসা পাকিস্তানী দূতাবাস থেকে পেয়েছেন। ভারতীয় মুসলমানরা সকলে না হলেও—অনেকেই কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে ভিসা পেয়ে যান। এঁরাও ভারতীয়, কিন্তু পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এঁরা মুসলমান এটা হয়ত পাকিস্তানে যাওয়ার বা ভিসা পাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ qualification। এ বিষয়ে কিন্তু ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস বিশেষ উদার একথা মানতেই হবে। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে না হলেও বহু

পাকিস্তানী মুসলমান নাগরিককে পশ্চিম-বাংলায় আসবার ভিসা ছু-একদিনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কলকাতা ভ্রমণে এসে আমার পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমান বন্ধুরা অনেকেই আমাকে সপ্রশংস কণ্ঠে বলেছেন যে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন থেকে পশ্চিম-বঙ্গে আসবার ভিসা পেতে তাদের কোন অসুবিধাই হয়নি— কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা প্রয়োজনীয় ভিসা পেয়ে যান। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের কোন হিন্দু নাগরিকের পক্ষে এখানকার পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশন থেকে ভিসা সংগ্রহ—তা তার যত বড় ইমারজেন্সিই থাকুক না কেন—প্রায় অসম্ভবই।

তবুও উভয় বঙ্গের মানুষের যাতায়াতে যে এসব বাধা, সেগুলি নিয়ন্ত্রণের একদিন অবসান ঘটবে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে উভয় দেশের মধ্যে চলাচল সুগম হয়ে উঠবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় তাসখন্দে ভারতের প্রধান মন্ত্রী লালবাহাত্বর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের মধ্যে ঐতিহাসিক শীর্ষবৈঠক বসলো। উদ্দেশ্য ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক ও উন্নত করে তোলবার সূত্র অন্বেষণ। ১০ই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাত্বর ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বিখ্যাত 'তাসখন্দ চুক্তি'-তে স্বাক্ষর করলেন, কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লালবাহাত্বর শাস্ত্রী অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাসখন্দেই পরলোকগমন করলেন। বিশ্বময় নেমে এলো গভীর শোকের ছায়া। এই ছুই প্রতিবেশী ও আত্মীয়তা ও নানা বন্ধনে আবদ্ধ দেশের মধ্যে শান্তি ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মহান ব্রতে শাস্ত্রীজীর আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগ ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রাখবে।

এখানে ঐতিহাসিক তাসখন্দ ঘোষণার পূর্ণ বয়ানটি উদ্‌ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

১

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট তাসখন্দে মিলিত হয়ে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এতদ্বারা উভয় দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও বোঝাপড়া ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করছেন। ভারত ও পাকিস্তানের ৬৭ কোটি জনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁরা এই লক্ষ্যগুলির সাধন নিতান্ত জরুরী বলে মনে করেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী একমত যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য উভয় পক্ষই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। বলপ্রয়োগের আশ্রয় না নেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিরোধের মীমাংসা করার যে বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদে উল্লিখিত আছে, তাঁরা সেই বাধ্য-বাধকতার প্রতি পুনরায় স্বীকৃতি জানাচ্ছেন।

তাঁরা মনে করেন তাঁদের এলাকায়, বিশেষত ভারত-পাক উপ-মহাদেশে, শান্তির স্বার্থ, এবং ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ, উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনা বজায় থাকার দ্বারা আদৌ রক্ষিত হয়নি। এই পটভূমিকাতেই জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং উভয় পক্ষই এ বিষয়ে নিজ নিজ বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন।

২

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত হয়েছেন যে ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সালের মধ্যে উভয় দেশের সশস্ত্র ব্যক্তিদের ৫ই আগস্ট, ১৯৬৫ সালের পূর্বেকার অবস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি শর্ত এবং যুদ্ধবিরতি সীমারেখা মেনে চলবে।

৩

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত যে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।

৪

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত যে উভয় পক্ষই একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে উৎসাহ দেবেন না এবং দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতিসাধনের পক্ষে অনুকূল প্রচার চালাতে উৎসাহ দেবেন।

৫

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত যে পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার এবং ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার নিজ-নিজ পদে ফিরে যাবেন এবং স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। উভয় দেশই কূটনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক জেনেভা চুক্তি মেনে চলবেন।

৬

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিবেচনা করতে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সব চুক্তি আছে সেগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করতে রাজী হয়েছেন।

৭

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণের জন্য নিজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

৮

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত যে উভয় পক্ষই উদ্বাস্তু এবং উচ্ছেদ বেআইনীভাবে অন্য দেশে যাওয়া (immigration) সমস্যাগুলির সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন। তাঁরা আরো একমত যে উভয় দেশই ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ (exodus) বন্ধ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করবেন। সংঘর্ষের জন্য যেসব বিষয়-সম্পদ দখল করা হয়েছে সেগুলি ফেরত দেবার বিষয়ে আলোচনা করতেও তাঁরা রাজী হয়েছেন।

৯

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একমত যে উভয় পক্ষই উভয় দেশের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে এবং অন্যান্য স্তরে সাক্ষাৎকার চালিয়ে যাবেন। আরো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার এবং নিজ-নিজ সরকারের কাছে রিপোর্ট করার জন্য ভারত-পাক যুগ্ম সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উভয় পক্ষই স্বীকার করেছেন।

১০

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, সোভিয়েট সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং ব্যক্তিগত-ভাবে সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির প্রতি তাঁদের গভীর আন্তরিক প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করছেন—তাঁদের গঠনমূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও মহৎ ভূমিকার জন্য, যে ভূমিকা বর্তমান বৈঠক এবং উভয় পক্ষের পক্ষে সন্তোষজনক পরিণতি সম্ভব করেছে। তাঁরা উজবেকিস্তানের সরকার ও বন্ধুমনোভাবাপন্ন জনগণের প্রতি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন—তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা ও উদার আতিথ্যের জন্য। তাঁরা সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানকে এই ঘোষণার সাক্ষী থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী — পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট
লালবাহাদুর শাস্ত্রী — মোহাম্মদ আয়ুব খান

তাসখন্দ, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অব্যবহিত পরেই পশ্চিম-পাকিস্তানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্ররোচনায় তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সুরু হয়। তাদের প্ররোচনায় এবং আয়ুব সরকারের এতদিনের জঙ্গীবাদী ও ভারত বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় বিভ্রান্ত লাহোর ও পশ্চিম-পঞ্জাবের

ছাত্র-সমাজের বৃহৎ এক অংশ সেই আন্দোলনে অংশ নেয়। কাশ্মীর হাতে এল না, অথচ ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ কেন বন্ধ হলো এবং চুক্তিতে কেন শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো—এই হলো তাদের মাথাকোটার কারণ।

স্বীয় শক্তির পীঠস্থান পশ্চিম-পঞ্জাবের উচ্চবিত্ত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও আন্দোলনের বিস্তার দেখে আয়ুব-সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৪ই জানুয়ারী আয়ুব সরকারের নির্দেশে পশ্চিম-পাকিস্তানের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আয়ুব স্বয়ং ঐ দিন (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৬) রেডিও যোগে তাসখন্দ চুক্তির প্রথম ধারা অস্বীকার করে জানান যে, তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। (তাসখন্দ চুক্তির প্রথম ধারা ছিল: পাকিস্তান সরকার বা ভারত সরকার তাঁদের মধ্যবর্তী কোনো বিবাদের মীমাংসার জন্য বলপ্রয়োগের পথ নেবেন না, অর্থাৎ যুদ্ধ করবেন না। শান্তিপূর্ণ পথে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করবেন। জম্মু ও কাশ্মীর এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচিত হয়েছে।) পশ্চিম-পাকিস্তানে আয়ুব-বিরোধী অথচ প্রতিক্রিয়াশীল এই জনমতের বিস্তার দেখে পশ্চিম-পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ আয়ুব-বিরোধী নেতারা তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের যেসব বিরোধী নেতা আমন্ত্রিত হন তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী এই ঘোঁটের মধ্যে শেখ মুজিবর অংশ নিতে অস্বীকার করেন এবং তিনি সম্মেলন ত্যাগ করে উঠে আসেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা রক্ষা ও বিস্তারের ওপর শেখ মুজিবর রহমান গুরুত্ব দেন এবং এই সম্মেলনের পরেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয়-দফা দাবী পেশ করেন।

ছয়-দফা দাবীর প্রথম দফায় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি সত্যকার ফেডারেশন ধরনের শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করা হয়। এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর বলেন যে, পার্লামেণ্টারি ধরনের সরকার ও সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়। কারণ বয়স্কদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনমতের-ই স্বীকৃতি ঘটে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দফায় দাবী করা হয় যে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার কেন্দ্রের হাতে থাকবে, অন্য সব ব্যাপার প্রাদেশিক সরকার-গুলির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এর তাৎপর্য এই যে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থ-সম্পদ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে।

পরে দ্বিতীয় দফার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর বলেন যে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে (যে প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করেছিল) দেশরক্ষা পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে রাখা অপ্রয়োজনীয় এবং সরকার রেলওয়েকে ইতিমধ্যেই প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করেছেন। তিনি আরো বলেন যে ছয় দফা প্রস্তাবে তিনি স্টেট বলতে স্বাধীন রাষ্ট্র বোঝাননি, প্রদেশ বুঝিয়েছেন।

তৃতীয় দফায় পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুটি স্টেট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দাবী করা হয়। এর বিকল্প হিসেবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে একটি মাত্র কারেন্সীর ব্যবস্থা করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে মুদ্রার পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেল ব্যাঙ্ক ও দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়।

চতুর্থ দফায় সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করার দাবী করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয় যে, আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রাজস্বের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে (রিজার্ভ ব্যাঙ্কে) স্বতই (অটোমেটিক্যালি) জমা হবে, এরকম শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে।

পঞ্চম দফায় সকল বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রাদেশিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবী জানানো হয়।

শেখ মুজিবর রহমান পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করে পাট রপ্তানীকে প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তে আনার-ও দাবী জানান। (স্মরণীয় যে, ১৯৫৪ সালের একুশ দফাতেও এই দুই দাবী উত্থাপিত হয়েছিল।)

ষষ্ঠ দফায় পূর্ব-পাকিস্তানে জনফৌজ বা মিলিশিয়া ও আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের দাবী পেশ করা হয়।

সংক্ষেপে ছয় দফার দাবীর মাধ্যমে শেখ মুজিবর পূর্ব-পাকিস্তানের আর্থিক জীবন ও করব্যবস্থার উপর পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করেন এবং আঞ্চলিক আর্থিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসেবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। (দ্রষ্টব্য—'সংবাদ' ২০শে মার্চ, ১৯৬৬)

ছয়-দফা দাবী পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে তা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের রপ্তানী থেকে উদ্‌বৃত্ত আয় (Export Surplus) পশ্চিম-পাকিস্তানের ঘাটতি (deficit) মেটাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, পূর্ব-পাকিস্তানের সংগৃহীত খাজনা ও করের অধিকাংশ টাকা পশ্চিম-পাকিস্তানের পুঁজিবাদী উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে, সামরিক খাতে ব্যয়ের প্রায় সবটাই করা হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানে। এ সব

সত্য আজ পূর্ব-বাংলায় কারুরই অবিদিত নেই এবং সেখানকার মানুষ স্বভাবতই এই নগ্ন ও নির্মম শোষণের অবসান চায়। স্বাধীনভাবে বিনা নিয়ন্ত্রণে, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের আর্থিক জীবন গড়ে তোলার সঙ্কল্প প্রত্যেক সচেতন জনসমাজ-ই পোষণ করে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষও অচেতন প্রাণী নয়। ছয় দফার মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্তৃত্বের দাবী জানানো হয়, স্বভাবতই তা পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে।

এবং ঠিক এই কারণেই ছয় দফার মুখোমুখি হয়ে আয়ুব একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। যুক্তির উপরে যুক্তি দেবার চেষ্টা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান তিনি, কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তাঁর দিক থেকে দেবার মত যুক্তি কিছু নেই। পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ না করলে, তার সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করে না রাখলে আয়ুবের স্বৈরতন্ত্র একদিনও টিকবে না। ছয় দফার বিরুদ্ধে আয়ুবের আসল যুক্তি এইটাই। কিন্তু এটা প্রকাশে ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে (এবং তাঁর অবস্থায় অন্য কারুর পক্ষেই) সম্ভব নয়। কাজেই যুক্তির ধার দিয়ে না গিয়ে তিনি হুমকি দিতে শুরু করেন।

গৃহযুদ্ধের হুমকী

১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকায় তাঁর নিজের তৈরী কনভেনশন-পন্থী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে আয়ুব খান 'বিরোধী দলের কার্যকলাপে উদ্বেগ' প্রকাশ করে এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, দেশের অখণ্ডতা বিরোধী কোনো প্রচেষ্টা সরকার সহ্য করবে না। প্রয়োজন হলে 'অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেওয়া হবে।' (সংবাদ, ২১শে মার্চ, ১৯৬৬)

অস্ত্রের মুখে জবাব দেবার কল্পনায় প্রাক্তন ফিল্ড মার্শাল অত্যন্ত বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁর মুখে এরকম আবোল-

তাবোল বোল ফুটেছিল। মানচিত্রের দিকে তাকালে যে কোনো পঞ্চম বর্ষীয় শিশুও দেখতে ও বুঝতে পারে যে পাকিস্তান একটি নাম হলেও, একটি দেশ নয়! বাস্তব, ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারাই পাকিস্তান দুইটি অঞ্চলে বা দুইটি খণ্ডে খণ্ডিত। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবীতে দেশকে খণ্ডিত করার কোনো প্রস্তাব-ই করা হয়নি (বস্তুত তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই) কেবলমাত্র পাকিস্তানের দুই খণ্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করে নিলে আয়ুবের শোষণ ব্যবস্থা টেকে না, কাজেই তাকে যুক্তি না দিয়ে হুমকী দিতে হলো। ঐ একই দিনে (২০শে মার্চ) আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের শেষে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবর ঘোষণা করেন, 'কোনো হুমকীই জনসাধারণকে ছয় দফা দাবী থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।' তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, 'দেশের উভয় অংশকে শক্তিশালী করতে হবে।' প্রসঙ্গত, পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়কালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, 'পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দেখা গেছে যে, শক্তিশালী কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন অসহায় হয়ে পড়েছিল।' তিনি বারংবার প্রশ্ন তুলে ধরেন, কেন তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানকে এই জাতীয় সঙ্কটের সময়ে সাহায্য করা যায়নি, কেন তাহলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এই উক্তি করেছিলেন যে, চীনের জন্যই পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে! কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার কথা তাহলে খাটে কি করে? পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কখনও পশ্চিম-পাকিস্তান বা বিদেশের ওপর নির্ভর করতে পারে না বলে তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

মার্চ মাসে আয়ুব খানের অস্ত্রের হুমকী দেওয়ার পর ছয়-দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ৭ই জুনের 'গণ অভ্যুত্থানে'র দ্বারা দুটি অংশে ভাগ হয়ে পড়ে। এর প্রথম পর্যায়ে

৭ই জুনের পূর্বে দেখা যায় যে, ন্যাপ দল নানা যুক্তিতে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। ৭ই জুন স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে জনতা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় শ্রমিক সাধারণ আন্দোলনে সামিল হবার পর দেখা যায় যে তাঁরা আন্দোলনে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬ই আগস্ট থেকে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ঘোষণা করে এবং অতঃপর তাদের পিছনে ভাসানী নেতৃত্বও ১০ই আগস্ট থেকে আন্দোলনের কথা বলেন। কিন্তু কারুর-ই আন্দোলন কার্যকরী হয়নি। জুন থেকে আওয়ামী লীগের ওপর প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ সুরু হয়। কিন্তু অন্য কোনো দল তাদের সক্রিয় সমর্থন দিতে এগিয়ে আসেনি। অবশেষে দমননীতি সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসনের দাবী যখন জনমনে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছে তখন দেখা গেল যে ভাসানী নেতৃত্বও পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে অগ্রাধিকার দেন ও এই আন্দোলনে সামিল হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। পূর্ব-বাংলার রাজনীতির এই দিক-পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য আমি অতঃপর আলোচনা করব।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে আয়ুব গৃহযুদ্ধের হুমকী দেবার পরেও অবশ্য সে দাবী দমে গেল না। ছয়-দফা দাবীর অন্তর্নিহিত আর্থিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্ট করার জন্যই আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন (পাবনা, ৮ এপ্রিল) যে, পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করলে তিনি ছয়-দফা দাবী প্রত্যাহার করে নিতে রাজি। ছয়-দফা দাবীর যে মূলত দূর থেকে পূর্ব-বাংলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থার প্রতিবাদ, শেখ মুজিবের 'প্রস্তাবে' সেটাই স্পষ্ট করে তুলল। ছয়-দফার দাবী জনসমক্ষে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এই সময়ে শেখ মুজিবর ঢাকা ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানের জেলায় জেলায় সফর শুরু করলেন এবং সর্বত্র জনতার

অভিনন্দন ও ছয়-দফা দাবীর স্বপক্ষে অকুণ্ঠ জনসমর্থন লাভ করলেন। সর্বত্র সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবীকে তাদের প্রাণের দাবী বলে ঘোষণা করল।

যদিও ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে স্বীয় মাস পয়লা ভাষণে আয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তুলিতেছে,' কার্যকালে দেখা গেল যে, 'এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে' তিনি ভুলতে পারছেন না। ২১শে এপ্রিল শেখ মুজিবকে ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হলো সিলেটে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার জন্যে। বক্তৃতাটা সিলেটে দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে মুজিবর রহমানকে দ্রুত ঢাকা থেকে সিলেটে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে তিনি জামিনে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে সিলেট থেকে ময়মনসিংহ-এ পাঠাল আয়ুবের নির্দেশ চালিত মোনেম সরকার। তারপর থেকে আয়ুবের স্বৈরতন্ত্র শেখ মুজিবরকে কিছুতেই বাইরের খোলা হাওয়ায় থাকতে দেয়নি। আদালত থেকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেও স্বৈরতন্ত্রের কারাগার থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এর শেষ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে। ঢাকায় আদালতে যখন প্রমাণিত হলো যে, রাজদ্রোহ মূলক যে বক্তৃতার অপরাধে শেখ মুজিবকে স্বৈরতন্ত্র গ্রেপ্তার করেছে তার কোনো নির্ভরযোগ্য শ্রোতা ছিল না, বক্তৃতার সাক্ষীরা কেউ বাংলা ভাষা বোঝে না, তখন আদালত থেকে নির্দেশ এলেও স্বৈরতন্ত্র শেখ মুজিবকে মুক্তি দিল না। আয়ুবের স্বৈরতন্ত্র জানতো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী হলো রাজনৈতিক ডিনামাইট এবং ছয়-দফার দাবী হলো তার ফিউজ; যদি এ দাবীর পশ্চাতে জনমত সক্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে স্বৈরতন্ত্র প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মুখে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হবে। কাজেই এ দাবীর যারা উত্থাপক তাদের টুঁটি টিপে আটকে রাখে তারা; কোনোক্রমেই জনতার সামনে আসতে দেয়নি।

ছয়-দফার দাবী উত্থাপিত হবার পর যদি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ

(ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এই দাবীর পশ্চাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনমতকে সমবেতভাবে সংগঠিত করতে পারত; যদি আন্দোলনের পর্যায়গুলি নিজেদের কাছে ও জনতার কাছে স্পষ্ট করে তুলত তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাস আজ অন্যরকম হতো সন্দেহ নেই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাসানী নেতৃত্বকে সামনে রেখে ন্যাপের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শুরু থেকেই ছয়-দফার বিরোধিতা সুরু করলেন। এমনকি যখন আয়ুব গৃহযুদ্ধের হুমকী দিলেন, গ্রেপ্তার ও জেল জুলুমের স্টিমরোলার চালিয়ে দিলেন, তখনও তাঁরা অত্যাচারিতের, পাশে এসে দাঁড়ালেন না, তখনও তাঁরা স্বৈরতন্ত্রের সক্রিয় বিরোধিতা করলেন না। বরং ৭ই এপ্রিল মৌলানা ভাসানী জানালেন যে, 'ছয়-দফায় অর্থনৈতিক মুক্তির ঘোষণা নাই' তাই 'তাঁরা ছয়-দফা সমর্থন করবেন না'। ১০ই এপ্রিলে সমাপ্ত পূর্ব-পাক ন্যাপের কার্য-নির্বাহক কমিটির অধিবেশনে ছয়-দফা সম্পর্কে ইঙ্গিতে বলা হোল 'বিভিন্ন দেশে গণবিরোধী সরকারের জনসমর্থন হীনতার সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের অসন্তোষ সমূহকে তাহাদের স্বার্থ হাসিলের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে। ...পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন চাহে কিন্তু স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অছিলায় তাহাদের বুকের উপর একদল পুঁজিপতির পরিবর্তে আর-এক দল একচেটিয়া ধনিকের ও আমলার শোষণ চাপিয়া বসুক ইহা তাহারা চাহে না।' সংক্ষেপে, ছয়-দফার দাবীতে কোনো অজ্ঞাত উপায়ে 'মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ হাসিল' হতে যাচ্ছে এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী ছয়-দফায় উত্থাপিত হয়েছে তার মাধ্যমে, 'স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অছিলায় একদল পুঁজিপতির পরিবর্তে আর এক দল একচেটিয়া ধনিকের ও আমলার শোষণ।' ইতস্তত তাঁরা আরো বললেন যে, 'ছয়-দফার মধ্যে সমাজতন্ত্র নাই' কাজেই ছয়-দফার তাঁরা সমর্থন করবেন না।'

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ছয়-দফার মধ্যে যা আছে সে দিকে তাঁদের দৃষ্টি গেল না। তাঁরা এটাও বিচার করে দেখলেন না যে,

আয়ুবের যে স্বৈরতন্ত্রকে তাঁরা সমর্থন জানিয়ে বসে আছেন তার মধ্যেও 'সমাজতন্ত্র নাই' 'অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির সম্ভাবনা নাই" বরং সেই স্বৈরতন্ত্রকে প্রথমে দূর করতে না পারলে অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি বা সমাজতন্ত্র কিছুই সম্ভব নয়। এবং ছয়-দফার মধ্যে সেই স্বৈরতন্ত্রের অপসারণ ও অবসানের একটা খসড়া প্রস্তাব রয়েছে এবং রয়েছে বলেই আয়ুবের স্বৈরতন্ত্র তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকী থেকে গ্রেপ্তারী ও জুলুমের বান ডাকিয়েছিলেন। তাঁরা এটাও বুঝলেন না যে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বসে থেকে সমাজতন্ত্রকে একটি 'ডগমা' হিসেবে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বারবার আবৃত্তি করলে, বা দূরে বসে তত্ত্ব কণ্ডুয়ন করলে বাস্তবে সমাজতন্ত্র আসে না সমাজতন্ত্রকেই জনমানসে ধিক্কৃত করা হয় মাত্র। ছয়-দফাকে অস্বীকার করে নয় ছয়-দফাকে অঙ্গীকার করেই তাঁরা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পর্যায় উন্নীত করতে পারতেন।

শেখ মুজিবরের প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বস্তরে অসাধারণ সমাদর লাভ করল, কিন্তু তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হল পশ্চিম-পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ও রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে। তাঁরা 'সব গেল' 'সব গেল' রব তুলে ছয় দফা প্রস্তাবকে বললেন পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা। সরকার পরিচালিত বা সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলি শেখ মুজিবর ও তাঁর সহকর্মীদের ভারতের "Stooge" বা তাঁবেদার বলে আখ্যা দিলেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব হুঙ্কার দিলেন এ ছয়-দফা প্রস্তাব 'সার্বভৌম যুক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা' ছাড়া আর কিছুই নয়। আয়ুব আরও বললেন, যারা ছয়-দফা দাবি আদায়ের বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে তারা মূর্খের রাজ্যে বিচরণ করছে—কারণ কিছুতেই এ হতে দেওয়া হবে না। স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্ত-বাংলার পুরোনো ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।' এখানেই শেষ নয়, ভারত সরকারের জন্য সহসা অপরিসীম উদ্বেগে আকুল হয়ে তাদের পক্ষেও

অযাচিত ওকালতি করে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বলে বসলেন, 'ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করতে সক্ষম।' পরিশেষে যথারীতি সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে আয়ুব বললেন, 'স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-বঙ্গ ও আসামের হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার একটি দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা!'

যেদিন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব গৃহযুদ্ধের শাসানি দিচ্ছিলেন সেদিনই ঢাকা স্টেডিয়ামে বিশাল এক জনসভায় সুদীর্ঘ এক বক্তৃতায় শেখ মুজিবর তাঁর ছয়-দফা প্রস্তাবের প্রতিটি ধারার তাৎপর্য বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করলেন, বললেন, এ প্রস্তাবগুলিই 'পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারাণ্টি' এবং 'তাঁদের মুক্তির সনদ'। প্রস্তাবটি পশ্চিম-বঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত এ অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন।

পূর্ব-বঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের অবাধ শোষণের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবর বললেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান সারা দেশের ৭৫% বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, কিন্তু নিজ উন্নয়নের জন্য তা থেকে পায় মাত্র ৩০%। ফলে প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্তান আজ পশ্চিমা পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশে ও অবাধ শোষণের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে···পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও জঙ্গী শাসকেরা যে শুধু নিরন্তর পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে তাই নয়, তারা এই শোষণজাত সমস্ত মুনাফা পশ্চিমে সরিয়ে ফেলছে।' শেখ সাহেব বললেন, এই কারণেই তাঁর ছয়-দফার অন্যতম দাবি হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে পৃথক মুদ্রার প্রচলন।

শেখ মুজিবর তাঁর ছয়-দফার ষষ্ঠ ধারা অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, দেশরক্ষার দিক থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে যে

কতটা অসহায় করে রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রকটভাবে বোঝা গিয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত' সংঘর্ষের সময়। শেখ মুজিবর প্রশ্ন করেন যে, 'প্রেসিডেন্ট আয়ুব যদি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাকে এতই দুর্ভেদ্য বলে মনে করে থাকেন তবে তিনি এই উদ্বেগসঙ্কুল একশটা দিনের মধ্যে একদিনের জন্যও তাঁর দেশের বৃহত্তম অংশ পূর্বাঞ্চলের মাটিতে পা দিলেন না কেন? আয়ুব সরকার অত বড়-বড় বুলি আওড়াচ্ছিলেন যে, ভারত পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করলে তাঁরা দিল্লীতে মারচ করবেন, তা যে নেহাতই শূন্যগর্ভ বাগড়ম্বর তা বুঝতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের বাকি নেই—রণাঙ্গনে সত্যিই যে কি ঘটেছিল তা সবাই জানে।'

শেখ মুজিফর আরও বলেন যে, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতে চীনের হস্তক্ষেপের ভয়েই ভারত পূর্ব-পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি, কিন্তু ভুট্টো সাহেবের কথাই যদি ঠিক হয় তবে কি এ কথাই মেনে নিতে হবে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল! জনাব ভুট্টো এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি। কথা ছিল যে, ১৯৬৬ সালের ১৭ই এপ্রিল ঢাকার ভুট্টো সাহেব প্রকাশ্য এক জনসভায় শেখ মুজিবরের মুখোমুখি হয়ে তাঁর ছয়-দফা প্রস্তাবের মোকাবেলা করবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জনাব ভুট্টো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন,—তিনি জানালেন জরুরী কাজের জন্য তিনি, আসতে অক্ষম। শেখ মুজিবর বললেন যে, 'এ মোকাবেলা সভায় যোগ দিতে ভুট্টো সাহেবের অক্ষমতা তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে নৈতিক বিজয়েরই সূচনা করছে এবং জনগণ যে ছয়-দফার পক্ষে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করছে।'

আয়ুব-শাহীর শত-সহস্র হুমকি সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানে ছয়-দফা দাবি সহ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। নির্ভীক নেতা শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানালেন যে, হিম্মৎ থাকলে তিনি অবিলম্বে একটি

গণভোটের অনুষ্ঠান করে দেখুন যে, পূর্ব-পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায় কিনা। শেখ মুজিবর আরও বললেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ত্রিশজন লোকও যদি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করে তবে তিনি কসম খাচ্ছেন যে, তিনি চিরদিনের মত রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন।

শঙ্কিত আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তানের এই গণ-আন্দোলনের মোকাবেলা রাজনৈতিক পর্যায়ে না করে দমননীতির পথ বেছে নিলেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান (রাজশাহী) শ্রমিক সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. আজিজ, আওয়ামী নেতা খোন্দকার মুস্তাক আহমদ প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হোল।

কিন্তু গণ-আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে ও অব্যাহতগতিতে চলতেই লাগল। খাদ্যের দাবিতে ২২শে মে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে 'খাদ্য দাবি দিবস' পালিত হল। ৭ই জুন সারা প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্য সমস্যা যে কত তীব্র রূপ ধারণ করেছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে ঢাকার সাপ্তাহিক "জনতা" পত্রিকার একটি মন্তব্য থেকে : 'দেশময় আজ হা অন্ন হা অন্ন রব উঠিয়াছে—আজ হাহাকার উঠিয়াছে পূর্ব-বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ঘরে।' খাদ্য দাবি দিবসে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল এক জনসভায় (পূর্ব-পাকিস্তানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) গৃহীত একটি প্রস্তাবে 'অবিলম্বে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিরোধ না করা হলে শোষিত, নির্যাতিত ও নিরন্ন দেশবাসীর রুটি, রুজির দাবিতে দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন গড়ে তোলবার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়, 'দেশবাসীর অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,

স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব এড়াইয়া শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ আশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত জনগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায় না এবং অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিয়া কোন সরকার—সে যতই শক্তিশালী হউক না কেন—অধিক দিন ক্ষমতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।'

একদিকে ৭ই জুনের হরতালের সমর্থনে সারা পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে,—অপর দিকে একে বানচাল করবার জন্য সাড়ম্বর পুলিশী তোড়জোড়, নির্বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য শহরে অসংখ্য পথসভা, জনসভার অনুষ্ঠান করে হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। অসংখ্য পোস্টারে-পোস্টারে শহর হাটবাজার ছেয়ে যায় এবং পোস্টারে মিছিলে ধ্বনি ওঠে 'পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন চাই', 'আয়ুব-শাহী নিপাত যাক', 'খাদ্যের দাম কমাতে হবে' 'দমন নীতির অবসান চাই'। ২৮শে মে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের এক বিশাল সমাবেশ—"৭ই জুন"কে সমর্থন জানান হন।

অপরদিকে নির্বিচারে গ্রেফতার ও পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াও ঢাকা লিথো আর্ট প্রেস এবং অন্যান্য ছাপাখানা থেকে ৭ই জুনের সমর্থনে প্রস্তুত হাজার হাজার পোস্টার পুলিশ আটক করে, সরকারের ভাড়াটে দালালরা পথে-পথে পোস্টারগুলি নষ্ট করবার চেষ্টা করে এবং পোস্টার লাগানোর অপরাধে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ৭ ইর ঐতিহাসিক "পূর্ব-পাকিস্তান বন্ধ" সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। সারা প্রদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর আয়ুবী রুদ্র-রোষের বলি হয়েছিল কুড়িটি তাজা প্রাণ।

৭ই জুনের এই স্বতস্ফূর্ত হরতালে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া থেকে

ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাধারণ মানুষের চাপা বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছিল। কোন একটি বিশেষ বা আংশিক দাবি নিয়ে এ বিক্ষোভ নয়। এবারকার দাবি ছিল মৌলিক ও ব্যাপক···পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও আরও অনেক। পূর্ব-বঙ্গবাসীরা নিজেদের জীবনমরণের প্রশ্ন বলেই ওগুলিকে বিবেচনা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে ঢাকার সাপ্তাহিক "জনতা" মন্তব্য করেন—'জাতীয় জীবনের প্রতিটা সমস্যা···আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, খাদ্য সমস্যা জরুরী অবস্থার অবসান, রাজবন্দীদের মুক্তি ও গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহার জনিত সমস্যাবলীর যাঁতাকলের নীচে আজ পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের জাতীয় জীবন পিষ্ট হইতেছে।'

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের পূর্ব-পাকিস্তানের জাগ্রত জনমতের সঙ্গে কোন সমঝোতা করতে বা তার সমস্যাবলীর সমাধানের কোন সূত্র খুঁজতে এগিয়ে আসবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়েছিল কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের পায়ের নীচে থেকেই মাটি সরে যেতে পারে এ আশঙ্কা তাঁর ছিল প্রবল।

আয়ুব-শাহীর নির্মম দমন-নীতি সত্ত্বেও পূর্ব-বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন স্তিমিত হয়নি।

৮ই জুন পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দল সাত তারিখের পুলিশের গুলিবর্ষণের বিষয়টি উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে সারাদিনের জন্য সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান। বিরোধী পক্ষের নেতা জনাব আবদুল মালিক উকীল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আয়ুব-শাহীর নির্যাতন কঙ্গোর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে।'

ঢাকার আইন পরিষদের বিরোধী দলীয় এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা এর মাত্র দুদিন আগেই ৬ই জুনও বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হবার দিন গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খাঁনের উদ্বোধনী ভাষণ বর্জন করে পাকিস্তানের পার্লামেনটারী রাজনীতির ইতিহাসে এক নয়া নজির

সৃষ্টি করেছিলেন। জনাব আবতুল মালিক উকীল ও স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাতুজ্জমান খাঁন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, 'গণজীবনের পুঞ্জীভূত ফরিয়াদের অভিব্যক্তি' জ্ঞাপনের জন্যই তাঁরা গভর্নরের ভাষণ বর্জন করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কর্মী কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি ১০ই ও ১১ই জুন অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন প্রদেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন এবং ১৬ই আগস্ট থেকে ব্যাপক এক গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু করবার আহ্বান জানালেন।

নিপীড়নমূলক সম্ভাব্য সব পন্থায় এ আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আয়ুব-সরকার সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেবার শেষ চেষ্টাও করেছিলেন বাঙালী-অবাঙালী সংঘর্ষের উস্কানি সৃষ্টি করে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতা এ অপচেষ্টা বিষয়ে পূর্বাহ্নেই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ৭ই জুন 'দৈনিক সংবাদ' মন্তব্য করেছিলেন: 'হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ বা দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীল গণ-তুশমনরা জনগণের ঐক্যে বারে বারে ফাটল সৃষ্টি করছে—জনতার রুটি-রুজির আন্দোলনকে বানবাল করে দিয়েছে, তেমনি বাঙালী-অবাঙালী বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করেও তারা একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের উস্কানি ও প্ররোচনাদাতারা দেশের তুশমন ও জনতাব তুশমন।'

পূর্ব-বঙ্গের প্রগতিবাদী সংবাদপত্রগুলিও স্বৈরাচারী সরকারের রুদ্ররোষের বলি হয়েছিল। সংবাদ বা মতামত প্রকাশে তাদের অত্যন্ত সীমিত স্বাধীনতাও হরণ করে ৩রা এপ্রিল (১৯৬৬) প্রাদেশিক গভর্নর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে ফতোয়া দেন, তাঁরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর কোন সংবাদ, মন্তব্য, বিবৃতি, অভিযোগ বা মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না:

১. পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্ব-ভৌমত্বের পক্ষে হানিকর কোন প্রসঙ্গ ;

২. দেশের এক অংশের বা শ্রেণী-বিশেষের অপর অংশকে শোষণের ও উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের অভিযোগ ;

৩. ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ, ছাত্র অসন্তোষ, ছাত্র-সভা ও ছাত্রদের বিভিন্নমুখী অভিযোগ ও সে সংক্রান্ত সরকারী ব্যবস্থা।

এমন কি এই নিষেধাজ্ঞার সরকারী আদেশটির খবরও কোন সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়া অতি সম্প্রতি জুন মাসের গোড়ার দিকে দেশরক্ষা আইনে কোন সংবাদপত্রের 'ডিক্লারেশন' বাতিল করে দেবার অর্থাৎ সংবাদ-পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করবার ক্ষমতাও সরকার গ্রহণ করেন।

১৫ই ও ১৬ই মে ঢাকায় 'পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের' বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে 'সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ আইন প্রয়োগে' গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার অর্থ জনসাধারণের স্বাধীনতাকেই খর্ব করা।' এ সব বিধিনিষেধের ফলে ৭ই জুনের 'ইত্তেফাক'-এর কোথাও, সেদিন প্রদেশব্যাপী যে হরতাল হবে, সে বিষয়ে কোন উল্লেখই ছিল না—অন্যান্য সংবাদপত্রেও এ খবর কোন প্রাধান্য পায়নি। এছাড়া ৮ই জুন ঢাকার কোন সংবাদপত্রই হরতালের বিষয়ে সরকারী প্রেস-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া কোন খবর বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, অত্যন্ত জনপ্রিয় ইংরাজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর সম্পাদক ৮ই জুন প্রথম পৃষ্ঠায় সরকারী প্রেস-নোটটি হুবহু তুলে দিয়ে মন্তব্য কবেন—'কোন অনিবার্য কারণবশত আমরা হরতাল বিষয়ে আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের বিবরণ প্রকাশ করতে পারলাম না।'

সেদিনই 'নির্দ্রাকর্ষণ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে নিদ্রাকর্ষণে সুস্বাদু আমের রসের অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করে 'পাকিস্তান

অবজারভার' একটি সরস নিবন্ধ লিখেছিলেন—৭ই জুনের ঘটনা-বলীর উল্লেখমাত্রও সম্পাদকীয় পাতার কোথাও ছিল না। এই নিবন্ধটির সুরু হয়েছিল এই লাইনটি দিয়ে—'যদিও গত বছরের মত অত প্রচুর আমের ফলন এবার হয়নি তবুও সরস পাকা আম নিদ্রাকর্ষণে ঘুমের বড়ির চেয়েও বেশি কার্যকর।'

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে সরকারী স্বৈরাচারের প্রতি এর চেয়ে বড় শ্লেষ বোধকরি আর হতে পারে না।

সরকারের রোষবহ্নি সবচেয়ে বেশি পড়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের মুখ্য সমর্থক 'ইত্তেফাক' গোষ্ঠী ও তার নির্ভীক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন-এর (মানিক মিঞা) উপর। কিন্তু মানিক মিঞার শাণিত লেখনী তারা বন্ধ করতে পারেনি।

পাক-সরকার তাঁদের নিষেধাজ্ঞার পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে 'বৈষম্য'-সংক্রান্ত সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তফাজ্জল হোসেন স্বনামে 'বাস্তবতার আলোকে ছয়-দফা কর্মসূচী' শীর্ষক একটি দৃপ্ত রচনায় লিখলেন : 'প্রত্যেক ব্যাপারে যাঁরা আমাদের সন্দেহ করেন তাঁদের কাছে আমি একটা পালটা প্রশ্ন করতে চাই যে, পূর্ব-পাকিস্তানের বদলে পশ্চিম-পাকিস্তান যদি আজকের এই পর্বত-প্রমাণ বৈষম্যের শিকার হত তাহলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া কি হত? তাই তাঁদেরকে বলব, ধৈর্যশীল হন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে সব বিচার করুন। আমি তাঁদের আহ্বান জানাই…নিজে বাঁচুন, অপরকেও বাঁচতে দিন।'

তফাজ্জল হোসেন সাহেবের এ 'পালটা প্রশ্নে'র জবাব আয়ুব সরকার দিয়েছিলেন গত ষোলই জুন তাঁকে কারারুদ্ধ করে, আর 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে।

যে 'পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের' কথা তফাজ্জল হোসেন লিখেছেন, তার অজস্র নজিরের মধ্যে একটি পাওয়া গিয়েছিল ১০ই জুন

রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে। পররাষ্ট্র দপ্তরের পার্লামেনটারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া এক প্রশ্নোত্তরে পাকিস্তানের বৈদেশিক সারভিসে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানী কর্মচারীদের যে সংখ্যা জানান তাতে দেখা যায়—

	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
রাষ্ট্রদূত-সহ প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী	১৭৯	৫৮
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	১৯৬	৪৮
তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	৫৮	১৭
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৮৯	৮
	৫২২	১৩২

বিরোধী দলের ডেপুটি নেতা শাহ আজিজুর রহমান এ সভাতেই সংখ্যাসাম্যের বহুঘোষিতা শাসনতান্ত্রিক বিধিকে 'প্রকাণ্ড এক ধাপ্পা' বলে তীব্র ধিক্কার জানান।

এছাড়া বৈষম্যের আরও দুটি তৎকালিন দৃষ্টান্ত—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরের সেক্রেটারী মালিক আল্লা ইয়ার খান জানান যে, ১৯৬৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অর্থাৎ আট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন খাতে মোট নয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো তিন টাকা (৯,৮৬,৫০৩) টাকা খরচ করেছেন, তার মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুশো দশ টাকা (৭,৮৬,২১০ টাকা) আর পূর্ব-পাকিস্তানে মাত্র দু' লক্ষ দুশো তিরানব্বই টাকা (২,০০,২৯৩ টাকা)।

৩রা জুন জাতীয় পরিষদের চলতি অধিবেশনে যোগাযোগ দপ্তরের পার্লামেনটারী সেক্রেটারী জনাব রফিক সায়গল জানান যে, ডাকঘরের সংখ্যা পশ্চিম-পাকিস্তানে ৬৬৩০—পূর্ব-পাকিস্তানে ৫৩৩০ ; টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা পশ্চিমে ১২৮৬ কিন্তু পূর্বে মাত্র ৬০২।

পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা কিন্তু সারা দেশের শতকরা ৫৫%। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ রাজনীতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার বহু-বিতর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকর আলী ভুট্টোর বিদায়। সম্ভবত মারকিনী চাপেই পাক-রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও চীন-প্রেমী ভুট্টো সাহেবের এ অন্তর্ধান, কিন্তু এর ফলে ভারতের প্রতি পাক-পররাষ্ট্রনীতির কোন উল্লেখনীয় পরিবর্তন সুচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ—কারণ হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে 'হাজার বছরের জেহাদী' আর 'হিন্দু তমুদ্দুন খতম করবার কসম-খাওয়া' জুলফিকর সাহেবকে আয়ুব যেভাবে দিনের পর দিন বরদাস্ত করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে অন্তত ভারত-সংক্রান্ত পলিসিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। কালেভদ্রে আয়ুবের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ যে নরম স্থুর শোনা যেত, তা নেহাত বাস্তব অবস্থার চাপেই।

পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষ কোন দিনই ভুট্টোর উগ্র-প্রীতি সুনজরে দেখেননি, কারণ তাঁরা কখনও বিশ্বাস করেননি যে, পূর্ব-পাকিস্তানের দুঃসময়ে বিনা স্বার্থে সত্যিকার কোন মদত্ দিতে চীন এগিয়ে আসবে—এক অতি-বিপ্লবী বচন বর্ষণ করে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করা ছাড়া। পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব 'ইত্তেফাকে' 'মোসাফির' লিখতে দ্বিধা বোধ করেননি। 'পাক-চীন সম্পর্কের যেটুকু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, চীন-ভারত বিরোধই তার প্রধান কারণ বলে অনুমিত হয়।'

তাসখন্দ চুক্তির (যা পূর্ব-বঙ্গে সর্ব-মহলে অভিনন্দিত হয়েছিল) বাস্তবায়নেও ভুট্টো-আয়ুবের গড়িমসি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা বরদাস্ত করতে পারেননি, কারণ তাঁরা নিরন্তর উপলব্ধি করেছেন, যদিও ভারতের সঙ্গে বিশেষত পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক ও নানা স্বার্থ নানা সূত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

কিন্তু ভুট্টো-আয়ুব-চক্র তাদের সে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে ক্রমাগত প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের মনের কথাকে ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন শেখ মুজিবর রহমান, যখন তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৬৬) গোড়ায় লাহোরে তাসখন্দ চুক্তির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনারত পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি বৈঠক বর্জন করে (কারণ সেখানে তাসখন্দ-বিরোধী কথা উচ্চারিত হয়েছিল) বলেছিলেন: 'আমরা তাসখন্দ চুক্তিতে বিশ্বাসী এবং আমরা সকল জাতি, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে ও সম্মানজনকভাবে বসবাস করতে অভিলাষী।'

ভুট্টোর পতনে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল স্বস্তির-ই।

এর কিছুদিন পরেই আগস্ট মাসের প্রথমে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তান সফরে গেলেন। গেলেন বললে সত্যের অপলাপ হবে—সেখানকার ঘটনা প্রবাহ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যাপক গণবিক্ষোভের ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় একটি যুক্ত সংগ্রাম ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, উদ্বিগ্ন আয়ুব পূর্ব নির্ধারিত কোন কর্মসূচী ছাড়াই সপ্তাহব্যাপী এক সফরে ৬ই আগস্ট ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। মুখে তিনি যা-ই বলুন না কেন পূর্ব-পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর মনে আশঙ্কার সীমা ছিল না।

ঢাকায় পৌঁছেই প্রেসিডেন্ট আয়ুব স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাঁদের যেমন করে হোক শায়েস্তা করবার হুমকি দিয়ে বলেন—তাদের বেয়াদবির ফল হতে পারে মারাত্মক।

পাকিস্তানের উভয় অংশ সমধর্মী বলে আবার সেই বস্তা-পচা ধর্মের জিগীর তুলেও বলেন যে ইসলাম-ই দুই পাকিস্তানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। এমন কি তাঁর জিগীরকে জোরদার করবার জন্য পয়গম্বরের নামকেও টেনে আনতে আয়ুব দ্বিধা করেননি। এর মাত্র পাঁচ দিন আগে ১লা আগস্ট তাঁর মাস পয়লা বেতার ভাষণে তিনি বলেন যে দেশের দুই অংশকে যুক্ত করার শক্তি ও সূত্র পয়গম্বর

হজরত মোহাম্মদ-এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তাঁরা লাভ করেছেন—যতদিন এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর পারিষদ্বর্গ জাতীয় সংহতি প্রসারের জন্য পুনরায় কোমর বাঁধেন—১৪ই আগস্ট (১৯৬৬) প্রেসিডেন্টের দল কনভেনশন মুসলিম লীগ সারা দেশব্যাপী জাতীয় ঐক্য দিবস পালন করবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যায় সঙ্গীতের মাধ্যমে সংহতি প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন যাতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট! জাতীয় সংহতির হিতোপদেশ অবশ্য এই নতুন নয়—এর কিছুদিন আগে 'ইত্তেফাক'-এর কারারুদ্ধ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন তাঁর 'রাজনীতিক মঞ্চে' মন্তব্য করেছিলেন: 'অধুনা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সংহতি সাধন সম্পর্কে অনবরত উপদেশাবলী শ্রুতিগোচর হইতেছে—কিন্তু সুপার-প্যাট্রিওটিজমের সোল-এজেন্ট—এই উপদেষ্টাগণ গাছের গোড়া কাটিয়া মাথায় পানি ঢালিলে সংহতি কিভাবে হইবে আমরা বুঝি না।'

এবারকার সফরে ১০ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট আয়ুব তথাকথিত সাতজন সংখ্যালঘু নেতাকে (আয়ুবের বশংবদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বিবেকবান হিন্দু নেতারা কেউ-ই আর জেলের বাইরে ছিলেন না) দিয়ে একটি বিবৃতি প্রচার করান, যাতে বলা হয় যে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা সুখে, শান্তিতে ও সম্প্রীতিতে যেন বেহেস্তে বাস করছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা আয়ুবী শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় কি সুখেই না ছিলেন তার খানিকটা পরিচয় মিলবে সে বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবটির এই অংশ থেকে—'ইহা দুর্ভাগ্যজনক যে সরকারের বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ প্রচারের

সাথে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্বিচারে নির্যাতন চালান হইতেছে।'

৭ই আগস্ট সকালে ঢাকায় লাট ভবনে কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি সভায় তাঁর নিজের দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আয়ুব মুসলিম লীগকে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন একমাত্র পার্টি বলে অভিনন্দিত করে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে ওঠবার উপদেশও বর্ষণ করেন।

এই সভাতেই ইসলামী আদর্শে গঠিত শাসনতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে আয়ুব বলেন যে মৌলিক গণতন্ত্রের অলৌকিক সাফল্যে তিনি গর্বিত।

পূর্ব-বঙ্গে আয়ুবের গর্বের বস্তু বেসিক ডেমোক্র্যাসির সেই সাফল্যের কিছুটা ফিরিস্তি দেওয়া যাক।

পূর্ব-পাকিস্তানের গণজীবনে সমস্যার অন্ত ছিল না। একদিকে গণতন্ত্রের বিলোপ, আয়ুবী স্বৈরাচার, পর্বত প্রমাণ বৈষম্য প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলি তো ছিলই, তাছাড়া বন্যা, খাদ্যাভাব, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উচ্চমূল্য, উত্তরোত্তর কর-বৃদ্ধি, হাজার-হাজার দেশ-প্রেমিকের বন্দীদশা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, নিষ্ঠুর দমননীতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সঙ্কটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছিল।

কৃষিপ্রধান পূর্ব-পাকিস্তানের চাষীরা উপর্যুপরি বন্যা, শস্যহানি, করভার, লেভী ও সার্টিফিকেটের দাপটে নিপীড়িত—সর্বস্বান্ত হয়েছিল।

প্রখ্যাত কবি জসিমুদ্দিন বহুদিন পরে ফরিদপুর জেলায় তাঁর স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে গিয়েছিলেন। ঢাকায় ফিরে তিনি 'ফরিদপুরে কি দেখিলাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (২৭শে জুলাই, ১৯৬৬ প্রকাশিত) দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'গ্রামে আসিয়া অনাহারের যে হাহাকার দেখিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

গভর্নর মোনেম খান নিজেই ১৫ই জুলাই (১৯৬৬) এক বেতার

ভাষণে কবুল করেন যে সে বছরের বন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের ৫৭ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছিল—সুতরাং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা সহজেই অনুমেয়।

এই নিঃস্ব কৃষককুলের দারুণ দুঃসময়েও তাদের ওপর নির্বিচারে সার্টিফিকেট, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও ক্রোকের হুলিয়া জারী করে নানা নির্যাতনমূলক পন্থায় রাজস্ব আদায় করা হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ বগুড়া জেলায় দশ হাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ও ঘোলদারী তহশিলে প্রায় ছয় হাজার কৃষকের ওপর ডিস্ট্রেশ ওয়ারেণ্ট জারী করা হয়। অর্থাৎ খাজনা দিতে না পারলে তাদের বাড়িঘর জমি জমা সব নীলামে উঠবে।

বন্যার ফলে বহু জমিতে ফসল হয়নি। অথচ যথেচ্ছভাবে ধার্য করা লেভী দিতে না পারায় অসংখ্য কৃষকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলছিল। উদাহরণস্বরূপ বরিশাল জেলার পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত আমতলীর দুজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী—জনাব গিয়াসুদ্দিন আহমেদ ও জনাব এস. এস. আলমের বিবৃতি অনুযায়ী তাঁদের গ্রামের বহু লোকের নামে বডি ওয়ারেণ্ট বের করায় ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। এমন কি অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। শিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত বড়লেখা থানার এলাকাধীন শাহবাজপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের নান্দুয়া গ্রামের জনাব মুস্তাকীম আলীর বন্যা-প্লাবিত জমিতে সেবছর সর্বমোট ১০ মণের বেশী ধান হয়নি যদিও তার উপর লেভী ধার্য করা হয়েছিল ২১ মণ ধান। কবি জসিমুদ্দিনও তাঁর গ্রামে দেখে আসেন যে তাঁর প্রজা ওয়াজেদ মণ্ডলের ক্ষেতে একটিও ধান হয়নি। অথচ তিনি ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচনে সরকার দলীয় বেসিক ডেমোক্রাট গ্রাম ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যানকে সমর্থন না করায় তার উপর ৫০ মণ লেভী ধান ধার্য করা হয়।

'দুশমন' প্রতিবেশী 'হিন্দুস্থান' থেকে তেণ্ডুপাতা আমদানী নিষিদ্ধ

করে অর্ডিনান্স জারী করবার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের ৭ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক তাদের পরিবারের ৪০ লক্ষ নরনারী ও শিশুসহ অনাহারের সম্মুখীন হন। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান সাহেব যিনি নিজেকে প্রদেশবাসীর বিরাট হিতৈষী বলে দাবী করতেন—১৫ই জুলাই (১৯৬৬) ঢাকা রেডিও থেকে এক বেতার ভাষণে যাঁরা হিন্দুস্থান থেকে তেণ্ডুপাতা আমদানী সমর্থন করেন তাদের দেশের পঞ্চম বাহিনী বলে আখ্যা দিয়ে তাদের বিচার করবার কথা বলেন।

ভারতে পাট রপ্তানী নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানের পাট-চাষীরা যে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তার একটি চিত্র ফুটে ওঠে ফরিদপুরের গ্রাম্য কবি রেয়হান বয়াতির লেখা একটি গানের কটি কলিতে

চাউলের কথা বলব কি ভাই
পাটের কথাই কই
এই পাটের রশি গলায় দিয়া
গাছে ঝুইল্যা রই।

কেরোসিল, সাবান, লবণ,সূতীকাপড়, পোস্টকার্ড ইত্যাদি নানা নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উপর চড়া ট্যাক্স ধার্য করা হয়, যাকে বিরোধী-দলের সদস্যরা পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের বাজেট-অধিবেশনে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বলে অভিহিত করেন।

'দুর্নীতি এখন আয়ুবের বেসিক ডেমোক্র্যাসির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে'—২৪শে জুন (১৯৬৬) প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী সদস্য জনাব সাত্তার খান চৌধুরী দুর্নীতির প্রায় অবিশ্বাস্য ও নজীরবিহীন একটি ঘটনার কথা প্রকাশ করে বলেন যে, পাবনা জেলায় ঈশ্বরদি ও সারা স্টেশনের মধ্যে ছয় মাইল দীর্ঘ অব্যবহৃত একটি রেল লাইন অদৃশ্য হয়েছে। জানা গেছে যে রেলের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মচারীর যোগসাজসে ঐ রেললাইন বিক্রি হয়ে গেছে।

সংবাদপত্রের উপর সরকারী হামলা অব্যাহতই ছিল। ইত্তেফাক

গোষ্ঠীর তিনটি কাগজ ছাড়াও খুলনার ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ওয়েভ' বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক' ও বরিশালের পাক্ষিক পত্রিকা 'খাদেট' প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে তাঁদের অফিস তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সরকার সমালোচক কাগজগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রায় বন্ধই করে দেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলন যাতে দানা না বাঁধতে পারে সেজন্য ব্যাপক ও বেপরোয়া ধরপাকড় অব্যাহত ছিলো। বিশেষ করে সে সময়ের আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের কর্মীদের নির্বিচার ধরপাকড়ের ফলে এক কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। ৭ই জুনের পূর্ব-বাংলা বন্ধের প্রাক্‌কালে দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গ্রেপ্তার হবার পর একে একে যারাই অস্থায়ীভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরাই কারারুদ্ধ হয়েছেন।

অবশেষে সাধারণ সম্পাদকের পদে মনোনীত হয়েছিলেন জনৈকা মহিলা নেত্রী—প্রাক্তন পরিষদ সদস্যা মিসেস আমীনা বেগম। অবশ্য ইনি এবং এঁর স্থলাভিসিক্ত পরবর্তী নেতারাও আয়ুবের রুদ্ররোষের বলি হতে পারেন অনুমান করে পরপর কয়েকটি নামের একটি প্যানেল পূর্বাহ্ণেই তৈরী করে রাখা হয়েছিল—যাদের মধ্যে ছিলেন—আবদুস সালাম খান, গাজী গোলাম মোস্তাফা প্রভৃতি নেতারা।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শগত ও কর্মসূচীর মধ্যে নানা মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, বৈষম্য দূরীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জরুরী অবস্থার অবসান, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, বন্দীমুক্তি ইত্যাদি কয়েকটি জাতীয় সমস্যার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেন।

জাতীয় পরিষদের বিরোধীনেতা জনাব নুরুল আমীন ১৯শে জুন (১৯৬৬) ঢাকার শাহাবাদ হোটেলে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের এক যুক্ত সভায় বলেন যে, যদি আমরা এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি তবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে কোন আশাই আমাদের নেই।

ন্যুনতম একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবার জন্য ৩১শে জুলাই (১৯৬৬) ঢাকায় জনাব নুরুল আমীনের ২০নং ইস্কাটন রোডের বাসভবনে বিভিন্ন বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলামী ও স্বতন্ত্র দলের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছাড়া অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে সরকার গঠনের দাবী ছাড়া অন্য কোন বিষয় ন্যুনতম কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে একমত হতে পারেননি।

আওয়ামী প্রতিনিধিরা ছয় দফার ও ন্যাপ প্রতিনিধি তাদের ১৪ দফার প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করলেও তাঁরা এর বহির্ভূত অন্যান্য জরুরী জাতীয় সমস্যার ভিত্তিতে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিনিধি জনাব মহীউদ্দিন আহমেদ বলেন যে অন্তত খাদ্য, বন্যা, সরকারী দমননীতি, স্বায়ত্ত শাসন ও বৈষম্য দূরীকরণের দাবী নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। সেদিনের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ফলপ্রসূ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হলেও সমবেত নেতারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি যৌথ ভিত্তি গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সম্মত হন।

ইতিপূর্বে ১৮ই জুলাই ঢাকায় ৩৮ লিয়াকৎ আলী এ্যাভিনিউতে

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মৌলানা ভাসানী বিভিন্ন দলগুলির ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং ১৭ই ও ১৮ই জুলাই ৪৬নং কাপ্তান বাজারে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—'আসুন দেশের এই ঘোর সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তুলি।'

সাপ্তাহিক জনতা 'সংগ্রামের মশাল জ্বালো, জ্বালো ঐক্যের প্রদীপ'-শীর্ষক একটি দৃপ্ত সম্পাদকীয়তে লেখেন—'আজ-আমাদের সামগ্রিক আন্দোলনের মশাল জ্বালাইতে হইবে, জালাইতে হইবে ন্যূনতম কর্মসূচী ভিত্তিক সম্মিলিত আন্দোলন ও ঐক্যের প্রদীপ শিখা।'

২৩শে ও ২৪শে জুলাই (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে ১৬ই আগস্ট প্রস্তাবিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আন্দোলন সুরু করবার পূর্ব-সিদ্ধান্ত পুনসমর্থিত হয়।

আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে ছিল হরতাল, আইন অমান্য আন্দোলন, ছাত্র-ধর্মঘট, কলকারখানা ও অফিসে কর্মবিরতি, ভুখা মিছিল, জনসভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, গণডেপুটেশন, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি।

পূর্ব-পাকিস্তানে এই আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য কলকারখানার শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ এর পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে সুরু করে পূর্বেকার প্রতিটি আন্দোলনের মূল শক্তি ছিলেন ছাত্র ও শহর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার জিগীর তুলে পেটোয়া গোষ্ঠীকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে পূর্ব-বঙ্গের গণ আন্দোলনকে বানচাল করবার নানা ফন্দি-ফিকির আঁটছিলেন আয়ুব সরকার। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের "মজলুম জনতা" সেদিন জালেম আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সামিল হয়েছিলেন। গ্রাম্য কবিয়াল কুব্বত আলী বয়াতি একটি উদ্দীপ্ত কবিতার কয়েকটি ছত্রে আয়ুব-শাহীর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে বলেন :

ছাত্র-শিক্ষক মজুর আরও মিলের কুলি।
ন্যায্য দাবী করতে গেলে তাদের মারেন গুলি॥
স্বৈরতন্ত্রের গুণ্ডাবাজি জানে সর্বজন।
বে-আইনকে আইন করে সে যখন তখন॥
আয়ুব-শাহীর শাসনতন্ত্র কুটিল মন্ত্র ভাই।
স্বাধীনভাবে কইব কথা এমন সাধ্য নাই॥
সংবাদপত্র পায় না দিতে সত্য সমাচার।
কণ্ঠ তাদের বন্ধ করে লীগ-শাহী সরকার॥
এ দীন কবি আরজ করি হিন্দু মুসলমান।
মিথ্যা লোভে ভুইলা ভাইরে বেইচনা ঈমান॥

বিরোধী দলের সদস্য জনাব আহমেদুল কবীর ঢাকায় আয়ুব চক্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে তাঁরা বুলেট দিয়ে জনসাধারণের দাবী-দাওয়াকে আর স্তব্ধ করতে পারবেন না। তিনি প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিখ্যাত বাগ্মী বার্কের একটি অমর উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন—'আপোষ করুন, আপোষ ব্যর্থ হলেও শক্তি থেকে যায় কিন্তু শক্তি ব্যর্থ হলে আপোষের আর কোন পথ থাকে না।'

একটু আগে মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির ১৪ দফা দাবীর কথা উল্লেখ করেছি। এই ১৪ দফার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৬৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই অবিবেশনে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৪ দফা দাবি

সম্বলিত একটি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। সেই কর্মসূচীতে উল্লিখিত দাবীগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. "সিয়াটো" ও "সেন্টো" ও পাক-মার্কিন চুক্তির ন্যায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক জোট বর্জন, সমাজতান্ত্রিক ও আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং পাকিস্তান কর্তৃক স্বাধীন নিরপেক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈদেশিক নীতির অনুসরণ।

২. যুক্তি-সঙ্গত সময়ের মধ্যে জাতি-সঙ্ঘের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে কাশ্মীর বিরোধের সমাধান ব্যর্থ হলে পাকিস্তান কর্তৃক জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।

৩. শর্তাধীন অর্থনৈতিক সাহায্য, বিশেষ করে মার্কিন অর্থ-নৈতিক সাহায্য এবং অসম-বাণিজ্য ও শিপিং চুক্তি বাতিল। সমাজ-তান্ত্রিক, আফ্রো-এশিয় ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন।

৪. সরকার কর্তৃক আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গঠনের উদ্যম গ্রহণ। সকল মূল শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জাতীয়করণ এবং সরকারী মালিকানায় ভারি শিল্পের বুনিয়াদ স্থাপন।

৫. প্রাপ্ত-বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লা-মেণ্টারী গণতন্ত্র ও অবাধ মৌলিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৬. রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।

৭. বৃহৎ ভূস্বামীত্বের বিলোপ সাধন। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০৲ টাকা, ইক্ষু'র সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৩ টাকা ৪০ পয়সা এবং তামাকের ন্যায্য মূল্য ধার্যকরণ।

৮. দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যতিরেকে পাকিস্তানের উভয় অংশের হস্তে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্পণ।

৯. সংস্কৃতি, ভাষা ও ভৌগোলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে পুনর্বিন্যাস।

১০. পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা একাডেমী ও প্রতিরক্ষা শিল্প স্থাপন।

১১. শ্রমিকদের যৌথ দর-কষাকষির ও ধর্মঘটের অবাধ অধিকার, কলকারখানা সমূহের ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই বন্ধ, বেকার শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও সমস্ত শ্রমিক-বিরোধী আইনের অবসান। মালিক কর্তৃক জরুরী অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ বন্ধ ও আটক বোনাসের পুনঃপ্রদান।

১২. সমস্তরকম দমনমূলক আইন প্রত্যাহার এবং কোয়েটা ও কালাত সংশোধনী বিধি বাতিল।

১৩. দীর, সোয়াত, চিত্রলের ন্যায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহের সহিত উপজাতীয় এলাকাগুলির মিলন।

১৪. সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা। সকল সক্ষম ব্যক্তির সামরিক শিক্ষা-লাভের সুযোগ এবং দেশের উভয় অংশে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চৌদ্দ দফা দাবীও যে পূর্ব-পাকিস্তানে খুবই জনপ্রিয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৬৭ সালেও পূর্ব-পাকিস্তানের অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষ ও উত্তাল ছাত্র-সমাজ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ঐতিহাসিক ৭ই জুন পালন করেন। এই দিবসটিকে তাঁরা 'গণ-অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দিন' বলে অভিহিত করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা আমেনা বেগম সাহেবা জানান যে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা দাবী রূপায়ণের দাবীতে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের এ দিনটিতে স্মরণ করা হবে। দেওয়ালপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রচার এবং পথসভা, আলোচনা-সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই এই স্মরণীয় দিবসটি উদ্‌যাপিত হবে।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের মে মাসে আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জয়দেবপুর ও নারায়ণগঞ্জ সহ ঢাকা ও শহরতলী এলাকায় অকস্মাৎ ১৪৪ ধারা জারী করে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ঢাকার বাংলা একাডেমী তাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিন দিন ব্যাপী নজরুল-জয়ন্তীর আয়োজন করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব আবু সঈদ চৌধুরী। দ্বিতীয় দিনে আলোচনা সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু শত-শত শ্রোতা একাডেমীর প্রবেশদ্বারে এসে সবিস্ময়ে জেলা-শাসকের একটি বিজ্ঞপ্তি দেখতে পেলেন: শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। অতএব নজরুল জয়ন্তী উৎসব বাতিল হোল।

আগ্রহী শ্রোতারা নিরাশ হয়ে ফিরে সাবার সময় সখেদে মন্তব্য করেছিলেন: কবি নজরুলের প্রতি আয়ুব সরকারের অপার শ্রদ্ধার (যা তাঁরা সরবে প্রচার করে থাকেন) এই কি নিদর্শন!

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের একান্ত বশংবদ পূর্ব-পাকিস্তানের লাট-বাহাদুর জনাব আবদুল মোনেম খান ৬ই জুন একটি বিবৃতিতে হুঁশিয়ারী দিয়ে জানান: '৭ই জুন যারা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে তারা দেশদ্রোহী—তারা সাবধান। সরকার তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে—তাদের উদ্দেশ্য বিফল হবে।'

আওয়ামী লীগের তরফ থেকে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করা হোল যে ৭ই জুন কোন সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান আদৌ জানান হয়নি। অতএব জনাব মোনেম খানের বিবৃতিতে হরতালের উল্লেখ সম্পূর্ণ ই ভিত্তিহীন ও সেই সঙ্গে উস্কানিমূলক।

পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব ফেরদৌসী আহ্মদ কোরেশী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক আকস্মিক ১৪৪ ধারা জারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: 'আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ৭ই জুনের কর্মসূচীকে নস্যাৎ

করবার উদ্দেশ্যেই ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে স্বেচ্ছাচারমূলক ও অগণতান্ত্রিক এবং জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর এক বিরাট হামলা-স্বরূপ।

১৪৪ ধারা জারী করেই শেষ নয়—সরকারী আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল (ইনজিনীয়ারিং) বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকার প্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও শহরের নানা স্থানে লৌহ-শিরস্ত্রাণধারী সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

এর পর সুরু হয় ব্যাপক ধড়পাকড়—ফলে শহরময় হয় পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন ছাত্র নির্দোষ ইস্তাহার বিলি করছিল—সে সময় এক সুবৃহৎ পুলিশ বাহিনী কলেজ-কর্তৃপক্ষের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করে। পরে কলেজের অভ্যন্তরে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়।

৬ই জুন গভীর রাত্রে ইকবাল হল, ঢাকা হল, ফজলুল হক হল, প্রভৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলি কারাগারে পরিণত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ইকবাল হলে খানাতল্লাশী চালিয়ে বহু আবাসিক ছাত্রকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও তাদের একজনের পিতা (তিনি স্বগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে সে রাতটা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তাঁর পুত্রের অতিথি হিসাবে ছাত্রাবাসে অতিবাহিত করছিলেন) মাদারীপুরের জাজিরাপুর হাইস্কুলের শিক্ষক বর্ষীয়ান জনাব আবদুস সালামকে গ্রেফতার করতেও দ্বিধা করেনি আয়ুব-শাহীর পুলিশবাহিনী।

সেদিনই রাত প্রায় বারোটার সময় ফজলুল হক মুসলিম হলের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল সুষুপ্ত—কয়েকজন রাত জেগে তাদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—অকস্মাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ হল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ছাত্রদের কয়েকটি ঘর তছ্‌নছ্‌ করে এবং বহু

ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট পরদিন জানান যে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি নেওয়া দূরে থাকুক তাঁদের সঙ্গে সামান্যতম যোগাযোগও করেননি।

এছাড়া যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক ছাত্র-লীগ সম্পাদক ফেরদৌসী কোরেশী, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ছাত্র-নেতা মণিরুল ইসলাম ও পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী।

১৪৪ ধারা জারী হবার দরুণ ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা প্রকাশ্য স্থানে কোন জনসভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা না করে ৭ই জুন সন্ধ্যায় কার্জন হলে মিলিত হবেন।

কিন্তু ঢাকার জেলাশাসক জনাব কে. এম. আনওয়ার শহরবাসীকে হুঁশিয়ারী দিয়ে জানান যে তাঁরা যেন কার্জন হলে সভার অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকেন। অন্যথায় প্রতিক্রিয়া হবে গুরুতর।

সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে জনাব আনওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা হোল অনেকটা এ রকম :

সাংবাদিকগণ :—কার্জন হলের অভ্যন্তরে সভা করতে বাধা কি? তাতে তো ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হচ্ছে না!

জেলাশাসক :—এসব ক্ষেত্রে ১৪৪ ধারার আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে চলবে না। আমরা তা করিও না। যারা সভা করছে তাদের আদর্শ বা উদ্দেশ্যটাই আমরা বিচার করি।

সাংবাদিকগণ : ১৪৪ ধারার যথার্থ প্রয়োগের যে বিশ্লেষণ আপনি করলেন তাতে আমরা তাজ্জব বোধ করছি।

জেলা শাসক : অপনারা যাই মনে করুন না কেন ছাত্ররা যাতে কার্জন হলে সভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা না করে সে কথা প্রচার করুন। যদি এ ব্যাপারে তারা কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবে অতি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দরকার হলে গুলি-চালনাও।

৭ই জুন সন্ধ্যায় কার্জন হলে সভা অনুষ্ঠানের কোন সুযোগই উদ্যোক্তারা পাননি। অতি প্রত্যুষেই কার্জন হলের সবগুলি প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ করে পুলিশবাহিনী টহল দিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

৭ই জুন ঢাকা গরীব নগরীতে পুলিশের সংখ্যাধিক্যে ও তাদের তৎপরতার বহর দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারা পূর্ব-পাকিস্তানের আরক্ষা-বাহিনীকে উৎপাটিত করে শহরে এনে একত্রিত করা হয়েছে।

এত বাধা-নিষেধ ও হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ইকবাল হলে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধুর রেস্তোরা'য় দুটি সভা অনুষ্ঠিত করে শহীদ দিবস পালন করা হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানান হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসের উপর পুলিশী জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে পুলিশের অনধিকার প্রবেশ পূর্ব-পাকিস্তানে কোন নতুন ঘটনা না হলেও গভীর রাত্রে ছাত্রাবাসে পুলিশের হানা ও কামরায়-কামরায় ঢুকে ছাত্রদের বলপ্রয়োগপূর্বক টেনে তুলে তল্লাশী চালান এ ধরনের বর্বরতা এই প্রথম। এ সব ঘৃণ্য কার্যকলাপকে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন নাগরিক সমর্থন করতে পারে না।

এ ছাড়া সে বছর (১৯৬৭) পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ৭ই জুন প্রাদেশিক বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা ছাত্রদলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদ্ কক্ষ ত্যাগ করেন।

কিন্তু নিবর্তন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এত থাকা সত্ত্বেও পূর্ব-বঙ্গের সর্বত্র অসাধারণ নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে ৭ই জুনের প্রথম বার্ষিক উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

সভায়-সভায়, মিছিলে-মিছিলে, আওয়াজ উঠেছিল—

৭ই জুন অমর হোক

ছয়-দফা জিন্দাবাদ্

স্বায়ত্ত শাসন আমাদের প্রাণের দাবী, জানের দাবী

প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একই সুর—একই সঙ্কল্প—৭ই জুন শহীদের রক্তদান ব্যর্থ হবে না। তাদের আত্ম-বলিদান ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবন্ত উৎস হয়ে থাকবে।

অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখনই উঠেছে তখনই শোষকের দল ও তাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—যে বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সমাজ পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঐ কথা বলেন। শেখ মুজিবর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবী ও ৬ দফা কর্মসূচী' এই নাম দিয়ে একটি ঐতিহাসিক পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। এই পুস্তিকাটি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এর হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। শেখ মুজিবর তাঁর এই পুস্তিকায় বলেন, 'আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবীতে যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে-পাঁচ কোটি শোষিত ব্যথিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।' তাঁর ছয়-দফা দাবীগুলির বিশ্লেষণ করে শেখ মুজিবর পশ্চিম-পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

'আপনারা ঐ সব দাবী করিলে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতা বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ওসব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না।'

কায়েমী স্বার্থের কুৎসা

উপসংহারে মুজিবর বলেছেন, 'কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম্ লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এ-ও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয়-নেতা শহীদ সোহরাবর্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্দির আমার হইয়াছে। সাড়ে-পাঁচ কোটি পূর্ব-পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যেকোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু?'

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র আবুল কালাম আজাদ 'পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের শোষণের একটি করুণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেন। শিল্প, বাণিজ্য, চাকরি অর্থনৈতিক—প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল। লেখক এতে বৈষম্য-সংক্রান্ত নানা তথ্য উৎঘাটিত করে বলেন :

'গত দুটি পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে মোট ৭৯·৫৫৫ কোটি টাকা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে ১১৪·৩৫০ কোটি টাকা। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত

পূর্ব-পাকিস্তান বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায় ৪৭৪ কোটি টাকা লাভ করেছে, আর পশ্চিম-পাকিস্তান ঐ সময়ের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে লোকসান দিয়েছে ৭০৩ কোটি টাকা।'

চাকরির বৈষম্য

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটে সেক্রেটারীর পদে একজনও পূর্ব-পাকিস্তানী নেই। ৪২ জন সেক্রেটারীর মধ্যে ৪২ জনই পশ্চিম-পাকিস্তানী। জয়েণ্ট সেক্রেটারীর পদে পূর্ব-পাকিস্তানী ৮ জন আর পশ্চিম-পাকিস্তানী ২২ জন। ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে পূর্ব-পাকিস্তানী ২৩ জন ও পশ্চিম-পাকিস্তানী ৫৯ জন। সেকসন অফিসার পূর্ব-পাকিস্তানী আছেন যেখানে ৫০ জন সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সংখ্যা হল ৩২৫ জন। পূর্ব-পাকিস্তানী প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা যেখানে ৮১১, সেখানে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সংখ্যা ৩৭৬৯। দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা হল পূর্ব-পাকিস্তানী ৮৮৪ আর পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সংখ্যা হল ৪৮০৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা হল পূর্ব-পাকিস্তানী ১১৮০ : পশ্চিম-পাকিস্তানী ৫৫৫১। তৃতীয় শ্রেণীর নন-গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা হল পূর্ব-পাকিস্তানী ১৩,৭২৪ : পশ্চিম-পাকিস্তানী ১,৩৭,৯৭৫। ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলসেও প্রচুর সংখ্যক পশ্চিম-পাকিস্তানী রয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান পুলিশে ও পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পশ্চিম-পাকিস্তানী রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সব মালিকই পশ্চিম-পাকিস্তানী।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব-পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৯৮ কোটি টাকা; আর পশ্চিম-পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে ৪৯৬ কোটি টাকা। বিক্রয় কর পাট শুল্কের খাতের আয়ের সূত্র

পূর্ব-পাকিস্তানের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে যাওয়ায়, পূর্ব-পাকিস্তান বছরে দশ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের ভেতরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মামলার বিচার চলার সময় পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

জেরার সময় আসামীপক্ষের উকিল জনাব জহিরুদ্দিন সরকারী পরিসংখ্যান এবং পাকিস্তানের মন্ত্রীদের বিবৃতিকে ভিত্তি করে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

দৃষ্টান্তরূপে দুই অঞ্চলের চাকরির শতকরা হারের কথা বলা হয়েছিল। প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারিয়েটে পশ্চিম-পাকিস্তানের যেখানে শতকরা ৮১ জন, পূর্ব-পাকিস্তানের যেখানে ১৯ জন চাকরি করেন।

অন্যান্য দপ্তরের ক্ষেত্রে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়—পশ্চিম-পাকিস্তান ৯১·৯%, পূর্ব-পাকিস্তান ৮·১%; শিল্প মন্ত্রক—এখানে শতকরা ৪৫·৭ জন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়—শতকরা ৭৭·৫ জন পশ্চিম-পাকিস্তানের লোক; শিক্ষা দপ্তর—পূর্ব-পাকিস্তান ২৭·৩%; তথ্য মন্ত্রণালয়—শতকরা ২০·১ জন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক; স্বাস্থ্য-মন্ত্রী দপ্তর—শতকরা ৮১ জন পশ্চিম-পাকিস্তানের লোক; কৃষি মন্ত্রণালয়—শতকরা ২১ জন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক এবং আইন মন্ত্রণালয়—শতকরা ৩৫ জন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক।

সমস্ত মন্ত্রণালয়েই পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকদেরই বেশি প্রাধান্য রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে এক বৎসরের মধ্যে পাকিস্তানের বৈদেশিক দূতাবাসের জন্য ১০ জনকে নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের মাত্র ২ জন ছিলেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানের এক অংশে কম পক্ষে ৯৮টি মিল, পূর্ব-পাকিস্তানে সেখানে ঐ ক্ষেত্রে এখন ৪৫টি মাত্র। দেশ

বিভক্ত হওয়ার আগেকার চিত্র ছিল কিন্তু অন্যরূপ। তখন পূর্ব-পাকিস্তানে ১১টি বস্ত্রকল ছিল এবং পশ্চিম-পঞ্জাবে ছিল মাত্র ৬টি।

পূর্ব-বাংলার কি পরিমাণ সম্পদ গ্রাস ক'রে কি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন ঘটেছে তার একটা হিসেব দিয়েছেন, বিদেশী বিশেষজ্ঞ John H. Power করাচী থেকে প্রকাশিত Pakistan Development Review পত্রিকার তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় (Vol III, No : 2)। বিশেষজ্ঞ পাওয়ার সাহেবের হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-বাংলার রপ্তানির উদ্‌বৃত্ত ১৫০ কোটি টাকা সরাসরি গ্রাস করেছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পশ্চিম-পাকিস্তান এই কয় বছরে ৩৫০ কোটি টাকা লাভ করেছে। তাছাড়া জিনিস-পত্রের দাম শতকরা ৪০ ভাগ ফাঁপিয়ে পূর্ব-বাংলার আরো ৩০০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তান আত্মসাৎ করেছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব-বাংলা যে ৩৫০ কোটি টাকা খুইয়েছে সেটা যদি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ব্যাপার বলে বাদ দেওয়া যায় তাহলেও দেখা যায় যে পশ্চিম-পাকিস্তান এই কয় বছরে পূর্ব-পাকিস্তানের ২৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

কিন্তু শোষণের খতিয়ান এই খানেই শেষ হয়নি। এই কয় বছর বিদেশী সাহায্য বাবদ প্রাপ্ত ৩৯০ কোটি টাকাও পশ্চিম পাকিস্তান নিজের ভোগে লাগিয়েছে। পূর্ব-বাংলার জনসংখ্যা অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যের টাকা পূর্ব-বাংলারও প্রাপ্য ছিল একথা মনে রাখলে, Power সাহেবের মতে, পশ্চিম পাকিস্তান যে টাকা গ্রাস করেছে তার অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পাঁচশো কোটি টাকা এই কয় বছরে পূর্ব-বাংলার ন্যায্য অংশ থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান আপন কুক্ষিগত করেছে। আর যদি এর সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব-বাংলার ক্ষতি ৩৫০ কোটি টাকা যোগ দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় যে, পশ্চিম-পাকিস্তান ১৯৬১ সালের মধ্যে পূর্ব-বাংলার ৮৫০ কোটি টাকা গ্রাস করেছে।

পাওয়ার সাহেব যে হিসেব দিয়েছেন তাছাড়াও শোষণের ক্ষেত্র আরো অনেক বিস্তৃত। কেন্দ্রীয় রাজস্বের ব্যয়, সামরিক খাতে খরচ, পরিকল্পনা বহির্ভূত নানা ব্যয়ের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে কেন্দ্রের কাছে পূর্ব-পাকিস্তান শুধু দিয়েছে আর পেয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তান। এই দেওয়া-নেওয়ার একটা হিসেব দিয়েছিলেন পূর্ব-পাকিস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুন করাচীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রকাশ করেন যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ২২২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে। আর রাজস্ব থেকে খরচ করে মাত্র ৬৩ কোটি টাকা। অথচ ঐ কয় বছরে পাক-সরকার পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ৮১১ কোটি টাকা রাজস্ব হিসেবে আদায় করলেও খরচ করেছে ১০০৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পূর্ব-পাকিস্তানে পাক সরকার খরচ করেছে আদায়ের শতকরা পঁচিশ ভাগের কিছু বেশী আর পশ্চিম-পাকিস্তানে খরচ করেছে আদায়ের শতকরা ১২৫ ভাগ! সামরিক খাতে খরচের ব্যাপারে এই শোষণমূলক বৈষম্য কারো অনেক ব্যাপক। আতাউর রহমান খানের প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী জানা যায় যে, সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে সামরিক খাতে ৪৮০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, সেই সময়ে পূর্ব-বাংলায় খরচ করা হয়েছে মাত্র ১৮ কোটি টাকা!

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আয়ুব খাঁর জঙ্গী সরকার ক্ষমতা গ্রাস করবার পর অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি ঘটেনি। এখনো বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ থেকে ৮৬ ভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। সামরিক খাতে যে মোট খরচ হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানেই খরচ করা হয়। কেন্দ্রীয় রাজস্বের অধিকাংশ যথারীতি পশ্চিম-পাকিস্তানেই খরচ হয়ে থাকে।

বিপুল হারে এই শোষণের ফলে একদিকে পূর্ব-বাংলার শিল্পোন্নয়ন হয়েছে ব্যাহত, বেকারির হার ক্রমেই বাড়ছে, মাথাপিছু আয় কমে

চলেছে, কৃষিতে আয় না থাকলেও কৃষিনির্ভর লোকের বৃদ্ধি বেড়ে যাচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষিতের হার ভয়াবহ ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্পোৎপাদন ত বাড়ছেই, এমনকি কলকারখানায় নিযুক্ত জনসমষ্টিও বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মাথা-পিছু আয় এবং উচ্চশিক্ষিতের হার।

শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের বর্তমান দুর্গতির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত Census of Manufactures থেকে। এর থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানের মূল ধাতুশিল্প বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্পে মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র দুই ভাগ পূর্ব-বাংলায় উৎপন্ন হয়। পরিবহণ যন্ত্রপাতির উৎপাদনে পূর্ব-পাকিস্তানের স্থান এত নগণ্য যে, তার হিসাব পাওয়া যায় না। শুধু ভারী শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, প্রয়োজনীয় নানা পণ্যের উৎপাদনেও পূর্ব-বাংলাকে অত্যন্ত নিচুতে ফেলে রাখা হয়েছে। পূর্ব-বাংলায় জুতোর উৎপন্নের পরিমাণ পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র চার ভাগ। এমনকি সিগারেট উৎপাদনেও পূর্ব-বাংলার বিশেষ স্থান নেই, যদিও উত্তর-বঙ্গের তামাক একদিন ভারত ছাড়িয়ে ব্রহ্মদেশেও বিক্রি হ'ত। পাকিস্তানের বয়নশিল্পে, মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশেরও কম তৈরী হয় পূর্ব-বাংলায়। এই ভাবে শিল্পোন্নয়নের প্রায় সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যন্ত্রশিল্পে পূর্ব-বাংলাকে সম্পূর্ণ অনুন্নত ও অক্ষম করে রাখা হয়েছে।

অথচ এই সব শিল্পের বিকাশে পশ্চিম-পাকিস্তানের নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্প—বিশেষত ভারী ও যন্ত্র-শিল্পকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় আমদানির ওপর। বিভিন্ন ভারী শিল্পে আমদানির অংশ কত বেশী তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে।

শিল্প	মোট কাঁচা মাল	আমদানি করা কাঁচা মাল	মোট কাঁচা মালের তুলনায় আমদানি কাঁচা মালের হার
	(দশ লক্ষ টাকার অঙ্কে)		
রবার	৮·০	৭·৫	৮·৫
রাসায়নিক ও খনিজ তৈল	৮৮·৮	৫৪·৮	৬১·৭
মূল ধাতু	৬৪·৫	৪৫·০	৬৯·৮
যন্ত্রপাতি	২৮·৫	১৬·০	৫৬·১
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	২৯·৫	১৯·০	৬৪·১
পরিবহণের যন্ত্রপাতি	৩৬·০	৩১·০	৮৬·১

(দ্রষ্টব্য : পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র 'Effects of National Income, Employment and Foreign Exchange position of the Industry Programme' এটি উদ্‌ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জনাব নুরুল ইসলাম লিখিত 'Some aspects of Interwing trade and terms of trade in Pakistan' P. D. R. Vol 3, no. 1) প্রবন্ধে।

উপরোক্ত তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের সমস্ত মূলশিল্প প্রধানত আমদানির ওপর নির্ভর করে। এই আমদানির টাকাটা আসে পূর্ব-বাংলার চা ও পাট রপ্তানি থেকে। এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের রপ্তানির শতকরা সত্তর ভাগ আয় পূর্ব-পাকিস্তানের পণ্য থেকেই আসে। এইভাবে পূর্ব-বাংলাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে পশ্চিম-পাকিস্তানে শিল্পবিস্তার করে চলেছে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকবর্গ।

শিল্পে এই দুর্দশার জন্যে পূর্ব-বাংলা বাণিজ্যেও পশ্চিম-পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিক আর্থিক ব্যবস্থার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য তাও পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

বিশেষ প্রকট। পূর্ব-বাংলা থেকে যায় কাঁচা চামড়া, কাঁচা তামাক, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসে তৈরী জুতো, সিগারেট। পূর্ব-বাংলা থেকে যায় শস্যবীজ, পশ্চিম থেকে আসে কলে-পেষা সর্ষের ও রেড়ির তেল, সাবান। এক কাগজ, চা ও পাট বাদ দিলে—যা পশ্চিম-পাকিস্তানের নেই—পূর্ব-বাংলা থেকে যা যায় তা সবই প্রায় কাঁচা মাল। এবং পশ্চিম থেকে যা আসে তা মূলত শিল্পদ্রব্য। এমনকি নুনের মতো জিনিস যা পূর্ব-বাংলায় সহজেই তৈরী করা যায়, তাও বহুমূল্যে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসে। বাণিজ্যে পূর্ব-বাংলা কিভাবে শোষিত হয়েছে ও পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণের মাত্রা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিচের তথ্য থেকে স্পষ্ট হবে।

পূর্ব-বাংলার আমদানী (হাজার টাকার অঙ্কে)

পণ্য	১৯৪৮-৪৯	১৯৫৫	১৯৫৯
(১) জুতো	৪০	৫০৩৭	৭৮৭৪
(২) সাবান	৫২	৩৩০৪	৮৩১১
(৩) সিগারেট ইত্যাদি	৬৭	১৫১৩৩	২৪৪৪৭
(৪) সূতীকাপড়	৩২০৪	২৭০৯০	৮৬৬৬৯
(৫) চিনি	২০৮৪	৯৫৬	১২৬০০
(৬) সর্ষে ও রেড়ির তেল	৫২৮২	৭৬১১	২৪৬৬৩
(৭) নুন	৮১৮৫	৫৪৬৭	৭৪৯২

এইভাবে কারখানায় তৈরী বিবিধ পণ্যের ব্যাপারে পূর্ব-বাংলা পশ্চিম-পাকিস্তানের ওপর এত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, ১৯৫৫-৬০ সালের মধ্যে পূর্ব-বাংলার মোট আমদানির প্রায় অর্ধেক—শতকরা ৪৭.৫৬ ভাগ—এসেছে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে, অথচ সেই সময়ে পশ্চিমের আমদানির মাত্র ১৭.৬০ ভাগ এসেছে পূর্ব-বাংলা থেকে (পাকিস্তান C. S. O. Statistical Bulletin Dec. 1960)। আয়ুব সরকার পশ্চিম-পাকিস্তানে নতুন করে পাট—শিল্প গড়ে তুলতে চাইছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার পাট-শিল্পকে একটি

কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে এনে তার বিকাশ নষ্ট করতে চাইছিল এই লোভীর দল। (দ্রষ্টব্য : 'ইত্তেফাক'—সম্পাদকীয় ২৭শে মে ১৯৬৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল ইসলামও বলেন যে, সরকারী বিধিনিষেধ ও শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার নীতির ফলেই পূর্ব-বাংলায় শিল্পোন্নয়ন না হয়ে পশ্চিমে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে। এবং এই সব বিধি-নিষেধের আওতায় পশ্চিম থেকে মূলত কারখানার তৈরী জিনিস পাঠিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের থেকে পূর্বের আমদানি বেড়ে চলেছে। (Some Aspects of Interwing trade and terms of trade in Pakistan. P. D. R. Vol. 3. No 1.)

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আরো উল্লেখ করেছেন যে, 'পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তার আমদানি-রপ্তানির দর-যদিও এক সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থার আওতার মধ্যে ওঠা-ও-নামা করে, আর সেই ব্যবস্থায় ব্যবসার বা মুদ্রা-বিনিময়ের ওপর কোনো বাধা নিষেধ নেই, তবু এই বাণিজ্যের প্রকৃতি কিছুটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতো। এর কারণ দুই অংশের মধ্যেকার দূরত্ব, পরিবহণের অপ্রাচুর্য ও মন্থরগতি, যাতায়াতের অতিরিক্ত ব্যয়, এবং এক অংশ থেকে অন্য অংশে শ্রমিক চলাচলের অভাব। সংক্ষেপে, পূর্ব-পাকিস্তান এই বাণিজ্যে যে ক্ষতিটা বহন করে,, সেটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘাটতির মতোই তার অর্থনীতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলে। ঘাটতির টাকাটা চিরকালের মতো পূর্ব-বাংলার হাতছাড়া হয়ে যায়।

পূর্ব-পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে, আমেরিকার স্বাধীনতা পাবার আগে ব্রিটিশের আমেরিকান উপনিবেশগুলির মতো। দেশের বাণিজ্য মূলত পশ্চিম-পাকিস্তানের হাতে। স্বাধীন-ভাবে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম-পাকিস্তানের বাইরে থেকে সস্তাদরে মাল কেনা বা বিদেশের বাজারে ইচ্ছেমতো উঁচুদরে মাল বিক্রি করার কোনো অধিকার বা উপায় পূর্ব-পাকিস্তানের নেই। জাহাজী পরিবহণও পশ্চিম-পাকিস্তানীদের কুক্ষিগত। উপনিবেশের মতো

পূর্ব-পাকিস্তানকেও শিল্পপণ্যের জন্যে পশ্চিম-পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সেই ভাবেই পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্যে যে জাহাজী শিল্প দরকার, তা গড়তে দেওয়া হয় না। ব্রিটেন এবং তার আমেরিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে তবু ভাষা ও রক্ত-সম্পর্কের ঐক্য ছিল। পূর্ব-বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র ঐক্যসূত্র হ'ল ধর্ম। কিন্তু এই ঐক্য শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে আছে তা নয়, মালয় বা মরক্কোর সঙ্গেও পূর্ব-বাংলার ধর্মগত ঐক্য রয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র এই কারণে পূর্ব-বাংলা অনন্তকাল পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হয়ে থাকবে কেন ?

অথচ এই ঐক্যের দায় বহন করার জন্যে পূর্ব-বাংলাকে খুব-ই বেশী ভার বইতে হচ্ছে। পাকিস্তানের জাহাজী পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের কুক্ষিগত থাকায় পূর্ব-বাংলার মানুষকে অতিরিক্ত দরে পশ্চিমের মাল কিনতে হচ্ছে। এক অর্থনীতির নামে এইভাবে পূর্ব-বাংলাকে ক্রমাগত প্রতি টাকায় চল্লিশ নয়া পয়সা গুনগার দিতে হচ্ছে। অথচ দেশ এক হওয়ার দরুণ কোনো সুবিধেই পূর্ব-বাংলা পায় না। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১৩৮ আর পূর্ব-পাকিস্তানে তা হল ৯২২। তবু জনবহুল পূর্ব-বাংলা থেকে জনবিরল পশ্চিম পাকিস্তানে লোক নিয়ে যাওয়ার বা বসতি স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা এমন কি উপায় নেই।

কৃষিতে পূর্ব-বাংলার দারিদ্র্য ও অসহায়তা আরো প্রকট হয়ে পড়ে। পূর্ব-বাংলায় ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে কৃষিনির্ভর লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৩ থেকে ৯৫ ভাগ। পশ্চিমে সেটা কমে হয়েছে শতকরা ৬৫ থেকে ৬৯ ভাগ। পূর্ব-বাংলায় একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের মোট খরচের শতকরা ৪৫ ভাগ খাদ্যশস্য কিনতেই বেরিয়ে যায়, পশ্চিমে অনুরূপ একটি চাষী পরিবার তাদের মোট খরচের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ খাদ্যশস্যের পিছনে খরচ করে। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব-বাংলার মানুষ যে পরিমাণে বেশী

খেতে পায় তাও নয়—কারণ গমের অনুপাতে চালের দর বেশী। ফলে, খরচ অনেক বেশী করেও পরিমাণে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী খাদ্যশস্য পায় না। দুধ, ঘি, তেল এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যের জন্যে পূর্ব-বাংলার সাধারণ গ্রাম্য পরিবার তাদের মোট আয়ের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ খরচ করতে পারে। অন্যপক্ষে, পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ একটি পরিবার মোট খরচের শতকরা ১৮ ভাগ ব্যয় করে ঐ-সব পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যে। (P. D. R. Vol. III No. 3, পৃ ৩৯৯-৪১৪, A note on consumption pattern in the rural areas of East Pakistan by Irshad Khan) পূর্ব-বাংলায় গ্রামীণ দুস্থতা তাই স্বচ্ছন্দে পশ্চিম-পাকিস্তানের তিন গুণ বলা চলে।

এই দুস্থতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় পূর্ব-বাংলার সমবায় আন্দোলনের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। পাক-ভারতে সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হ'ল প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলি। এই ধরনের সমিতিগুলি ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব-বাংলায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালে সেই ঋণ কমতে কমতে দেড়লক্ষ টাকারও কমে (১ লাখ ৪৯ হাজার) এসে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানের এ-রকম হয়নি। পূর্ব-বাংলা আজ কৃষিঋণের জন্যে সম্পূর্ণভাবে সরকার ও সরকার-সৃষ্ট Agricultural Bank-এর ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমে সরকারী সূত্রে কৃষিতে প্রদত্ত টাকা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসেবে জানা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত পশ্চিম-পাকিস্তানে কৃষিতে ঋণ বাবদ দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, অন্যদিকে পূর্ব-বাংলায় দেওয়া হয়েছে মাত্র ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। অথচ, পূর্ব-বাংলাই সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর দেশ। (P. D. R. Vol. III No. I. Development of Institutional Agricultural Credit in Pakistan by Irshad Khan).

১৯৬০ সালের পূর্ব-পাকিস্তান কৃষি-কমিশনের (East Pakistan Agriculture Commission) রিপোর্ট থেকে পূর্ব-বাংলার প্রাণ-স্বরূপ কৃষক-সমাজের কষ্টের এক মর্মন্তুদ চিত্র পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যায় যে, পূর্ব-বাংলার চাষীদের সংখ্যা ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ হলেও তাদের মোট ঋণ ৯৩ কোটি টাকা। চাষীদের মধ্যে শতকরা ৩৪ জন, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী লোকের, সারা বছর কোনো কাজ নেই। বাকি শতকরা ৬৬ জন চাষীও বছরে প্রায় পাঁচ মাস বেকার বসে থাকে। খেতে না পেয়ে এরা শহরে-বন্দরে ভিড় করে, স্টেশনে স্টিমারে মাল বইবার জন্যে 'সাহেব'দের কাছে কাকুতি-মিনতি করে, রাস্তায় কি পার্কে শুয়ে থাকে এবং প্রতি বছর মহামারীতে কাতারে-কাতারে মারা পড়ে। যদিও এদের ভোটেই আজাদী কায়েম হয়েছিল এবং এদের জন্যেই সব করা হবে, এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল সেই সময়, তবু আজ পর্যন্ত এরা নির্যাতিত ও বঞ্চিত রয়ে গেল। বরং আজ যে ভাবে 'চাকর-নফর' বলে এই সব সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র চলেছে আগে তা ইংরেজদেরও কল্পনাতীত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক পুঁজিবাদীদের মতো এতখানি ঔদ্ধত্য বিদেশী ব্রিটিশও দেখায়নি।

নেই-নেই করে যেটুকু শিল্পায়ন পূর্ব-বাংলায় হয়েছে যেমন পাট, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, তাও পাক সরকারের একপেশে পক্ষপাতদুষ্ট নীতির ফলে মূলত পশ্চিম-পাকিস্তানী শিল্পপতিদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের হিসেব থেকে জানা যায় যে, পূর্ব-বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশ পশ্চিম-পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেছে। পাকিস্তান শিল্প বিকাশ সংস্থা (PIDC) কর্তৃক গড়ে তোলা চন্দ্রঘোনা পেপার মিলস তুলে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম-পাকিস্তানের ধনকুবের দায়ুদ করপোরেশনের হাতে, খুলনার নিউজ প্রিণ্ট মিলও অনুরূপভাবে এক ক্যানাডিয়ান কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে। তারা খাতায় ক্ষতির অঙ্ক দেখিয়ে নানাভাবে লাভ করে নিচ্ছে। পূর্ব-বাংলায় আজ যে আট হাজার পাটতাঁত কার্যত চালু রয়েছে (প্রতিষ্ঠিত পাটতাঁতের সংখ্যা বর্তমানে বারো হাজার) তার মধ্যে তিন হাজারেরও বেশী, এক আদমজী জুট মিলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ('ইত্তেফাক'—২৩শে মার্চ ১৯৬৪ পাকিস্তান সংখ্যা।)

শিল্পক্ষেত্রে সর্বত্রই পূর্ব-বাংলার প্রতি সরকারী অবিচার অবহেলা ও বৈষম্যের পরিচয় প্রতিনিয়তই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামে ভয়াবহ সাইক্লোনের পর চট্টগ্রাম বন্দর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুদিন পর্যন্ত আয়ুব সরকার বন্দরটির সংস্কার করে উঠতে পারেনি। ফলে আমেরিকান জাহাজ কোম্পানীগুলি, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়তে অযথা দেরী হয়—এই কারণ দেখিয়ে তাদের চার্জ শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীও এইভাবে দর বাড়াবার জন্যে চাপ দেওয়ার ফলে পূর্ব-বাংলার অর্থনীতি আজ এক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বন্যা জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ ঠেকাবার জন্যে পূর্ব-বাংলার সমুদ্রতীরে যে বিরাট বাঁধ দেবার প্রতিশ্রুতি আয়ুব সরকার দিয়েছিল, তার কাজ বিশেষ কিছুই এগোয়নি। অথচ পশ্চিম-পাকিস্তানে ১৫০০ কোটি টাকার সিন্ধু উপত্যকা পরিকল্পনা ঠিকই এগিয়ে চলেছিল আর তার জন্যে বৈদেশিক সাহায্য সংগৃহীত হয়েছে প্রচুর।

পাকিস্তানের সপ্তম ট্রাক ও বাস কারখানাটিও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্ব-বাংলার প্রতি সেই বৈষম্যনীতির নতুন প্রয়োগ করেছিল আয়ুব সরকার। এর জন্যে পূর্ব-বাংলার মানুষকে প্রতি মোটর বাসের জন্য দুই-তিন হাজার টাকা বেশী দিতে হবে। অথচ নদীমাতৃক পূর্ব-বঙ্গে ডিজেল তৈল চালিত নৌ-ইঞ্জিন (Marine Engine) কারখানা বসাবার যে দাবী পূর্ব-বাংলায় মানুষ বহুকাল থেকে করে আসছেন তা আজও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। শুধু কল কারখানা নয়—বৈজ্ঞানিক গবেষণা, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন এবং

জনস্বাস্থ্যের জন্যেও পূর্ব-বাংলায় পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় অতি অল্প টাকা খরচ করা হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের রূপপুরে বহু বিঘোষিত আণবিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে পরিত্যাগ করেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব রইস উদ্দিন আহমদ রাওয়ালপিণ্ডি পাক জাতীয় পরিষদের একটি বাজেট অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের প্রবল ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে এ কথা ঘোষণা করেন।

১৯৬৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন লাভ করবার পর থেকেই এর কপালে একের পর এক লাঞ্ছনাই জুটেছিল,—এতদিন পর এ প্রকল্পের ভাগ্য নিয়ে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কর্তৃপক্ষ জানান যে বিশদ পর্যালোচনার পর 'রূপপুর প্রজেক্ট' আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

এ কথা অজানা নয় যে বিদ্যুৎ শক্তির স্বল্পতা ও উচ্চ মূল্য পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প-অগ্রগতির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। এই প্রদেশের শিল্পপতিরা প্রায়ই এ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে থাকেন—সরকারী মহল থেকেও এ অভিযোগ খণ্ডন করা হয় না। 'দৈনিক সংবাদ' মন্তব্য করেন: 'বৈদ্যুতিক স্বল্পতা ও গোলযোগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প উৎপাদন গুরুতররূপে ব্যাহত হইতেছে—এই ক্ষয়ক্ষতিকে শুধু শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পক্ষান্তরে ইহাকে আমরা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে হানিকর বলিয়াই মনে করি।"

বিদ্যুতের এই অব্যবস্থার নিরসন-কল্পেই গণতন্ত্রের প্রবল চাপে চট্টগ্রামের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির (যা আয়ুব-শাহীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল) ফলে এই কেন্দ্রটি

যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়নি, যদিও এর জন্য ৪৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছিল। এই কেন্দ্রে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটর সময়মত ওখানে বসান হয়নি এবং যে দুটি মাত্র সক্রিয় জেনারেটর ছিল তারাও পালা করে প্রায়ই অকেজো হয়ে যেতো। এ বিষয়ে ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পূর্বদেশ'-এর মন্তব্য: '৪৮ কোটি টাকার এই জলহস্তী আর কতদিন বেঁচে থাকবে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে রীতিমত সংশয় দেখা দিয়েছে।' (২৮ মে, ১৯৬৭)।

বর্তমানে এ কাপতাই-এর এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি থেকে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাচ্ছে তা বৃহত্তর ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়, তার পরিচয় শহর ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলি প্রায়ই পেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নিষ্প্রদীপ হয়ে যাওয়া ছাড়াও পুরো চাপের সময় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের স্বল্পতার দরুণ সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়েও মানুষকে অন্ধকারে বসে থাকতে হয়। একই কারণে রাজধানীর জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত এবং বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের ফলে হাঁসপাতালে দেখা দেয় অচলাবস্থা।

পূর্ব-পাকিস্তানে স্থায়ী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মারাত্মক স্বল্পতা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার সুযোগ কর্তৃপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুতের মূল্য পশ্চিম-পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৩৭ নয়া পয়সা—পশ্চিমের প্রায় দ্বিগুণ। ফলে পূর্ব-বঙ্গে গৃহস্থকেও যেমন আলোর জন্য অতিরিক্ত খরচ করতে হয়, তেমনি এ প্রদেশে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মূল্যও দেশের পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত অনুরূপ দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী পড়ে এবং প্রতিযোগিতায় পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্প-সামগ্রী মার খায়।

বিদ্যুৎশক্তির এই অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যেই পাবনা জেলার

ঈশ্বরদীর কাছে রূপপুরে একটি আণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সিদ্ধান্তই বলছি, কেননা রূপপুরের এই পরিকল্পনার কথা সরকারী মহল থেকে এত বেশী প্রচার করা হয়েছিল, এ বিষয়ে ঘটা করে এত ঢাক-ঢোল পেটান হয়েছিল যে আয়ুবী-জমানার অনেক পরিকল্পনার মত এটিও যে একটি প্রকাণ্ড ভাঁওতায় পর্যবসিত হবে সে কথা বিশ্বাস করতে অতিবড় নিরাশাবাদীরও মন চায়নি।

রূপপুরের এই আণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়িত হবার কথা ছিল। এখান থেকে ১৫০ থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যেতো। শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের খরচ পড়ত মাত্র সোয়া-তিন নয়া পয়সা। সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট বারো নয়া পয়সা (বর্তমান হার সাইত্রিশ নয়া পয়সা) দরে বিক্রি করলেও ইউনিট প্রতি পৌনে নয় পয়সা লাভ করা যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অনেকখানি সাশ্রয় হোত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম-পাকিস্তানে গড়পড়তা মাথা-পিছু বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ যেখানে ৭০ ইউনিট পূর্ব-পাকিস্তানে তা মাত্র ১৭ ইউনিট। ঢাকা আণবিক শক্তিকেন্দ্রের পরিচালক ডঃ আনোয়ার হোসেন ১৯৬৬ সালের ১৪ই জুন পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সমস্যা সম্পর্কে ঢাকার রোটারী ক্লাবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন যে প্রদেশে খনিজ জ্বালানি সম্পদের স্বল্পতা হেতু, একমাত্র আণবিক শক্তিই পূর্ব-পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের গ্যাস-কয়লা-তৈল-সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সে অঞ্চলে অনেক দ্রুতহারে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধিক্কার-জনক ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সত্ত্বেও—যেখানে প্রদেশের বিদ্যুৎ-

সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় অন্তিমদশায় উপনীত—একমাত্র আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা হিমঘরে নিক্ষিপ্ত হয় যদিও পশ্চিম-পাকিস্তানে করাচীতে অনুরূপ একটি প্রকল্পের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব গোলাম ফারুক জাতীয় পরিষদে বিরোধী সদস্যদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে জানান যে কানাডা বা স্কাণ্ডিনেভিয় কোন দেশ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য না পাওয়ায় ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে রূপপুর পরিকল্পনাটি রূপায়িত করা সম্ভব হোল না, কিন্তু এখানে উল্লেখনীয় যে রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনাটি যখন রচিত হয় ঠিক সে সময়ই করাচীর জন্যও অনুরূপ একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রকল্প প্রণীত হয়। করাচীর এই পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আহার-নিদ্রা ভুলে ক্যানাডার একস্‌পোর্ট ক্রেডিট কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহ করেন। ফলে এই প্রকল্পে কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বেলাতেই অর্থাভাবের যত বাহানা।

করাচী পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। এতে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ নিঃসন্দেহে আনন্দিত হয়েছিলেন কিন্তু একই সময় রচিত দুটি পরিকল্পনার মধ্যে একটির রূপায়ণের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা হোল অথচ পূর্ব-বঙ্গের প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হোল— দেশের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান শিল্পগত, অর্থনৈতিক ও বহুবিধ বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-পাকিস্তানের গণমানসে এ বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে কি সুতীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অর্থাভাবের অজুহাতে পূর্ব-পাকিস্তানে একটির পর একটি পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল, অথচ সে জায়গায় পশ্চিম-পাকিস্তানে সিন্ধু-অববাহিকা থেকে সুরু করে অন্যান্য পরিকল্পনার কাজ কিভাবে এগিয়ে চলেছে সে সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবী জানান পূর্ব-বঙ্গের বিক্ষুব্ধ মানুষ।

শুধু রূপপুর প্রকল্পই নয় সিলেটে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশনের উত্তোগে যে কাগজের মিল স্থাপনের কথা ছিল তাও পরিত্যক্ত হয়, যদিও পশ্চিমাঞ্চলে চাব্‌সাধ্‌ধা পেপার মিল সহ আরও দুটি কাগজ-মিলের কাজ সম্পূর্ণ প্রায়।

চট্টগ্রামে বহুল-প্রচারিত পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানা স্থাপনের পথেও পর্বত-প্রমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়।

সিলেটে ছাতক সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা আরও এক লক্ষ টন বৃদ্ধির ও চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় প্রদেশের দ্বিতীয় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দুটি মাসের পর মাস ফাইল-বন্দী হয়েছিল।

বগুড়া-রাজশাহীর জামালপুর-জামালগঞ্জ অঞ্চলে কয়েক বর্গমাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় তা উত্তোলনের কোন ব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত করা হয়নি—আদৌ হবে কিনা সন্দেহ!

'পূর্ব-পাকিস্তানে একটির পর একটি পরিকল্পনা শিকায় উঠছে কেন'-শীর্ষক একটি নিবন্ধে সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' মন্তব্য করেন : 'পূর্ব-পাকিস্তানের পরিকল্পনাগুলি নীল নক্সার অঙ্গন ত্যাগ করতে না পারলেও পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপ পরিকল্পনার জন্য অর্থ থেকে সুরু করে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই যথারীতি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এ সব পরিকল্পনার কাজ সেখানে অনেকদূর এগিয়ে গেছে (২৮শে মে, ১৯৬৭)।'

পূর্ব-দেশের মন্তব্যের জের টেনেই পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন যে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্য আজ এত ব্যাপক ও প্রকট এবং আয়ুব-শাহীতে এ ব্যাধির প্রতিকারের আশা এতই সুদূর-পরাহত যে পূর্ব-বঙ্গবাসীর মনোবেদনা তিনি একটি মাত্র বাক্যেই ব্যক্ত করতে পারেন : 'সর্বঅঙ্গে ব্যথা, ওষুধ লাগাই কোথা !'

১৯৬৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা

পরিষদের প্রধান ডঃ সলিমুজুমান সিদ্দিকী পূর্ব-পাকিস্তানের সবচেয়ে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ডঃ মহম্মদ কুদরত-ই-খুদাকে অকস্মাৎ কাজ থেকে বরখাস্ত করেন। ডঃ কুদরত-ই-খুদা পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডিরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ডঃ খুদা রাসায়ণিক হিসাবে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ণের অধ্যাপক হিসেবে এখানে অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারেও ডঃ কুদরত-ই-খুদা প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্বে রসায়ণ সম্পর্কিত তাঁর একটি বই বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থ-মালায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বদেশ পূর্ব-বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ডঃ খুদার অনলস গবেষণা তাঁকে পূর্ব-বাংলার সমস্ত সচেতন মানুষের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার বিজ্ঞানীরা পাট থেকে হার্ড বোর্ড, করোগেটেড শীট ও আসবাব, পাটকাঠি থেকে কাগজ এবং পাটবীজ থেকে ব্যবহার্য তেল ইত্যাদি আবিষ্কার করে পূর্ব-বাংলার অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। পূর্ব-বাংলাকে তিনি সম্পদের 'অনাবিষ্কৃত সোনার খনি' রূপে উল্লেখ করেন। ইদানীং কালে মাছের গুঁড়ো থেকে উন্নত প্রোটিন তৈরী করার যে কৌশল তিনি আবিষ্কার করেন, তার ভিত্তিতে পশ্চিম-পাকিস্তানে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও পাকিস্তান সরকার নিয়েছেন বলে জানা যায়।

পূর্ব-বাংলায় এই বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠকে কেন এ-ভাবে বিতাড়ন করা হল? এর কারণ সংক্ষিপ্ত। ডঃ মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা দাবী করেছিলেন যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরুন পাক-সরকারের বরাদ্দ ২ কোটি টাকা পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে সমান-ভাবে ব্যয় করা হোক। ডঃ খুদার এই দাবী আয়ুব সরকার ও

পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রভুত্বকামীদের কাছে বিষবৎ লাগে। তাঁরা বলেন যে, দু-কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তান পাবে ১৩০ লক্ষ, এবং পূর্ব-পাকিস্তান পাবে তার অর্ধেকের কিছু বেশী—৭০ লক্ষ। ডঃ খুদা এ-ব্যবস্থা মানতে চাননি বলেই তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়।

কিন্তু ডাঃ খুদাকে যে এ ভাবে বিদায় করা হল সেটা শুধু এক বছরের আর্থিক বরাদ্দের প্রশ্নেই নয়। পাকিস্তানে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গবেষণায় আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করে আসা হয়েছে। সেই বঞ্চনার পরিমাণ কত বেশী তা নীচের তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে।

পাকিস্তানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয়-বরাদ্দ (লক্ষ টাকার অঙ্কে):

বৎসর	পূর্ব-পাক	পশ্চিম-পাক
১৯৫৪	৫	২৫
১৯৫৫	১৩	৪৭
১৯৫৬	৫	১০
১৯৫৭	১৭	৮৩
১৯৫৮	২৬	৯০
১৯৫৯	১৮	১০৮
১৯৬০	১৮	৯৭
১৯৬১	১৫	৮৫
১৯৬২	৩২	৯৯
১৯৬৩	৪২	১১৪
১৯৬৪	২৬	অজ্ঞাত

(ইত্তেফাক: ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ও ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫)

উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে পাক সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয় করেন ১৯১ লক্ষ টাকা, আর সে তুলনায় পশ্চিম-পাকিস্তানে গবেষণার জন্য ব্যয় করেন ৭৬২ লক্ষ টাকা! ডঃ খুদা এই

দীর্ঘ বঞ্চনার ঐতিহ্যের অবসান চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, আয়ুব মুখে পাকিস্তানের উভয় অংশের সাম্যের যে গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয়, সেটা জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্তত সে পালন করুক। এই দাবী করার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে স্তব্ধ করে দেবার জন্য তাঁকে দ্রুত পূর্ব-পাকিস্তানের বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ পদ থেকে অপসারণ করা হল।

ডঃ খুদার মত সম্মানী ও সক্রিয় বিজ্ঞানীকে এই ভাবে স্ব-পদ থেকে অপসারণ করার দরুন পূর্ব-পাকিস্তানের বিজ্ঞানী ও ছাত্ররা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই বিক্ষোভ আরো তীব্র হয়েছে সরকারী কাজের যে সব সরকারী ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তার দরুন। পূর্ব-পাক বিজ্ঞান পরিষদের কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে পাক বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের কর্তা ডঃ সিদ্দিকী প্রথমে বলেন যে, ডঃ খুদার বয়স হয়েছে বলেই তাঁকে বিদায় দেওয়া হল। অথচ ডঃ সিদ্দিকীর নিজের বয়স ডঃ খুদার চেয়ে বেশী এবং তিনি নিজে বিদায় নেননি। এই সত্যটা তাঁর গোচরে আনার পর কর্তৃপক্ষ আবার সাফাই গেয়েছেন যে, এক বছর আগেই নাকি স্থির হয় যে, ১৯৬৫ সালের ২০শে জানুয়ারীর পর ডঃ খুদাকে বিদায় দেওয়া হবে এবং ডঃ খুদার নাকি তা অজানা ছিল না। একথা যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, ২০শে জানুয়ারী অতিক্রান্ত হবার ১৯ দিন পরে একটি ব্যক্তিগত পত্র মারফত ডঃ খুদাকে হঠাৎ চার মাসের বিদায়-পূর্ব ছুটি নিতে বলা হল কেন এবং ডঃ খুদাই বা সে ছুটি নিতে অস্বীকার করলেন কেন? ডঃ খুদা আগেই জানতেন: তাঁকে সরানো হবে একথা বলাও যা, আর মানুষকে খুন করে যদি বলা হয় যে নিহত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে, সে কথা বলাও তাই। পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত মানুষ এই সব পরস্পরবিরোধী অসত্যগুলি চোখ বুঁজে সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদ জানান পূর্ব-পাক বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের কর্মীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-অধ্যাপকেরা এবং সুধী সমাজের বিভিন্ন অংশ।

ডঃ খুদাকে অপসারণের মূলে সম্ভবতঃ আর একটি গুরুতর কারণ ছিল। পাকিস্তানের তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পখাতের মোট বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের মাধ্যমে ব্যয়িত হবার কথা ছিল। ডঃ খুদা স্ব-পদে বহাল থাকলে এই ১৫ কোটির অর্ধেক পূর্ব-পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যয় করার দাবী জানাতেন। উপযুক্ত শিল্প-সংস্থা গঠন ও পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে দেবার মতো জ্ঞান ও ক্ষমতা তাঁর ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের এই শিল্প-গঠনের দাবীকে বানচাল করার জন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার প্রবীণ বিজ্ঞানীকে এইভাবে অপসারণ করা হল।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি নিদারুন বৈষম্যের এ ধরনের আর কত নজির দেব? তা দিতে গেলে হয়ত একটা মহাভারত রচনা হয়ে যাবে।

আর্থিক জীবন ও শিক্ষা সংস্কৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই দুরবস্থা, বৈষম্য-দৈন্য ও ঔপনিবেশিক পীড়ন দূর করতে হলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা প্রয়োজন। সেই জন্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের দলমত নির্বিশেষে সকলেই সার্বজনীন ভোটাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করতে সমবেত আন্দোলন স্থুরু করেছেন। আর জাগ্রত জনমত ভোটাধিকার পেলে যে পূর্ব-বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালান যাবে না—আয়ুব-শাহী তা ভাল করেই জানতেন। জনমতকে সে তাই লাঠি, গুলি ও কাঁদানে গ্যাসে দলিত করেছে, নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার ও কণ্ঠরোধ করেছে। গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলিকে পীড়ন করে অন্যদিকে দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে ও দালালদের টাকা দিয়ে বিভ্রান্তি স্থষ্টির চেষ্টা করেছে।

আমরা এখন পূর্ব-পাকিস্তানের ১৯৬৭ সালের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসকে

পরাজিত করে "যুক্তফ্রন্ট" কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল প্রভাবান্বিত সরকার গঠন করল। ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটল এবং বিভিন্ন বিরোধী দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোল। ১৯৬৭ সালের এই ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানে বিশেষতঃ, পূর্ব-পাকিস্তানে কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তাই এ বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করবার চেষ্টা করছি।

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে আয়ুব-সরকারের কুক্ষিগত সংবাদপত্রগুলি এবং রেডিও পাকিস্তান সহ বিভিন্ন সরকারী প্রচারযন্ত্র একযোগে "হিন্দুস্থানে"র প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতির সম্পূর্ণ একতরফা একটি চিত্র উপস্থাপিত করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের কথা তারা বলেনি, কিন্তু কয়েকটি নির্বাচনী সভায় বা কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর (বিশাল দেশ ভারতবর্ষের আয়তন বা জনসংখ্যার তুলনায় যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়), তারা এত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিনের পর দিন প্রচার করত, যেন নির্বাচন উপলক্ষে দেশের সর্বত্র প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ বেঁধে গেছে।

একটি নজির রূপে গোঁড়া সরকার সমর্থক ঢাকার "দৈনিক পাকিস্তান" থেকে ভারতের নির্বাচন বিষয়ে তাদের সৎ ও ভব্য সাংবাদিকতার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপিত করা গেল :

১০ই ফেব্রুয়ারী প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে শিরোনামা : ইন্দিরা গান্ধীর নাকের হাড় ভেঙ্গেছে, ঠোঁট থেঁতলেছে ও দাঁত নড়ে গেছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—ভারতে নির্বাচনী হামলা অব্যাহত—দিল্লীতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ—পুলিশের লাঠিচার্জ।

২০শে ফেব্রুয়ারী—ভারতে নির্বাচনী দাঙ্গায় আশিজন হতাহত—ইত্যাদি।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানী প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : পাক-ভূমিতে যারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামরত তাঁদের মনে

বিশ্বাস উৎপাদন করান যে "হিন্দুস্থানে" গণতন্ত্র একটি প্রহসন ও ধাপ্পা ব্যতীত আর কিছু নয় এবং এ ঝুটা গণতন্ত্র খতম হয়ে সে দেশে জঙ্গী শাসনের আবির্ভাব ঘটতে বা দেশটা বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয়ে পড়তে আর বেশী দেরী নেই—কাজেই প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বুনিয়াদি গণতন্ত্র যে শত সহস্র গুণে শ্রেয় তা যেন পাকিস্তানবাসীরা উপলব্ধি করেন।

ভারতে নির্বাচন পর্ব সুরু হবার মাত্র কয়েকটি দিন আগে ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আয়ুব—যিনি সরকারী মুসলিম লীগ দলের সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করতেন—করাচীতে বাগী-জিন্নাহ্‌তে তাঁর দলীয় কর্মীদের একটি সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন যে পাকিস্তানে একদল রাজনীতিক অনবরত সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র পুনঃ-প্রবর্তনের দাবী তুলছেন, কিন্তু ঐ ধরনের গণতন্ত্রের বিলাসিতা ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না—তদুপরি এ আভাষও তিনি প্রতি নিয়তই পাচ্ছেন যে হিন্দুস্থানীরা নিজেরাও গণতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। অবশ্য ভারত-বাসীর পক্ষ নিয়ে গণতন্ত্রে তাদের আস্থা-অনাস্থা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে কে দিল তা অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এই একই সভাতে মুসলিম লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার মোহাম্মদ আসলাম আর-এক পর্দা সুর চড়িয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে গণতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলে তাদের হাল হিন্দুস্থানীদের থেকেও অনেক খারাপ হয়ে পড়বে।

কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বরিশাল জেলার পাংগাসিয়া গ্রামে একটি জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তাঁর প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে বললেন যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব প্রবর্তিত বুনিয়াদি গণতন্ত্রই—ভারতীয় গণতন্ত্র নয়—পাকিস্তানের পক্ষে একমাত্র উপযোগী শাসনব্যবস্থা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭) পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বহু পাকিস্তানী সাধারণ মানুষ ভোট-গ্রহণ দেখতে এসেছিলেন। আমার এক বন্ধু এ সময় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এলেন। তিনি ভারতীয় নির্বাচনের সময় ঢাকা শহরে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বললেন যে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম-বঙ্গের নির্বাচন ও ফলাফল সে দেশে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। দীর্ঘ একটানা কংগ্রেস শাসন পশ্চিম-বঙ্গবাসীরা যে ভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে অপসৃত করেছিল তার প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানীদের সপ্রশংস অভিনন্দন ধ্বনিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের "বেসিক ডেমোক্রেসী"র আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ নিজেদের দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চান—তাঁরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছেন যে পাক-একনায়কের "নয়া-গণতন্ত্র" ভারতের সার্বজনীন গণতন্ত্রের স্থান নিতে পারে না। এই বাস্তব অবস্থা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কাছে একান্তভাবে স্পষ্ট বলেই গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের দাবীতে তাঁরা উত্তাল ও সোচ্চার। আর তাঁদের প্রেরণার উৎস হয়েছে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে সে দেশের সাধারণ মানুষের আত্মমত অবাধে অভিব্যক্ত করবার স্বাধীনতা। প্রায় তের বছর আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন, যদিও ক্ষমতালোলুপ সামরিক শাসকদের কব্জা থেকে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের অধিকার রক্ষা করতে পারেননি। সন্দেহ নেই যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা ভারতের নির্বাচনী ফলাফলের মূল্যায়ণ করেছিলেন।

সর্বশ্রেণী দল-মত নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের—এমন কি মুসলিম লীগের আদর্শের প্রতি অনুগত ব্যক্তিদের মনেও এ বিষয়ে যে বিচিন্তার উদয় হয়েছিল তার একটি নজির পাওয়া যায় ১৯শে

ফেব্রুয়ারী যেদিন পশ্চিম-বঙ্গে ভোটপূর্ব সুরু হয়। ঢাকার ঐসলামিক একাডেমীতে (কট্টর লীগ-পন্থী অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি বর্ধমানের প্রাক্তন অধিবাসী জনাব আবুল হাশেম যে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পরিচালক) সে দিনই "আমি কেন পাকিস্তান চেয়েছিলাম" এ বিষয়ের উপর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বললেন যে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল এ নবসৃষ্ট দেশে সার্বজনীন গণতন্ত্র কায়েম করা। পশ্চিম-বঙ্গে যে দিন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক সেদিনই ঢাকার ইসলামিক একাডেমীতে সমবেত আয়ুবের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বাঘা-বাঘা ব্যক্তিদের সামনে অধ্যাপক রাজ্জাকের এ মন্তব্য বিশেষ অর্থবহ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল—এ উক্তি করবার সময় তাঁর মানসপটে ভারতের নির্বাধ গণতন্ত্রের কথা ভেসে আসছিল সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভারতের নির্বাচনে জনসাধারণের এ আগ্রহ পাকিস্তান সরকার সুনজরে দেখতে পারেননি। তাই প্রথম-প্রথম তাঁরা নির্বাচনী হাঙ্গামা, দুর্নীতি সংক্রান্ত মনগড়া, মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করে জনমতকে বিরূপ বা বিপথগামী করবার সর্বতঃ প্রয়াস করেছিলেন। পরে কংগ্রেসের কয়েকজন রথী-মহারথীর পরাজয়ের সংবাদও ফলাও করে পরিবেশিত হয়েছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে স্বচ্ছ হয়ে উঠল যে কয়েকটি রাজ্যে জনসাধারণের রায়ে শাসকদলের পতন ঘটেছে এবং অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হতে চলেছে, তখনই ভারতের নির্বাচনী খবর স্থানান্তরিত হোল একটি কোণায়।

যদিও ভারতের কংগ্রেসী সরকারের শাপান্ত করা আয়ুব-শাহীর নিত্তনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে ছিল, তবুও বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলের বিপর্যয়ের সংবাদে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করেননি। অবাধ গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী শাসনকারী কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলকে

ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, এ বিশ্বাস করতে আয়ুবগোষ্ঠীর মন হয়েছিল নারাজ। হেতুটা অনুমান করা দুরূহ নয়, পাকিস্তানে আয়ুবের একনায়কত্ব বিরোধী ও গণতন্ত্রকামী জনতাকে একই রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ নিকটতম প্রতিবেশী ভারতবর্ষে ব্যালটের মাধ্যমে বিপ্লব তাদের আন্দোলনকে নৈতিক মদদ ও প্রেরণা যোগাবে এই ছিল তাদের আশঙ্কা।

তাই ফলাফল ঘোষিত হবার পরও আয়ুবের প্রচার-যন্ত্র ভারতীয় নির্বাচনকে মস্ত বড় এক প্রহসন, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পতনোন্মুখ, ভারতের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপসৃত এবং সর্বশেষে ভারতের ঐক্য আজ ঘোর বিপত্তির সম্মুখীন বলে সরবে ঘোষণা করতে থাকে।

কিন্তু ভারতের নির্বাচন বিষয়ে পাকিস্তানের বিরোধীপক্ষ ও জনসাধারণের প্রগতিশীল অংশের চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ ভিন্ন সুরের।

লাহোরের প্রগতিবাদী দৈনিক 'নওয়াই-ওয়াক্‌ত' সরকারী ভাষ্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে নির্বাচনী আসরে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বা বিরোধী দলগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি বা জনপ্রিয়তা ভারতে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা সৃষ্টি করে না—বরঞ্চ ভারতীয় গণতন্ত্রের সহনশীলতারই পরিচয় দেয়।

কামরাজ, পাতিল, শচীন চৌধুরী, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ইত্যাদি উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দের পরাজয়ের বিষয়ে এদের মন্তব্য : 'গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে মহীরুহেরও পতন ঘটানোর সুযোগ যে রয়েছে তার পরিচয় মিলেছে ভারতের নানা নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে এবং এটাই গণতন্ত্রকামীদের পক্ষে বিরাট এক আশ্বাসের কথা এবং পাকিস্তানের পক্ষে মূল্যবান একটি শিক্ষাও বটে।'

ঢাকার দৈনিক "সংবাদ" স্পষ্ট মন্তব্য করেন যে ভারতে কংগ্রেসের এই বিপর্যয়কে ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট বলে অভিহিত করবার কোন যৌক্তিকতা নেই—গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। জনসাধারণের বিচারে

যে দল দোষী সাব্যস্ত হবে তাদেরই শাস্তি ভোগ করতে হবে—জনসাধারণ যাদের অনুমোদন করবে তারাই প্রবলতর হবে, প্রাধান্য লাভ করবে, গণতন্ত্র এ ভাবেই কাজ করে। অতএব শাসকদলের বিপর্যয়ই গণতন্ত্রের সঙ্কট নয়। (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭)

ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি প্রশংসা অর্পণ করে ঢাকার সাপ্তাহিক "পূর্বদেশ", 'ভারতীয় নির্বাচনের শিক্ষা-গণতন্ত্রের বিজয়'-শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধে লেখেন· 'ভারতবর্ষে এত বৈচিত্র্য, মতপার্থক্য, বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি ঐক্যসূত্র যা তাদের একই জাতিতে এবং একই দেশে অটুট রেখেছে তা হোল গণতন্ত্র।'

আয়ুবগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা উঠতে-বসতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আছশ্রাদ্ধ করেন তাদের প্রতি কটাক্ষ করে "পূর্বদেশ" স্পষ্টোক্তি করেন: 'ভারতে অর্থনৈতিক সঙ্কট, খাদ্য সমস্যা, ভাষা সমস্যা ইত্যাদি যত প্রকট আকারই ধারণ করুক না কেন, কোন সমস্যা তাদের সংহতি বিনষ্ট করতে পারবে না। মাত্র সে দিনই তাদের সংহতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে যেদিন গণতন্ত্র বিলুপ্ত হবে।'

ইংরাজী দৈনিক "পাকিস্তান অবসারভার" মন্তব্য করেন: 'এ বিষয়ে কোন ভুলই নেই যে কুড়ি বছর ধরে ভারত গণতন্ত্রকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে।' আয়ুব-প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকর আলী ভুট্টো প্রশ্ন তোলেন যে 'হিন্দুস্থানে যদি গণতন্ত্র কার্যকর হয়ে থাকতে পারে তবে পাকিস্তানে নয় কেন?'

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলের নেতা জনাব নুরুল আমীন বলেন যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও তাঁর খয়ের খাঁরা তাঁদের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের যতই মহিমাকীর্তন করুন না কেন, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা অচল—ভারতের শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী গণতান্ত্রিক।

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের পরে পাক-ভারত সম্পর্ক কি মোড় নেবে তা নিয়েও পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা

চলেছিল। রেডিও পাকিস্তান সরবে ঘোষণা করে যে অতঃপর হিন্দুস্থানে পাক-বিদ্বেষের বন্যা বয়ে যাবে।

পাকিস্তানের হাল হকিকৎ ছিলো কিন্তু এর ঠিক বিপরীত।

আয়ুব খাঁই ভারতীয় নির্বাচনের ফলাফলকে উপলক্ষ করে নব উদ্যমে পাক-ভারত সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এ ছাড়া পাকিস্তানের জঙ্গী শাসককুলের নান্য পন্থা। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই মুহূর্তেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার দাবী আবার জোরদার হয়ে উঠছিল। জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ দক্ষিণ পন্থী নেতারাও আয়ুব-শাহীকে নগ্ন ডিকটেটরশিপ বলে অভিহিত করেন। এমন কি, সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল কায়ুম খানের মত স্বৈরাচারী ব্যক্তি, যিনি সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফার খানের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার বিরুদ্ধে বিভীষিকার রাজত্ব চালু করেছিলেন, তিনিও যখন বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর হাত থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার জিগীর তুললেন তখন পাকিস্তানে রাজনৈতিক হাওয়া কোন্ দিকে বইছিল তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৬৭ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভারতের গণতন্ত্রকে "পঙ্ককুণ্ড" বলে উপহাস করেন—২৮শে মার্চ ঢাকায় আইনজীবীদের এক সভায় তিনি মুরুব্বি চালে বলেন যে পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের এ দম্ভোক্তি গণতন্ত্রের ঐতিহ্যধারী পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের মনে গণতন্ত্রের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করা দূরে থাকুক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্রতে তাঁদের আরও সঙ্ঘবদ্ধই করে তুলেছিল সন্দেহ নেই!

এই ১৯৬৭ সালেই পশ্চিম-পাকিস্তানেও ঘটনাপ্রবাহ বেশ জমে উঠেছিল। আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ, বিক্ষোভ পশ্চিমাঞ্চলেও

দানা বেঁধে উঠতে সুরু করেছিল, যার পরিণতি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ১৯৬৮-৬৯ সালের উত্তাল আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে।

খাদ্যাভাব এবং বলগাহীন মূল্য-বৃদ্ধিতে পশ্চিম-পাকিস্তানের জনসাধারণ হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁর মাস-পয়লা বেতার-ভাষণে কবুল করেন: 'আমরা দেশে খাদ্য-ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছি'—শুধু তাই নয়, দেশে খাদ্যাভাব যে কত প্রকট হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ হচ্ছে: সরকার লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি এবং করাচী ছাড়া পশ্চিম-পাকিস্তানে আর কোথাও বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবর্তন করবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। অর্থমন্ত্রকের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের তুলনায় পাইকারী বাজারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় শতকরা কুড়ি ভাগ। খুচরা বাজারে এ হার আরও অধিক। করাচী বণিকসভার চেয়ারম্যান জনাব এ. হুসেনীর দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। সন্দেহ নেই বিদেশ থেকে ব্যাপক-হারে সমর-সম্ভার সংগ্রহ করবার তাগিদে পাকিস্তান সরকার যে অর্থনীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করবার একটি কারণ।

পশ্চিম-পাকিস্তানে এ সময় শ্রমিক বিক্ষোভও ফেটে পড়েছিল, যখন পশ্চিম-পাকিস্তানে জঙ্গীশাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে একের পর এক ধর্মঘটের প্রবাহে জন-জীবন অচল হয়ে ওঠে—যেমন রেল-শ্রমিকদের সর্বাত্মক ধর্মঘট থেকে সুরু করে করাচী বন্দর ও বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট ইত্যাদি। ওখানকার রেল-কর্মী ইউনিয়ন যাঁরা ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সম্ভবতঃ পশ্চিম-পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা সু-সংগঠিত শ্রমিক সংস্থা। এঁদের নেতা মীর্জা ইব্রাহিম অবিভক্ত-ভারতেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

মীর্জা ইব্রাহিম ও তাঁর ছ-জন সহকর্মী এ সময় কয়েক মাস ধরে কারারুদ্ধ হয়ে ছিলেন, কিন্তু নানা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সরকার রেল-কর্মী ইউনিয়নের কার্যকলাপকে দমিত করতে পারেননি। ইউনিয়নের মুখ্য দাবীগুলির মধ্যে ছিল—চাকরির উন্নত শর্তাবলী, মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য—প্রধানতঃ গম সরবরাহ। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যে কোন গণতন্ত্রসম্মত বা জন-সমর্থিত আন্দোলনের প্রতি তাঁর স্বভাবসুলভ বিতৃষ্ণা নিয়ে রেলওয়ে কর্মীদের বিক্ষোভ-কে "পথের দুর্বৃত্তদের গুণ্ডামি" বলে আখ্যা দিয়ে তাঁর লাহোর সফরের সময় শ্রমিক-নেতাদের সাক্ষাৎ-দানে অস্বীকৃত হন।

অবশ্য অবস্থা বেগতিক বুঝে পশ্চিম-পাকিস্তানের নয়া গভর্নর জেনারেল মুসা ওয়াদা করেন যে রেল-কর্মীদের দাবী-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে, কিন্তু অচিরে কর্মীরা উপলব্ধি করলেন যে এ একেবারেই ফাঁকা বুলি এবং তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। অগত্যা তাঁরা ধর্মঘটে সামিল হলেন—প্রকৃতপক্ষে এত ব্যাপক আকারের কোন ধর্মঘট প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ইতিপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। রেল ইঞ্জিন, কারখানা ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রক্ষা করবার অজুহাতে সরকার সেনাবাহিনী তলব করেছিলেন যার ফলে বেশ কয়েক জায়গায় সেনাবাহিনী ধর্মঘটি শ্রমিকদের রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। লাহোরে লোকো শেডের কাছে পিকেটারদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে—সরকারী ভাষ্যমতেই নিহতদের সংখ্যা বারোজন এবং আহত অনেকে।

শুক্কুরে সরকারী দমননীতির বীভৎসতা সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। রেল-লাইনে পিকেটিং-রত কর্মীদের উপর দিয়েই বেপরোয়াভাবে ও বিদ্যুৎগতিতে একটি ইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে এক ব্যক্তির কর্তিত দেহ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। এ নিদারুণ ঘটনার পর পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে জেনারেল মুসার মত জবরদস্ত লাট-বাহাদুরকেও প্রায় দু-ঘণ্টা

ধরে তাঁর প্রভু প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সঙ্গে একান্ত নিভৃতে এ বিষয়ে শলা-পরামর্শ করে আরও কঠোর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দিতে হয়।

এর পরে যদিও রেল-শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা করা হবে এবং ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করবার জন্য কারও উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না এই আশ্বাস পেয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তবুও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি—সরকার ও শ্রমিক পক্ষ পরস্পরের প্রতি মুষ্টি উদ্ধত করেই ছিলেন।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী ঢাকা সফরে এসে এমন একটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যাকে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা হালকা-ভাবে উড়িয়ে দিতে পারেননি। জনাব ওসমানী অভিযোগ করেন যে সরকার জাতীয় সংহতির নামে কথার তুবড়ি ছোটালেও কার্যত দেশের দুই অংশের অধিবাসীদের পারস্পরিক জানাজানির পথে বাধার প্রাচীর তুলছেন এবং জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে রেল ধর্মঘট সম্পর্কে সঠিক বা প্রকৃত সংবাদ পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে জানান হয়নি। রেল-ধর্মঘটের সঙ্গে বহু "ন্যাপ" (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) কর্মী সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে লাহোরে ন্যাপের দপ্তর পুলিশ তালাবন্ধ করে দিয়েছে এ সংবাদ তিনি ঢাকায় এসে প্রচার করবার আগে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা কেউ জানতেন না। পঞ্জাব ও সিন্ধুর কোন কোন জেলায় গম যে প্রতি মণ পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে সে খবরও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল। ঢাকার খ্যাতনামা একটি বাংলা দৈনিক "জাতীয় সংহতি ও সরকার" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: 'কর্তৃপক্ষ দেশের দুই অংশের জনসাধারণকে পরস্পরের অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে অন্ধকারে রাখিয়া নিজেদের অগণতান্ত্রিক শাসনকে চিরস্থায়ী করিতে চায়।'

পশ্চিম-পাকিস্তানের চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলিও (দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষ্পেষণের কাজে নিজের বাহুবল বৃদ্ধি করতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যাদের দুধ-কলা দিয়ে এতদিন ধরে পুযেছিলেন)—সরকার পক্ষের বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মওলানা মওদুদি প্রভৃতি এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের স্রষ্টা ও পালক আয়ুব খাঁন সাহেবের বিরুদ্ধেই খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

আয়ুব-শাহীর সঙ্গে এই ব্যক্তিদের সংঘর্ষের একটি ঘটনা সে বছর ঈদ উৎসব অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষণ নিয়ে তুমুল বিবাদ। সরকারী ঈদ-কমিটি ঘোষণা করেছিলেন যে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ১২ই জানুয়ারী (১৯৬৭) কিন্তু মওলানা মওদুদির নেতৃত্বাধীন আলেমরা ফতোয়া জারী করলেন যে ঈদ প্রকৃতপক্ষে শুক্রবার ১৩ই জানুয়ারী—সরকারী কমিটির নির্দেশ একটি মস্ত ধাপ্পা এবং তদনুযায়ী যারা বৃহস্পতিবার রমজানের উপবাস ভঙ্গ করে ঈদ-পালন করবেন তাঁদের স্থান নির্ঘাৎ হবে "দোজখে" অর্থাৎ নরককুণ্ডে।

ফলে বৃহস্পতিবার এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাকে "মসজিদে ও ময়দানে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ" বলে লাহোরের একটি উর্দু পত্রিকা আখ্যায়িত করলেন। মওদুদির অনুগামী ধর্মান্ধ ইমাম সাহেবরা বৃহস্পতিবার বহু মসজিদ তালাবন্ধ করে রাখলেন, যাতে সেখানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত না হতে পারে। মওদুদি বিরোধী ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাণভয়ে মসজিদ ছেড়ে স্থানান্তরে আত্মগোপন করলেন—স্থানে-স্থানে দুই মতাবলম্বী দলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বেধে গেল। শুক্রবারও যখন বেসরকারী ঈদ অনুষ্ঠিত হোল তখনও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

এ ব্যাপারে সরকারী ভাষ্যে যুক্তি ছিল সন্দেহ নেই—এতে বলা হোল যে এই আধুনিক যুগে ঈদের চাঁদের ফালি করে বা কোন্ সময়ে দৃশ্য হোল বা না হোল সে ভার উলেমার চর্মচক্ষুর উপর অর্পণ না করে সরকারী আবহ-দপ্তরের উপর ছেড়ে দিলেই

বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। কিন্তু মওলানা মওত্নুদির দল একে ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতায় চরম সরকারী হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করে জিগীর দিলেন: আয়ুব-শাহীর স্বেচ্ছাচার মাত্রা ছাড়িয়েছে।

এহেন যে মওত্নুদি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বিরোধী দল গড়ে তোলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন জনাব জুলফিকর আলী ভুট্টো। এমন কি এই যুক্তফ্রণ্টের আন্দোলন ও পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবার জন্য একটি নীতি নির্ধারক কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার মওলানা মওত্নুদি ও তাঁর চারজন মুখ্য চেলাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের আশায় ছাই দিয়েছিলেন। অবশ্য ভুট্টো সাহেব দমবার পাত্র নয়—তিনি করাচীতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য বিরোধী দলগুলির প্রতি আহ্বান জানান—কিন্তু অন্ততঃ পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুব-তন্ত্রের পরিবর্তে ভুট্টো-তন্ত্রকে স্বাগত জানাতে কজন আগ্রহী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ ছিল না। এই ভুট্টো অবশ্য এর পরেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনেক খেল দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে সব কাহিনী এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়।

এই ১৯৬৭ সালেই পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর আবার নতুন করে আঘাতহানতে উদ্যত হয় আয়ুব-শাহী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে আবার রেডিও থেকে নির্বাসিত করা হয়, ১লা বৈশাখ-কে নববর্ষ হিসাবে পালন করাকে ইসলামাবাদ ইসলাম-বিরোধী অনুষ্ঠান বলে ধিকৃকৃত করে এবং উর্দুর স্বপক্ষে বাংলাভাষার ওপর জেহাদ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা চালিয়েই যেতে থাকেন।

ভারতে উগ্র হিন্দী প্রেমীদের মত পাকিস্তানেও উর্দুর পতাকা-বাহক অনেকে আছেন, যাঁরা সময়ে অসময়ে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে 'আংরিজি হাঠাও অওর উর্দু চালাও' ধ্বনি তুলে সোরগোল সৃষ্টি করতে ভালবাসেন।

নজিরস্বরূপ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-অন্তঃপ্রাণ কয়েকজন অধ্যাপক দাবী তোলেন যে তাঁদের কনভোকেশনের যাবতীয় কার্যাবলী উর্দু ভাষায় পরিচালিত না হলে তাঁরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

১৯৬৭ সালে ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনেও তুমুল কোলাহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যখন পশ্চিম-পাকিস্তানী সদস্য স্পীকারের রুলিং উর্দু ভাষায় দেওয়া না হলে তা শুনতে অস্বীকার করেছিলেন—কিন্তু পক্ষান্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যরা এক যোগে পাল্টা দাবী জানিয়েছিলেন যে স্পীকার সাহেব ইংরাজিতে বলুন আপত্তি নেই কিন্তু তিনি যদি কোন দেশী ভাষায় রুলিং দেবার সিদ্ধান্ত করেন তবে তা হবে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নয়।

পূর্ব-পাকিস্তানবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ফলে বাংলাভাষা আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু জাতীয় বা সরকারী পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রকৃত কি স্থান শাসকগোষ্ঠী নির্ধারণ করেছেন তা নিয়ে সে দেশের বাঙালীদের মনে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ঠ ক্ষোভ ও আশঙ্কা থেকেই গেছে।

ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "পূর্বদেশ" ৫ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৬৭) সংখ্যায় 'অমর ২১শে ফেব্রুয়ারীর জিজ্ঞাসা'-শীর্ষক একটি নিবন্ধে সখেদে মন্তব্য করেছিলেন: '১৯৫২ সালের পর দীর্ঘ পনের বছর অতিবাহিত হলেও আজও কেন অফিস-আদালত থেকে সুরু করে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষা প্ররোগ করা হয়নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী নতুন করে জাতির সম্মুখে সেই জিজ্ঞাসাই তুলে ধরেছে। বাংলাকে সরকারী কাজকর্মে প্রয়োগে এই অনীহা কেন এও এই দিবসের একটি বিরাট জিজ্ঞাসা।'

পশ্চিম-পাকিস্তানে যাবতীয় কাজে উর্দুর প্রচলন ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রমশ প্রশাসনিক এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে

ইংরাজী ভাষার ব্যবহার তুলে দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনকার্যে বাংলাভাষার এখনও কোন প্রতিষ্ঠা নেই।

পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করার পরও বাংলাভাষা বা ভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রতি শাসকচক্রের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় মাঝে-মাঝেই আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্ব-বাংলার মানুষকে বিস্মিত ও অধৈর্য করে তোলে। দু-একটি নজির উল্লেখ করে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করা যাক।

১৯৬৭ সালে ভাষা শহীদ দিবসের প্রাক্‌কালে ঢাকার সরকারী ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা কড়া হুকুম জারী করেছিলেন যে কোন ছাত্রী ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করলে—যা সারা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা হয়ে থাকে—তাকে অবিলম্বে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। অবশ্য অধ্যক্ষার হুমকি সত্ত্বেও নির্ভীক ছাত্রীরা ২১শে তারিখে কলেজ চত্বরে একটি শহীদ-বেদী নির্মাণ করেছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভাষা আন্দোলনের আত্মদানকারী তরুণদের স্মৃতিতে তৈরী এই স্তম্ভটিকে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দেন। বলা বাহুল্য সরকার-পরিচালিত এই শিক্ষায়তনটির কর্তৃপক্ষের এই নির্মম আচরণ ঢাকা শহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর এবং 'সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে'র নবম শ্রেণীর দু-জন ছাত্র যথাক্রমে মোসাররফ হোসেন এবং আকরাম হোসেনকে পুলিশ ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গ্রেপ্তার করে, কারণ তারা নাকি শহরের মতিঝিল অঞ্চলে 'Polwell' নামে পুলিশ কর্মচারীদের একটি সমবায়-বিপণির ইংরাজীতে লেখা সাইনবোর্ড অপসারণ করে বাংলা বোর্ড স্থাপনের দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। দু-জন ছাত্রের এই অপরাধকে এতই গুরুতর বলে সরকারী মহল সাব্যস্ত করেছিলেন যে, এই ঘটনায় প্রায় দু-সপ্তাহ পরেও দক্ষিণ-ঢাকার হাকিম সাহেব জনাব খন্দকার

আবদুল কাদেরের এজলাশে এদের জামীন-আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ও তাঁর মোসাহেবের দল প্রায়শই দেশবাসীকে উপদেশামৃত বর্ষণ করে থাকেন যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বারোশ মাইল শত্রু-ভূমি—অতএব জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে হলে দেশের এক অঞ্চলের ভাষা অপর অঞ্চলকে শিখতে ও বুঝতে হবে—কিন্তু কার্যত কি ঘটছে?

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানীরা উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় উর্দু-ভাষা শিখছে, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষা প্রসারের ব্যবস্থা ব্যাপক বা তরান্বিত করতে সরকারী ঔদাসীন্য সীমাহীন।

পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রবাসী বাংলীদের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে বছর ছয়েক আগে করাচীতে একটি বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতা ও উৎসাহের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির প্রায় জন্মলগ্নেই ঘনিয়ে এসেছিল এর অন্তিম দশা। অর্থাভাবে কলেজটির জন্য নিজস্ব কোন ভবনের ব্যবস্থা করা তো দূরে থাক, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক, গ্রন্থাগার—এমন কি ন্যুনতম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সংস্থান পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয়নি। কলেজের জন্য কোন জমি বরাদ্দ করতে করাচী পৌর কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা নাকি করাচীতে বাংলা কলেজের জন্য অর্থ মঞ্জুর করে মূল্যবান সরকারী ভাণ্ডারের অপচয় ঘটাতে নারাজ।

ঢাকার অগ্রগণ্য দৈনিক "সংবাদ" মন্তব্য করেছিলেন: 'কর্তৃপক্ষ মুখে-মুখে জাতীয় সংহতির বুলি আওড়ালেও বাস্তবে তাদের কার্যকলাপ অন্য রকম। বাংলা কলেজটির প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার এই জাতীয় ধারণাকেই উৎসাহিত করবে।' (২৮শে মার্চ, ১৯৬৭)

পূর্ব-পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে সকালে-দুপুরে-রাত্রে—যখন-তখন উর্দু অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়—এ ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সংবাদ উর্দু ভাষায় প্রচারিত হয়,—অথচ সারা পশ্চিম-পাকিস্তানে একমাত্র রাওয়ালপিণ্ডি বেতার কেন্দ্রে দৈনিক তের ঘণ্টা অনুষ্ঠানের মধ্যে যেন কৃপা করে মাত্র পনের মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছে বাংলা অনুষ্ঠানের জন্য।

কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের পরামর্শ অনুযারী ত্রি-ভাষার (ইংরাজী, বাংলা, উর্দু) যে সূত্রটি গৃহীত হয়েছিল তা প্রায় ছেঁড়া কাগজেরই সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই ফরমূলা অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের তাঁরা দেশের যে অংশে কর্মরত সে অংশের ভাষা তাঁদের নিয়োগের দু-বছরের মধ্যে শিখতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রয়োগ করা হচ্ছে শুধু বাংলা-ভাষী পূর্ব-পাকিস্তানীদের প্রতি যাঁরা পশ্চিম-পাকিস্তানে নিযুক্ত হন।

অবশ্য পাক-সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের অফিসারদের অধিকাংশই অবাঙালী এবং বাংলা ভাষার প্রতি সাধারণতঃ এঁদের অবজ্ঞা অপরিসীম। এমন কি এঁরা যখন পূর্ব-পাকিস্তানে কর্তব্যরত থাকেন, তখনও এঁদের এই উন্নাসিক মনোভাবের উল্লেখনীয় কোন পরিবর্তন ঘটে বলে মনে হয় না।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নুরুল আমীন অভিযোগ করেছিলেন যে কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার অস্তিত্বের কথা আমীর-ওমরাহরা সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হন।

তথাপি আশ্চর্য ঘটনা মনে হতে পারে যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অপর্যাপ্ত আনুকূল্য লাভ করা সত্ত্বেও সে দেশে উর্দু প্রচারকদের মধ্যে সম্প্রতি হতাশা ও আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিম-পাকিস্তান যা পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম-

সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত, তার জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের মাতৃভাষা উর্দু—প্রধানতঃ তাঁদের, যাঁরা দেশবিভাগের পর ভারতের উত্তর-প্রদেশ বা দিল্লী অঞ্চল থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে এসেছিলেন। বিগত সেনসাস রিপোর্ট অনুয়ায়ী পাকিস্তানের জনসমষ্টির শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগের মাতৃভাষা উর্দু। কিন্তু এ সত্ত্বেও উর্দুকে শুধু যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাই নয় সারা পশ্চিম-পাকিস্তানের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

অবশ্য এ কথা সত্যি যে দেশ-বিভাগের পূর্বেও যে অঞ্চলগুলি নিয়ে আজ পশ্চিম-পাকিস্তান সেখানে ভারতীয় মুসলমানদের নব-জাগরণের ভাষা হিসাবে উর্দুর যথেষ্ট কদর ছিল এবং সিন্ধি, পশতু, বালুচি, পঞ্জাবী প্রভৃতি এই এলাকার ভাষাগুলিকে উর্দু হরফে লেখা হোত। কিন্তু এ পূর্ব-প্রাধান্য সত্ত্বেও পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু ভাষা বর্তমানে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন।

প্রথমতঃ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ দেশের সর্বোচ্চ স্তরের নেতাদের ওকালতি ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানের একমেব দ্বিতীয়ং রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দু প্রচলনে ব্যর্থতা এবং উর্দুর সঙ্গে বাংলার—যাকে তাঁরা গয়ের-ইসলামী হিন্দুর জবান বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেই অভ্যস্থ ছিলেন—সমমর্যাদা লাভ উর্দু-প্রেমীদের বুকে শক্তিশেল-সম আঘাত হেনে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ সিন্ধি, পশতু, পঞ্জাবী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে উত্থানের ও নব-চেতনার যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুর পক্ষে এক চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিছু দিন আগে লাহোরে পশ্চিম-পাকিস্তানের অ-উর্দু-ভাষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁদের অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাগুলির সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনাচক্রে সর্ব-সম্মতিক্রমে দাবী উত্থাপন করা হয় যে

অন্ততঃ হায়ার-সেকেণ্ডারী মান পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্ব-স্ব এলাকায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অচিরাত চালু করা হোক।

পঞ্জাবী-প্রধান ও প্রভাবিত পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু'র আধিপত্যের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতা যে ক্রমশঃ কত প্রবল হয়ে উঠছে তার একটি নজির পাওয়া যাবে ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭) পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বার্তাটিতে—"লাহোরের উর্দু একাডেমীতে অর্থ সঙ্কট'—লাহোরে প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত অর্থ মঞ্জুর না করায় পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু একাডেমী তার কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উর্দু একাডেমীর বিভিন্ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের উপর ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

উর্দু'র শক্ত ঘাঁটি পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরেই উর্দু একাডেমীর এ দুরবস্থার কথা প্রথম শ্রুতিতে অবিশ্বাস্য এক কাহিনী মনে হতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তব চিত্র।

উর্দু'র উগ্র সমর্থকরা কিন্তু দেশের অন্যান্য ভাষার কাছে নতি স্বীকার করতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যখন লাহোরে একটি জনসভায় তাঁর নিজস্ব ও স্থানীয় ভাষা পঞ্জাবীতে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন উর্দু গোষ্ঠী তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

এ সময়ই লাহোরে অধ্যাপক, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিকদের উর্দু-ভাষী একটি গোষ্ঠী উর্দু'র সমর্থনে একটি মৌন মিছিল বের করেছিলেন।

এর কদিন আগে এক কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে উর্দু-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালেন পাকিস্তান জাতীয় নরসুন্দর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব ইসলাম সলমানী। করাচী রেল স্টেশনের কাছে বিলাসবহুল "সিমলা হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে"-এর উদ্বোধন করতে গিয়ে উর্দু'র সমর্থনে এক লম্বা-চওড়া বক্তৃতাই দিয়ে বসলেন তিনি।

উর্দু বনাম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার—বিশেষ করে বাংলাভাষার দ্বন্দ্ব আজ কীভাবে সে দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষের মনকে প্রভাবিত করছে তার পরিচয় আবার পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১লা মার্চ তারিখে যখন কবি বেনজির আহমদের বাসভবনে ঢাকা পূর্ণিমাবাসর আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় কট্টর ঐসলামিক নেতা বর্ষীয়মান মৌলানা আকরম খাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—উর্দু আরবী হরফে বাংলা লেখবার যে প্রস্তাব উর্দু-প্রচারকরা হরদম করে থাকেন সে বিষয়ে তাঁর অভিমত কী?

নবতিপর বৃদ্ধ মৌলানা সাহেব যিনি একদা তাঁর আজাদ পত্রিকায় উর্দু-আরবি-ফারসির প্লাবন বইয়ে দিতেন ধীর অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলেন: 'আমি উর্দু হরফে বাংলা লিখব কেন—বরঞ্চ আমি বাংলা হরফেই উর্দু লিখব।'

আয়ুব-শাহীতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ১৯৬৭ সালেরই জুন মাসে পাকিস্তান রেডিও থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দিয়ে একটি ফতোয়া জারী করলেন। এতে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিসেবীরা এক যুক্তবিবৃতিতে খাজা শাহাবুদ্দিনের এই অপকর্মের তীব্র সমালোচনা করে বললেন:

'রবি ঠাকুর তাঁর সৃজনী প্রতিভা দ্বারা বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতকে যে ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তা পাকিস্তানের বাঙালী অধিবাসীদের অনুভূতিশীল মন ও চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের নীতি নির্ধারণের সময় এই মনোভাবের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।'

এ যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: ডঃ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যক্ষ জয়নাল আবেদীন,

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এম. এ. বারী, অধ্যক্ষ আবছুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক সরোয়ার মোর্শেদ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দর চৌধুরী, সিকান্দর আবু জাফর, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কবি শামসুর রহমান, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও হলগুলির নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে এটাকে বাংলাভাষার প্রতি সুপরিকল্পিত সরকারী হামলা এবং বাংলা হরফ রোমান বা আরবী হরফে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। তারা কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর এ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এতে স্বাক্ষর করেন :

(১) জনাব শামসুদ্দোহা (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন); (২) জনাব আবছুর রাজ্জাক (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র লীগ); (৩) মাহফজা খানম (সহ সভানেত্রী, ডাকসু); (৪) শ্রীদিলীপ মিত্র (সহ সভাপতি, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ); (৫) শ্রীমুকুন্দ হালদার (সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ হল, ছাত্র সংসদ); (৬) জনাব তোফায়েল আহমদ (সহ সভাপতি, ইকবাল হল ছাত্র সংসদ); (৭) জনাব সিরাজুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল, ছাত্র সংসদ)।

সে বছরই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঢাকায় রবীন্দ্র-তিরোধান দিবস ২২শে শ্রাবণ অনুষ্ঠিত হোল—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে খাজা শাহাবুদ্দিনের বিষোদগারের মাত্র মাস দেড়েক পরে।

'যতদিন বাংলা ভাষায় মানুষ কথা বলবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের সত্তা বিরাজ করবে। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের কবি, সর্বযুগের সর্বকালের কবি। কোন গতিই রবীন্দ্র প্রতিভার আবেদন থেকে আমাদের বিযুক্ত করতে পারবে না।'—২২শে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের

মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার ইনজিনীয়ার্স ইনস্টিটিউড হলে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কালে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদের সভাপতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা আবেগভরে উপরোক্ত উক্তি করেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ঢাকার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "ঐক্যতান" ও "ছায়ানটে"র শিল্পীরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রায় দু-হাজার শ্রোতা বিমুগ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছিলেন। হলটিতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না—ফলে অগণিত শ্রোতা হলের বাইরের বারান্দা বা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঞ্চের পশ্চাৎপটে রাখা বিশ্বকবির আবক্ষ চিত্রের সামনে "ঐক্যতানে"র শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে পর-পর পনেরটি নির্বাচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় "ছায়ানটে"র সঙ্গীতানুষ্ঠান। সনজিদা খাতুন, ফাহামিদা খাতুন, লায়লা আর্জুমন্দ বানু, জাহেদুর রহিম, ফারুকুল ইসলাম, মালেকা আজিম, রাখী চক্রবর্তী সহ ঢাকার প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্য। এ ছাড়া ঐদিন রবীন্দ্র-রচনাবলীর নির্বাচিত অংশ থেকে পাঠ ও আবৃত্তিও করা হয়।

"তাসের দেশ" নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়েছিলেম মোস্তাফিজুর রহমান, মালেকা বেগম, আতাউর রহমান, রফিকুল বাশার, ফউজিয়া মুসলিম, গোলাম রব্বানী, জাহেদুর রহিম, এনামুল হক, ফজলুল আলম, প্রদীপ-কুমার গুহ, নাসিমা খান মজলিস, তৈয়বা খাতুন, কাজী তামান্না প্রভৃতি।

রচনা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন ইকবাল বাহার চৌধুরী, ইফফাত আরা দেওয়ান, সেলিনা চৌধুরী, আহমেদ হোসেন, মুক্তি চক্রবর্তী, আজমেরী জামান।

তৃতীয় শেষ দিন মঞ্চস্থ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দর্শকদের অশেষ প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহে এত বেশী দর্শক সমাগম হয়েছিল যে স্থানাভাবে অনেককেই নিরাশ হয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

লায়লা হাসান ও বাবুরাম সিং যথাক্রমে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের ভূমিকায় সার্থক রূপদান করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন সাইদা, নাসরীন, লিপিকা প্রভৃতি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আতিকুল ইসলাম। ইনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

এর মাত্র মাসখানেক আগে আয়ুব-শাহী দেশের "তমুদ্দনের পরিপন্থী" বলে আর্তনাদ করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আইয়ুব-সবুর-সাহাবুদ্দিনের সমস্ত ভ্রূকুটি ও হুমকি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বস্তরের মানুষ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র-তিরোধান দিবস পালন করে পুনরায় বাংলা ভাষা, বাঙালী জাতীয়তাবোধ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের অতলস্পর্শী অনুরাগ ও মমত্ববোধের পরিচয় দিলেন।

বাইশে শ্রাবণ ঢাকার বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে তো বটেই; "পাকিস্তান অবসারভার"-এর মত ইংরেজী দৈনিকেও (যার পাঠকবর্গের মধ্যে বহু অবাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী আছেন) প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে বিশ্বকবির তিরোধান দিবসের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল,—এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচী দেওয়া হয়েছিল। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ হচ্ছে যে এই কলকাতায়—যাকে রবীন্দ্র সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে সর্বদাই গর্ব প্রকাশ করা আমাদের স্বভাবজাত, বাগবাজার থেকে প্রকাশিত সেই অগ্রগণ্য বাংলা দৈনিকটিতে ১৩৭৪ সনের বাইশে শ্রাবণের ঘোষণাটি ছিল সপ্তম পৃষ্ঠায় সভা-সমিতি কলমের ঠিক ওপরে)

ঢাকার প্রগতিশীল সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ সে বছর "বাইশে শ্রাবণ" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছিলেন:

'আজ বাইশে শ্রাবণ। রবীন্দ্র-যুগের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এই দিনের গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ এই দিন ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র যুগের তাতে পরিসমাপ্তি ঘটে নাই বরং বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বার্ণাড শ যেমন কয়েকশত বৎসর ধরিয়া সেক্সপীয়র বাঁচিয়া থাকাতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, আমরা রবীন্দ্রযুগ তথা রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘজীবন লাভে ঈর্ষান্বিত নই, বরং গৌরবান্বিত। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষার নির্মাতা, আধুনিক বাঙালী মানসের স্রষ্টা। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, বরং গ্রহণ করিয়া নিজস্ব সংস্কৃতির রূপরেখার সৌকর্য ও মর্যাদা বাড়াইতে চাহি।'

'রবীন্দ্রনাথকে দেশ বা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার প্রচেষ্টা নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য। ইকবাল সারে জাহানের মধ্যে হিন্দুস্থানকেই শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া আখ্যা দিয়া হিন্দুস্থানের গুলিস্থানে বুলবুলি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় কবি হইবার তাঁর বাধা না থাকিলে ভারত তীর্থের প্রশংসার জন্য পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ কেন বর্জিত হইবেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠিতে পারে। পাকিস্তানের শত্রুদেশে সূর্য তার কিরণ বর্ষণ করে বলিয়া পাকিস্তানবাসীরা কি সূর্যের আলোককে বর্জনের পরিকল্পনা করিবে?'

'দৈনিক সংবাদে' ছোটদের বিভাগ 'খেলা-ঘর'-এর পরিচালক ভাইয়া তাঁর চিঠিতে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন :

'যে কবি 'আজ আমাদের ছুটি' 'খেয়া নৌকা গড়ে' 'তালদীঘিতে ভাসিয়ে' দিতে তোমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে' কালো মেঘের আনাগোনা দেখে তোমাদের ঘরের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন, কেশে পাক ধরা সত্ত্বেও যে বুড়ো কবি তোমাদের সমানবয়সী বলে দাবী করেছেন—সেই কবি রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণতিথি বাইশে শ্রাবণ।'

'রবীন্দ্রনাথ তোমাদের কবি। রবীন্দ্রনাথ সবার কবি। তাঁর কবিতা, গল্প, গান—সব কিছুতেই আমরা আমাদের নিজেদের খুঁজে পাই। আমাদের অতীতকে খুঁজে পাই—খুঁজে পাই বর্তমান—অনাগত ভবিষ্যৎ।'

'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'জননী' জন্মভূমি ও ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির জন্য সুগভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' বলে তিনি মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন, 'এ পৃথিবী মধুময়—মধুময় পৃথিবীর ধূলি' বলে জয়গান গেয়েছেন সুশোভিত পৃথিবীর।'

'আমাদের চেতনার সবটুকু জুড়ে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—আমাদের আনন্দে, আমাদের বেদনায়, আমাদের প্রফুল্লতায়, বিষাদের প্রতিটি মুহূর্তে যেখানে রবীন্দ্রনাথ—সেখানে মহল-বিশেষ তাঁকে 'অনাত্মীয়' বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে, এ খুবই দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের নন, তাঁর কবিতায় তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়নি—এ অপপ্রচারে তোমরা কেউই বিভ্রান্ত হবে না। বিশ্বকবিকে অস্বীকার করতে যাঁরা উৎসাহী সুকুমার চেতনায় তাঁরা উজ্জীবিত নন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :

পঁ্যাচা রাষ্ট্র করে দেয়
পেলে কোন ছুতা
জান না সূর্যের সাথে
আমার শত্রুতা!'

'হৃদয়ে যারা এভাবে জীর্ণতাকে পোষণ করে। তাদের ঘা মেরে বাঁচাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কাঁচাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন :

'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'

'চক্ষুকর্ণঢাকা, আধমরাদের দীনতা জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে দেবার এ আহ্বানে তোমাদের সাড়া দিতে হবে।'

'আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হতে রবীন্দ্রনাথের নাম মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে যে সর্বনাশ অপচেষ্টা চলছে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ তিথি বাইশে শ্রাবণে এসো আমরা নতুন করে শপথ নিই।'

ঢাকার "পূর্বদেশ"-এর কালপেঁচার ডায়েরীতে "বকলম" রেডিওতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সুতীব্র ব্যঙ্গ করে লিখলেন :

'শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের গান নাকি আমাদের রেডিও টেলিভিশনে আর শোনা যাইবে না?' কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

—তাই নাকি? কালাচাঁদ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ?

—কারণ-টারণ আমি জানি না, আমি কহিলাম, কাগজে দেখিতেছি, বলিতেছি, জনৈক উজির নাকি কহিয়াছেন যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নাকি পাকিস্তানী মূল্যবোধের বিরোধী।

কালাচাঁদ বিজ্ঞের মত হাসিলেন। কহিলেন, এতদিনে সাহেবদের হুঁশ হইয়াছে। তাই ত আমি ভাবি যে এত বড় বড় পণ্ডিত সব সদর সাহেবের দরবারে উজির নাজির থাকিতে এই রবীন্দ্র-সঙ্গীত জিনিসটা ব্যান্ হইতেছে না কেন।

ওঃ। আমি ছোট্ট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া গেলাম। মনের রাগ মনেই চাপিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে আপনিও ঐ পণ্ডিতদের দলেই?

কালাচাঁদ চটিয়া উঠিলেন। কহিলেন, দেখ, ফাজিলের মত কথা কহিও না। পণ্ডিত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক তেল, অনেক মাখন খরচা করিয়া তবে পণ্ডিত হওয়া যায়। তোমার মত ধান-বেচা টাকা দিয়া ধেনো বিদ্যা লাভ করা নয়।

—তেল,মাখন খরচা করিয়া পণ্ডিত হওয়াটা কি রকম? আমি আর জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

—দেখ পণ্ডিত মানে বিজ্ঞ ব্যক্তি। এবং শাস্ত্রে আছে বিজ্ঞ না হইলে মন্ত্রী হওয়া যায় না। কাজেই ন্যায়শাস্ত্রের নীতি-অনুযায়ী মন্ত্রী ব্যক্তি মাত্রেই পণ্ডিত ব্যক্তি। এবং ইত্যকার পণ্ডিত হইতে হইলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হইতেছে তেল এবং মাখন মালিশ করিবার ক্ষমতা,—আশা করি ইহা তোমার বোধগম্য হইতেছে।

আমি কথা কহিলাম না। কথাটা পুরাতন। ইহার মধ্যে বুঝিবার কিছু নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু এই মূল্যবোধ জিনিসটা কি?

—মূল্যবোধ জিনিসটাও বুঝিলে না? ধরো, একটা জিনিস, তাহার একটা মূল্য আছে। সেই যে মূল্য আছে, তাহার বোধই হইতেছে মূল্যবোধ।

—রবীন্দ্রনাথ কি ইহার বিরোধী ছিলেন?

—সব জিনিসের নহে। তবে পাকিস্তানের-ত বটেই।

—কেমন?

—এই ধরো, পাকিস্তান যে হইল এতবড় সুন্দর পাক-সাফ একটি রাষ্ট্র—ইহার মূল্য তিনি বুঝিলেন না।

—পাকিস্তান ত রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই।

—হয় নাই তাহাতে কি হইয়াছে? হইবে তাহা ত তিনি জানিতেন?

—তিনি জানিবেন কি করিয়া?

—জানিবেন না কেন?

তিনি মরিবার এক বৎসর আগে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হইয়াছে। তিনি যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কবি হইতেন তাহা হইলে ভারত-সঙ্গীত যেমন লিখিয়াছিলেন পাকিস্তান-সঙ্গীতও একখানা লিখিয়া যাইতে পারিতেন।

আমার মনে হইল কাঁলাচাঁদ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। আমি বলিলাম মূল্যবোধ কথাটার অর্থটা বোধহয় পরিষ্কার হয় নাই, মিয়া ভাই।

—তা তোমার কাছে পরিষ্কার না-ও হইতে পারে। কালাচাঁদ রাগিয়া কহিলেন তা তোমার কাছে কি বলিয়া মনে হইতেছে? ভেঙ্গাইয়া-ভেঙ্গাইয়া কালাচাঁদ কহিলেন।

—খবরের কাগজে যাহা দেখিলাম তাহা হইতেছে—'রবীন্দ্র-সঙ্গীত পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধী।' এই জন্য তাহা নিষিদ্ধ।

—ও! এত সব-তো তুমি আমাকে বলো নাই। 'সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ', জিনিসপত্রের মূল্যবোধ নহে। তবে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাও সত্য। আবার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও সত্য।

—কি রকম?

—আমাদের অর্থাৎ পাকিস্তানের সাংস্কৃতির মূল কথা কি? কালাচাঁদ উল্টা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি কহিলাম—মূল কথা হইল পাকিস্তান প্রস্তাব।

—ঠিক। তবে আমাদের সংস্কৃতি আর রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কি?

আমি কহিলাম, সেটাই যদি ভালো করিয়া জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনাকে এতটা বিরক্ত করতাম না।

—জানিবে না কেন? কালাচাঁদ রাগিয়া উঠিলেন—জানিতেই হইবে।

—আপনি বলুন।

—আচ্ছা শোন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু এবং কাজেই পৌত্তলিক—

আমি বাধা দিয়া কহিলাম—না, উনি ব্রাহ্ম এবং একেশ্বরবাদী।

কালাচাঁদ হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ঐ

ভুলই ত তোমরা সকলে করো। আসলে তিনি ব্রাহ্মের সাজে আসলে একজন হিন্দু ছিলেন। কাজেই মূলতঃ পাকিস্তান-বিরোধী।

—কিন্তু তাঁর সঙ্গীতে?

—তাঁর সঙ্গীতে সবই অপাকিস্তানী কথা—যেমন, প্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা, বিশ্বপ্রেম, মনের মানুষ, দেবতা—এ সব পাকিস্তানে অচল। আমাদের মূল কথা হইতেছে জেহাদ। কাজেই বুঝিতেছ—রবীন্দ্রনাথের প্রেম, বিশ্বপ্রেম, ত্যাগ, ভালোবাসা—এগুলি জেহাদের সংকল্পকে ঢিলা করিয়া দেয়। কাজেই এগুলি হইতেছে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিরোধী।

—প্রেম-ভালোবাসা, দেব-দেবতা, কালী-কৃষ্ণ, এসব ত নজরুল ইসলামের মধ্যেও রহিয়াছে।

—রহিয়াছে ঠিক। কিন্তু ইহার মধ্যে জেহাদও রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে পার।

—আপনারা যে লালন ফকির, সিরাজ সাঁই প্রভৃতি লইয়া মাতামাতি করেন—তাহাদের মধ্যে ত জেহাদ-টেহাদ কিছু নাই।

সব লোকের মধ্যে সব জিনিস থাকিবে ইহা তোমাকে কে বলিয়াছে? কালাচাঁদ চটিয়া উঠিলেন।

—তাহা হইলে কি প্রেম-ভালোবাসাও ব্যান্ হইয়া যাইবে?

—তোমরা ঘরে বসিয়া, দুয়ার দিয়া এ সব জিনিসের প্র্যাক্‌টিশ্ করিতে পার। কিন্তু প্রকাশ্যে যত কম পারো করিও। আসলে আমাদের রেডিয়ো টেলিভিশন ঐ সব জিনিসের জন্য নয়।

—তাহার অর্থ কি এই যে, আপনি গোপনে এ সব করিতে পারিবেন। ঘরে বসিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজাইতে পারিবেন। কিন্তু রেডিয়োতে শুনিতে পাইবেন না?

—যতদিন পর্যন্ত ঘরে-ঘরে পুলিশ বসাইয়া দিতে না পারি, ততদিন ত আর ইহা বন্ধ করা যাইবে না। তবে সে কথাও চিন্তা করিতে হইতেছে।

—তখন কি খালি জেহাদের গান হইবে?

—না, প্রেম-ভালোবাসাও থাকিবে। তবে খাঁটি পাকিস্তানী প্রেম-ভালোবাসা। এবং তাহার ভাষাও হইবে খাঁটি পাকিস্তানী—রবীন্দ্রনাথের নহে। এই একটা রবীন্দ্রনাথ জন্মাইয়া আমাদের কাজ এত বাড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে, যে, তাহা আর কহতব্য নয়। লোকটা এখন মরিলে বাঁচি।

—লোকটা ত মরিয়াই গিয়াছে মরা লোকের এত ভয়?

—মরে নাই হে মরে নাই। যন্ত্রণাটা ত ঐখানেই। বাংলা ভাষা আস্ত থাকিতে তাহাকে নিধন করা সম্ভব হইবে কি না তাহাই পণ্ডিতদের নিকট আজ বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা ভাষা এদুটিকে আলাদা করিয়া দেখা প্রায় অসম্ভব করিয়া রাখিয়া গিয়াছে ঠাকুরের পো।

—তাহা হইলে বাংলা ভাষাকেই ব্যান্ করিয়া দেন।

—সে কথা কখনো-কখনো মনে না-হয় তাহা নহে।'

•

পাকিস্তানে জঙ্গী সরকার-সমর্থন-পুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট ভারত-বিদ্বেষী একটি হীনমন্য-গোষ্ঠী যারা পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে ন্যূনতম সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মধ্যেও গভীর চক্রান্ত সদা অবলোকন করেন তাঁরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে যতই অপপ্রচার করবার চেষ্টা করুন না কেন পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কত প্রিয় কত আপন তার পরিচয় আবার পাওয়া গেল অন্যান্য বছরের মত সেবারও (পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭৪ সালে) সারা প্রদেশ জুড়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অসংখ্য অনুষ্ঠান ও সে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ও মনীষী ব্যক্তিদের অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্য দিয়ে। যেবার আয়ুব-শাহীর খড়্গহস্ত প্রসারিত হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র-চর্চার উপর। বাংলার কবি—বাঙালীর কবি—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তান-বাসীরা তাঁদেরও জাতীয় কবি হিসাবেই গণ্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক জনাব মোফাজ্জল হায়দার রবীন্দ্র স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেন: 'কবিগুরু আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদেরও কবি।'

ঢাকার জনপ্রিয় প্রগতিশীল 'দৈনিক সংবাদ' তাদের পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যার সঙ্গে বিশেষ রবীন্দ্র-জয়ন্তী ক্রোড়পত্র ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা ছাড়াও প্রথম পৃষ্ঠায় এই পুণ্য দিবসটির পুনরাগমনের কথা ঘোষিত করে লেখেন: 'আজ পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি। আজ সারা বিশ্ব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে বিশ্বমানবতা, শান্তি ও সুন্দরের অমর কবিকে। বাঙালী তার হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে পালন করবে চির আপন কবি রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব। তাই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এদেশের বাঙালী মানসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিবছরের মত এবারও অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল।'

জঙ্গী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে নির্ভীক প্রচারের অপরাধে ঢাকার অপর একটি প্রগতিশীল দৈনিক সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক'-এর প্রকাশ ১৯৬৬ সালে আয়ুব-শাহীর স্বরাষ্ট্র দপ্তর বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই ১৯৬৭ সালে ইত্তেফাক ছিল না—কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৮ই মে (২৫শে বৈশাখের) 'ইত্তেফাক' থেকেই তাঁদের রবীন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলির কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'আজ পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস। আজ হইতে একশো পাঁচ বৎসর পূর্বে বৈশাখের এমনি এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে বাংলার মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির নামে গর্বে আমাদের বুক ভরিয়া উঠে, বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিয়া আমাদের তরুণরা যে ভাষার গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাংলাভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের নিকট সহস্রভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই।'

'বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাই পঁচিশে বৈশাখের অম্লান স্মৃতি আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে মহাকাশমন্ত্রিত সঙ্গীতের মূর্ছনা তোলে, কবির স্মৃতির কিরণ-স্পর্শে আমাদের মানসলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।'

'কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের এই শুভক্ষণ শান্তি-স্বাধীনতা ও বিশ্বমানবিকতার মহান আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইবার জন্য আমরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।'

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ছাড়াও রাজধানী ঢাকায় বাংলা একাডেমী, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট প্রভৃতির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করা হয়।

'মহৎ সাহিত্য মাত্রই সারা বিশ্বের, সর্বমানবের সম্পত্তি। দেশ, কাল বা সম্প্রদায়ের ভেদরেখা টেনে তাকে নিষিদ্ধ করা সম্ভব নয়—সঙ্গতও নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে শ্রেণী বিশেষ যে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন তা নেহাতই অনভিপ্রেত। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের বুক থেকে নদী-নালার চিহ্ন যেমন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ব-পাকিস্তান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়'—বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তাদের কণ্ঠে এই প্রত্যয়ই ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বিশ্বকবির প্রতি সমগ্র মুসলমান সমাজের গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বলেন যে মুসল-মানদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা সম্পর্কিত অভিযোগ কত যে অসার রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগীমাত্রই মর্মে-মর্মে তা উপলব্ধি করেন।

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন রবীন্দ্রনাথকে মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে তার কোথায় কত গভীরতা, কোথায় কোন্ মণিমুক্তা লুক্কায়িত তার পরিমাপ করা মানুষের অসাধ্য।

প্রখ্যাত মনীষী ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ শহীদুল্লাহ রবীন্দ্র দর্শনের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন। তাঁর বক্তব্য: 'ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান-বাসীরা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিরাজমান।'

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা। ফাহমিদ খাতুন, মালেকা আজিম, সনজিদা খাতুন, খোরশেদী আলম, জাহেদুর রহিম প্রভৃতি। তাঁদের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত পূর্ব-পাকিস্তানের সহস্র সহস্র রবীন্দ্রভক্ত শ্রোতাকে অভিভূত করেছিল।

শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই নয় পশ্চিম-পাকিস্তানেও আয়ুব-শাহীর জঙ্গী ঘাঁটি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রবাসী বাঙালীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করেন। রাওয়ালপিণ্ডির বাংলা সাহিত্য পরিষদ্ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট কথাশিল্পী মোহাম্মদ আবু ইসহাক। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আবৃত্তি ছাড়াও চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্য পরিবেশন করেছিলেন রাওয়ালপিণ্ডির বাঙালী অধিবাসীরা।

সরকারী ভ্রূকুটি ও বিরুদ্ধবাদীদের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তাদের একান্ত আপন কবি রবীন্দ্র-নাথকে অন্তরের সব অনুভূতি উজাড় করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেও ইসলামাবাদ নিয়ন্ত্রিত রেডিও পাকিস্তান রবীন্দ্র জন্মদিবস-টিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই উপলক্ষে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রচার না করায় পূর্ব-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। 'দৈনিক সংবাদ' মন্তব্য করেন: 'যাঁহার গগনস্পর্শী প্রতিভার দৌলতে দীনা-হীনা বঙ্গসাহিত্য রাজরাণীরূপে বিশ্বের

দরবারে সমাসীন রেডিও পাকিস্তান সেই মহামনীষীর জন্মদিবস উপলক্ষে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে নাই।' (৯ মে, ১৯৬৭) ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনতা' রেডিও পাকিস্তানের এই রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাবকে 'চাঁদের আলো অস্বীকার-কারী মূঢ় ব্যক্তির চোখ নীচু করে আকাশের দিকে তাকানোর সামিল বলে মন্তব্য করেন।'

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়েছিল। নজরুল গীতি প্রচারও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল যদিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। এদের দুজনেরই অপরাধ এঁরা ভারতীয়। রেডিও পাকিস্তানের কাছে রবীন্দ্রনাথের অপরাধ বোধহয় বেশী গুরুতর কারণ তিনি শুধু ভারতীয়ই নন, উপরন্তু অমুসলমানও। একথা এখন খুবই স্পষ্ট যে পাকিস্তানের প্রতি-ক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত বেতার ও প্রচার-মন্ত্রক খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার ও প্রসারে সামিল হয়েছিল। কিন্তু আনন্দের কথা যে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল ও সচেতন জনতা রবীন্দ্র-সঙ্গীত তথা ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গীত প্রচারে তাদের বেতার-কেন্দ্রগুলির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অবজ্ঞার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের দেশের বেতার-সংস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বস্তর থেকে নির্মূলভাবে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সাধন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালে দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত একটি পত্রে রাজশাহী জিন্নাহ্ হল ছাত্র-সংসদের সাহিত্য সম্পাদক জনাব মশহুদ করিম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সম্পর্কে পাক-বেতারের বিরূপতার তীব্র সমালোচনা করে লিখেছিলেন: 'আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু লজ্জাকর নয়, এরকম নজির বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল। রবীন্দ্রনাথকে

বাদ দিয়ে বেতার অনুষ্ঠান চালিয়ে কর্তৃপক্ষ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু এর জন্য কেউ তাঁদের বাহবা দেবেন না। এত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁরা যে অন্ধ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিচ্ছেন তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুখে শুধু চুনকালিই পড়ছে।'

একটা রবীন্দ্র-বিরোধী চক্র কিছুদিন যাবৎ নানা অপপ্রচার চালিয়ে এসেছিল পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষী স্বৈরাচারী শাসক-কুলের সমর্থন-পুষ্ট হবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী জনাব আবদুল মতিন দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'পঁচিশে বৈশাখ ও আমাদের বিবেক'-শীর্ষক একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধে এই স্বার্থদুষ্ট গোষ্ঠীর হীন কার্যকলাপের তীব্র নিন্দাবাদ করে লেখেন যে পাকিস্তানে বিশ্বকবি সরকারী প্রচাযন্ত্রের তীব্র ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের উপলক্ষ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অন্তরে কি অসীম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে জনাব মতিন পরিশেষে মন্তব্য করেছেন :

'কবির শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বের চেতনার গভীরে সূর্যমুখী ফুলের মত ফুটে আছে—তাকে কোন শর্তেই কোন হিংস্র দানবের কাছে আমরা বিকিয়ে দিতে পারি না।'

'আজও এদেশে শিলাইদহ রয়েছে—শাহাজাদপুর রয়েছে—রয়েছে কবির তপ্ত নিশ্বাস। গানের রাজ্যে গেলে দেখি তিনি আকাশ ছুঁয়ে আছেন—কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি আমাদের জাগ্রত হিমালয়—আর আজকের সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার যুগে কবি আমাদের কাছে বিশ্বপ্রেমের সার্থক বার্তাবাহকের ভূমিকায় দেদীপ্যমান।'

'তাই ২৫শে বৈশাখ শুধু কালপঞ্জীর একটি দিন নয়—২৫শে বৈশাখ আমাদের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের দিন—তার নব নব পর্যায়ে উত্তরণের দিন।'

ঢাকার "দৈনিক সংবাদ" ১৯৬৭ সালের ৯ই মে (২৫শে বৈশাখ)

"বিশ্বকবি" শীর্ষক একটি অনবদ্য সম্পাদকীয় নিবন্ধে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে লিখেছিলেন :

'বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি। বাংলার শ্যামল প্রান্তর, নদনদী, মৌসুমী বায়ুর আনন্দ হিল্লোল আর মেঘভরা আকাশ বিশ্বের সৃজনী মেলায় অক্ষয় স্থান পাইয়াছে রবীন্দ্র প্রতিভার আনুকূল্যে। রবীন্দ্র প্রতিভাই বিশ্বের মহা দরবারে সম্মান আর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বাংলা ভাষাকে। রবীন্দ্র প্রতিভা তাই বাংলা ভাষার গৌরব, বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি নরনারীর গৌরব। এই গৌরবকে যাঁহারা অস্বীকার করিতে চান তাঁহারা আর যাই হউক আত্মমর্যাদা তথা মানব মর্যাদার দাবীদার হইতে পারেন না।

যে অর্ধ শতাব্দীকাল রবীন্দ্র সূর্য এই উপমহাদেশের আকাশে দীপ্যমান ছিল—সেই কালটা ছিল সংঘাতমুখর, স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ-স্রোতে ক্ষত-বিক্ষত। এই অর্ধ শতাব্দীতে খেলাফত, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আর বামপন্থী গণ-সংগ্রাম—স্বাধীনতা সংগ্রামের এমনি একাধিক স্রোত যেমন একদিকে মৃত্যুঞ্জয়ী জনতার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রাভিযানের অমর আলেখ্য রচনা করিয়াছে, তেমনি উপমহাদেশের চেতনা আর ভাবলোকে আনিয়া দিয়াছিল নতুনের দিগন্ত। নতুন আর পুরাতনের অনিবার্য সংঘর্ষ। বৃদ্ধ বয়সেও নতুনের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট তিনি ছিলেন সাহস আর প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। কিন্তু ঘোরতর এই স্বাদেশিকতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে" মানবতার এই উদারবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন স্বীয় কাল আর ভাবী কালের জন্য। মানবতার ভিত্তি মূলেই তিনি দেশপ্রেমের অধিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

২৫শে বৈশাখে কবির সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া স্বাধীনোত্তরকালে 'রবীন্দ্র বর্জনে'র যে রব হামেশাই শোনা যায়, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলেও আমরা মনে করি না

সত্যে সত্যই ইহার কোন প্রয়োজন রহিয়াছে, কেননা তাহা হইলে বাংলা ভাষাকেই তো 'বর্জন' করিতে হয়। আর একান্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া বাংলা ভাষা 'বর্জনে'র কথা কি কেহ ভাবিতে পারেন?'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও বিপুল জনপ্রিয়তা পূর্ব-পাকিস্তানে। বস্তুত তিনি পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় কবি হিসেবে বন্দিত হন।

ছায়া ঢাকা, সবুজ-শ্যামলিমা ঘেরা ছবির মত গ্রাম ময়মনসিংহের দবিরামপুর। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কিশোর-জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এ ছোট্ট পল্লীটি। পাশের গ্রাম কাজীর-সিমলার মহৎপ্রাণ দারোগা কাজী রফিজুল্লাহ্ কিশোর নজরুলকে আসানসোলের এক রুটির দোকান থেকে ময়মনসিংহ জেলায় নিয়ে এসেছিলেন ১৯১৪ সালে। রুটির দোকানের এই কিশোরের চোখে-মুখে প্রতিভার কোন দীপ্ত ছটা হয়ত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। রুটির দোকানের পাঁচ টাকা মাইনের 'ছোকরা' নজরুল আসানসোল থেকে চলে এলেন সুদূর ময়মনসিংহের কাজীর-সিমলায়—রফিজুল্লাহ্ দারোগার বাড়িতে। দারোগা সাহেব এই প্রতিভাবান কিশোরকে ভর্তি করে দিলেন পাশের গ্রাম দবিরামপুরের হাই স্কুলে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র নজরুল কাজীর-সিমলার দারোগা বাড়িতে থেকে কিছুদিন দবিরামপুর স্কুলে যাতায়াত করলেন। কিন্তু কাদা-মাটি-জল ঠেলে মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে রোজ স্কুলে যেতে-আসতে নজরুলের মত ডানপিটে ছেলেও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত কাজীর-সিমলার কাজী বাড়ি ছেড়ে দবিরামপুরে এক জাইগীর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হোল। এ বাড়িতে থেকেই নজরুল এক বছর দবিরামপুর স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। নজরুল জীবনের এ অধ্যায় বোধহয় অনেকেরই অজ্ঞাত।

দবিরামপুরে নজরুলের বাল্যবন্ধুরা বলেন যে তিনি নাকি

পড়াশোনার চেয়ে দুরন্তপনাতেই বেশী মেতে থাকতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী-সাথী জুটতে দেরী হোত না। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে তিনি পাড়ায়-পাড়ায় হৈ-হল্লা করে বেড়াতেন, বাগানের ফল পেড়ে অভিযানের দুরন্ত নেশা পরিতৃপ্ত করতেন। গলা ছেড়ে গান গেয়ে বটগাছের ডালে-ডালে ঘুরে বেড়িয়ে কিশোর নজরুল তাঁর প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেন। জনশ্রুতি আছে দবিরামপুর গ্রামে এক বিশাল বটগাছের ডালে জমিয়ে তাঁর আসর বসতো—গ্রামের দুরন্ত ছেলেরা এসে নজরুলের সাগরেদী করতো। কিন্তু নজরুল একাই ছিলেন একশো।

ডানপিটে ছেলে নজরুলের প্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ। স্কুলের বইপত্রের সঙ্গে খুব বেশী সম্পর্ক না থাকলেও তিনি পরীক্ষায় ক্লাশে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতেন। পাঠ্য-পুস্তক দু-একবার পড়ে নিয়ে হুবহু মনে রাখার বিরল প্রতিভা ছিল তাঁর। কিন্তু এহেন মেধাবী নজরুলও একদিন গ্রাম থেকে অন্তর্ধান করলেন। শোনা যায় পরীক্ষার খাতায় একটি কবিতা লিখে রেখে তিনি দবিরামপুর থেকে উধাও হয়েছিলেন। কেউ-কেউ বলেন যে নজরুল সবগুলি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন কবিতায়। এতে নাকি তাঁর শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চির-বিদ্রোহী নজরুল শিক্ষকের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেন। একদিন তাঁর সহপাঠীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে আর পেলেন না—ততক্ষণে দুরন্ত নজরুল পূর্ব-বাংলা ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন রাঢ় বাংলার পথে।

দবিরামপুরে নজরুলের সহপাঠীদের কেউ-কেউ এখনও বেঁচে আছেন যেমন প্রবীণ শিক্ষক নিয়ামত মাস্টার সাহেব। কিন্তু নজরুলের এ গ্রাম ছেড়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁদের সবাইর স্মৃতিই এক রকম ঝাপসা। তাই সে গ্রামে নজরুল এখন কিংবদন্তীর নায়ক,—তাঁর দবিরামপুর জীবন নিয়ে গড়ে উঠছে নিত্যনূতন কিংবদন্তী।

ঢাকার "নজরুল একাডেমী" গত বছর (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫) কবির স্মৃতি-বিজড়িত দবিরামপুর গ্রামে নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের একটি মনোজ্ঞ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। দবিরামপুর নজরুল একাডেমীর (কবির স্মৃতিতে দবিরামপুর স্কুলের নূতন নামকরণ হয়েছে নজরুল একাডেমী) কর্ম-কর্তারা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা এ ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন।

কবির জন্মদিবসের সকালে ঢাকার নজরুল একাডেমীর সদস্যবৃন্দ, বহু সাহিত্যিক-সাংবাদিক একাডেমীর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি বিরাট দল দবিরামপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে ট্রেনে ময়মনসিংহ যাত্রা করলেন।

একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পার্টমেণ্ট কাঁপিয়ে উচ্চ কণ্ঠে নজরুলের গান গাইতে সুরু করলেন :

'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল,
চল রে চল রে চল।'

পথে যে স্টেশনেই ট্রেন থামছিল সেখানেই কামরা ঘিরে দাঁড়াচ্ছিলেন অগণিত উৎসুক জনতা। নজরুল অনুরাগীদের ভীড় দেখে একাডেমীর দু-একজন সভ্য প্লাটফর্মে নেমে অতি উৎসাহে নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন।

ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে সেখান থেকে বাসে করে ঢাকার প্রতিনিধিদল যখন দবিরামপুর গ্রামে এসে উপনীত হলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে। তাঁরা দেখলেন প্রায় বিশ হাজার মানুষের এক বিশাল জনতা একটি বটগাছকে ঘিরে বসে আছে। বটগাছটির গায়ে অনেকগুলি রঙ্গীন মালা এবং কবি নজরুলের একটি ছবি শোভা পাচ্ছে। এই সেই কিংবদন্তীর বটগাছ যার ওপর বসে কিশোর নজরুল আড্ডা জমাতেন। এই উৎসাহী জনতা শুধু আশে-পাশের

গ্রাম থেকেই আসেনি—এসেছিল গফরগাঁও থেকে, এসেছিল ফুলবাড়িয়া থেকে-।

সামনের খোলা মাঠে নজরুল সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসল। বক্তারা নজরুল রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন,—কণ্ঠশিল্পীরা পরিবেশন করলেন উদাত্ত নজরুল সঙ্গীত।

রাত যত বাড়তে লাগল উৎসাহী শ্রোতার সংখ্যাও তত। বিশাল ময়দানে আলোর সুবন্দোবস্ত ছিল না, মঞ্চে টাঙ্গানো হ্যাজাক লাইটটাও বাতাসের ঝাপটা খেয়ে বারবার নিভে যাচ্ছিল, কিন্তু এসব দিকে শ্রোতাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না—তাঁরা একমনে গান আর কবি-প্রসঙ্গ শুনছিলেন। ক্রমে আরও অন্ধকার নেমে এল,—কিন্তু তখনও দূরদূরান্ত থেকে টিমটিমে হারিকেন হাতে নিয়ে নজরুল-অনুরাগী মানুষের দল সভায় এসে হাজির হচ্ছিল।

সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বক্তৃতা আর গান শুনে দবিরামপুর—সিমলা,—ত্রিশালের মানুষের মনে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হোল। কবি নজরুলের জনপ্রিয়তার এক অবিস্মরণীয় দিক দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত হোল।

কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর কাব্য পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁরা প্রতি বছর মহাসমারোহে কবির জন্ম-জয়ন্তী পালন করেন। নজরুল কাব্য-চর্চা পূর্ব-বঙ্গের ঘরে ঘরে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও তাঁর কাব্য সৃষ্টিকে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। শুনলে আশ্চর্য মনে হতে পারে যে কবি সুকান্তর জন্মদিনে পূর্ব-বঙ্গের কোন কোন সংবাদপত্র বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীতকেই পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশন থেকে আয়ুব-শাহী নিষিদ্ধ করলেন না। তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পদাঙ্ক এবার অনুসরণ করলেন পাকিস্তানের স্বনামধন্য যোগাযোগ

মন্ত্রী খুলনার সবুর খান সাহেব। এবার তাঁর ভূমিকা হোল 'ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুন' রক্ষা করা। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার কুখ্যাত সবুর সাহেবের ভূমিকার কথা আগেই বলেছি।

রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক জাতীয় পরিষদে ভাষণ দানকালে সবুর সাহেব ঘোষণা করেন: 'পহেলা বৈশাখ পালনের মাধ্যমে বিদেশী ভাবধারা পাকিস্তানীদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করছে। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন, কেননা এদিন তারা পূজা-অর্চনা করে থাকেন। স্বাধীনতা লাভের আগে মুসলমানরা এদিনটি পালন তথা বাংলা নববর্ষ বরণ করত না।'

অবশ্য এ ধরনের ঘোষণা বা এহেন কার্যকলাপ সবুর সাহেবদের এ নতুন নয়। আজাদী লাভের পর থেকেই সবুর সাহেবরা তাঁদের মনিব গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বার-বার হামলা চালিয়েছেন।

বাংলা ভাষার সংস্কার, আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা বর্ণমালার সঙ্কোচন, পশ্চিম পঞ্জাব নাম বহাল রেখে পূর্ব-বাংলার নাম পরিবর্তন এবং একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে উর্দুকে পাকিস্তানের বাংলা ভাষা-ভাষীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা—এসব কাণ্ড-কারখানা তারা করে আসছেন গত কুড়ি বছর ধরে।

সবুর সাহেবরা যখন একান্ত অনুগতের মত প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখ খোলেন তখন তাঁরা ইতিহাস ভূগোল সব কিছুই যেন ভুলে যান বা ভুলে যেতে বাধ্য হন। তাঁদের জানা উচিত যে 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিত পহেলা বৈশাখ-কেন্দ্রিক বাংলা সাল পশ্চিম-বঙ্গ বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নিজস্ব সন বা তারিখ নয়।

সবুর সাহেবরা জানেন না অথবা ইচ্ছা করেই অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কিনা তা বোঝা শক্ত। তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে—যে মোগল সম্রাটদের কীর্তি নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা (হিন্দুরাও বটে) গৌরব বোধ করেন এবং ভবিষ্যতেও

করবেন। সেই মোগলদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর হচ্ছেন এই বঙ্গাব্দের তথা পহেলা বৈশাখ-কেন্দ্রিক বাংলা সালের প্রবর্তক। আকবর ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের কৃষি-ভিত্তিক পূর্বাঞ্চলের (বাংলাদেশ) কৃষক-কুল যখন বছরের প্রথম কৃষি কাজ সুরু করে সে সময় থেকে সাল গণনা করাটা অধিকতর সুবিধাজনক। সেজন্যই সম্রাট আকবর নতুন বর্ষপঞ্জী গণনা করতে শুরু করেন। সেটাই হচ্ছে আকবরী সাল অথবা বাংলা সাল—বঙ্গাব্দ।

ঢাকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পূর্বদেশ' মন্তব্য করেন: 'পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উৎসব জলবায়ু নির্ভর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ—বাংলার অধিবাসীদের উৎসব। এটা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খৃস্টান কারো নিজস্ব সম্পদ নয়। যেহেতু পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেজন্য এটা আমাদের অন্যতম উৎসব।' (২রা জুলাই ১৯৬৭)

'পয়লা বৈশাখের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের চাষী, সে দেশের জেলে, সে দেশের তাঁতী, সে দেশের শ্রমিকের যুগ-যুগান্তরের অন্তরের সম্পর্ক।

পহেলা বৈশাখের দিন থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদেরও শুভ হালখাতা সুরু হয়। জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব-পর্যন্ত পহেলা বৈশাখ পুণ্যাহ (পুণ্য + অহ = পুণ্যাহ বা পুণ্য দিন) শুধু হিন্দুদের ছিল না, মুসলমান জমিদারদের কাছারীতেও প্রচলিত ছিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই। এখন পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নমেণ্টের তহশীল কাছারীতে যে সালতামামি খাজনার হিসাব রাখা হয় বা খাজনা আদায় করা হয় তাও এই পহেলা বৈশাখের হিসাবেই। কাজেই পাকিস্তান সৃষ্টির আগে মুসলমানরা পহেলা বৈশাখ পালন করত না বা এটা বিজাতীয় ভাবধারা সম্পন্ন এই উদ্ভট ঘোষণা কতদূর অসার একটু তলিয়ে দেখলে—একটু আত্মস্থ হয়ে,—আত্ম-প্রবঞ্চনা না করে চিন্তা করলে সবুর সাহেবরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।'

'পূর্ব-দেশ' আরও মন্তব্য করেছেন: 'বাংলা নববর্ষ পালন সবুর সাহেবদের কাছে বিজাতীয়। অথচ দুশো বছর ধরে যারা আমাদের গোলামীর জিঞ্জিরে বেঁধে রেখেছিলো-তাদের নববর্ষ পালনে সবুর সাহেবদের আপত্তি নেই—বরং মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ রয়েছে। হাজার-হাজার টাকা খরচ করে আলোকসজ্জা, নিউ-ইয়ার্স প্রিন্টিং কার্ডস, ককটেল, প্লে-বয় আর টেডি সংস্কৃতিতে মেতে উঠেন তাঁরা ইংরাজী নববর্ষ বরণের সময়। তাঁরা কি চান আমরা আমাদের বাঙালী সত্তা ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত তাঁদের মত সেই বিজাতীয় ট্রা-লা-লা সংস্কৃতিতে মেতে উঠি?

সবুর সাহেবরা গত কুড়ি বছরে আমাদের নানাভাবে বঞ্চিত করেছেন, মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে নিজ দেশে পরবাসী করে রাখবার চেষ্টাও কম করেননি। এ গরীবদের নিজস্ব বলতে কিই বা আছে? আছে শুধু নিজেদের সাংস্কৃতিক সম্পদ। বুঝতে পারি না—গরীবদের এ সম্পদটুকুর ওপরও এবার সবুর সাহেবদের নজর পড়ল কেন? বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব সংস্কৃতি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে তাঁদের এ আগ্রহের পেছনে কি গূঢ় রহস্য রয়েছে—তা এখনও ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। তবে বাঙালী মুসলমানকে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ঘায়েল করার পেছনে যে সর্বনাশা মতলব তাঁদের ছিল তেমনি কোন মতলব এই নবতর ভূমিকার পেছনে হয়ত তাঁদের আছে অনেকের মনেই এ আশঙ্কা জাগছে।'

ঢাকার "সাপ্তাহিক পূর্বদেশ" নববর্ষ পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন:

'এসো হে বৈশাখ এসো এসো
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক্ যাক্ যাক্
এসো হে বৈশাখ।'

একদিকে মৃত্যু আর একদিকে নতুনের আহ্বান। পুরাতন

বছরের ঝরা পাতার বেদনাক্লিষ্ট কান্না আর নতুনের আগমনী সুর। এমনিভাবে আত্ম প্রত্যয়ের হাসি নিয়ে দুঃখময় অতীতকে পেছনে ফেলে আমাদের দ্বারে এসে করাঘাত করছে বাংলা নববর্ষ ১৩৭৪ সাল। বিগত বছরের হাসি-কান্নাকে পেছনে রেখে আমাদের এ বাঙালী জীবন আরেকটি বছরের দোরগোড়ায় পা বাড়ালো। বাঙালীর অতীত হলো দীর্ঘতর।'

সাপ্তাহিক "পূর্বদেশ" 'কালপেঁচার ডায়েরী'র লেখক বকলম বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও পয়লা বৈশাখের ওপর আয়ুব-সবুর গোষ্ঠীর আক্রমণকে যথারীতি সুতীব্র ব্যঙ্গ করে লিখলেন :

'অচিন পাখী নাটক

[দেখিয়া রাজদরবার বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহা যে রাজদরবার তাহা হলপ করিয়া বলিবার উপায় নাই। সিংহাসন মনে হইতেছে দখলিকৃত, কিন্তু কোন মানুষ নাই। শুধু সিংহাসনের ভিতর হইতে কথার আওয়াজ শোনা যায়। আমরা তাহাকে অচিন পাখী বলিব।

চারিদিকে ফরাস পাতা, তাহাতে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ বেশবাস দেখিয়া অমাত্য বলিয়াই মনে হয়। তবে সকলেরই মুখে এমন করিয়া চুন লেপ্টাইয়া রাখা যে, মনে হইতেছে যুদ্ধকালের শত্রুপক্ষের সহিত পঞ্চমবাহিনীর লোকদের ছবির মুখ। চেনা যাইতেছে না।

স্থান বা কাল কিছুই বোঝা যাইতেছে না।]

অচিন পাখী—হে অমাত্যগণ,

অমাত্যবর্গ—(কুর্নিশ করিয়া) বলেন হুজুর!

অচিন—শুনিতেছি, আমাদের এ

পবিত্র ভূমে

একদল লেখোয়ার
চাহিতেছে শনৈঃ শনৈঃ
ইসলামের সর্বনাশ,
এবং তাহারা নাকি দিবারাত্রি
বঙ্গীয় ভাষার ধারে
করে ঘষা মাজা—
যাহা দিয়া এককালে বঙ্কিম চরণ
মুছলমানের এই সুকোমল গরদানের পর দিয়াছিল মারি?

১নং অমাত্য—হুজুর সে নহে বটে বঙ্কিম চরণ
চট্টো বংশে জাত তার বঙ্কুচন্দ্র নাম

২য় অমাত্য—যাঁহার লেখনী থেকে…

অচিন—(বাধা দিয়া) থাক্ থাক্। হইয়াছে পণ্ডিতপ্রবর, আমার ছামনে আসি পাণ্ডিত্যের ধার না-দেখান। ওসব দেখান গিয়া ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোকরামতি শিক্ষকের কাছে।

সব অমাত্য—হ্যাঁ, হুজুর। বলেছেন ঠিক। হুজুরেরা সর্বদাই ঠিক-ঠিক কথা বলে।

অচিন—ঠিকই বটে। তবে আমার এ শ্রীচরণে এতখানি তেল ঢালিবার প্রয়োজন নাই। সত্য যদি থাকেন বলিয়া, তবে দর্শান প্রমাণ।

অমাত্যরা—হুজুরের প্রামাণিক হুজুর নিজেই। অন্য কোথা থেকে প্রমাণ আনিব?

অচিন—তবুও শুনিতে চাই।

৩য় অমাত্য—হুজুরের মতে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা শিক্ষকের মত এবং শিক্ষক যারা-তারা হয় ছোকরার মত।

অচিন—সাচ্ বাত। মার কেল্লা!

৩য় অমাত্য—যদি চান ইহারও প্রমাণ। হে হুজুর, তাহা হলে দিয়া তব কান শুনে যান :

আজকাল হাটে ঘাটে মাঠে এবং বৈঠকে,
বার মাস তেরটি পার্বণে
আর কারো কথা নাহি শুনি।
শুধু শুনি রবীন্দ্রনাথের পচা গান।
রবীন্দ্রনাথ?
হাঁ হুজুর। সে করেছে কাত
আমাদের পবিত্র তাহজিব ও তমদ্দুন

অচিন—তামাকুদুন?

অমাত্য—না হুজুর। তমদ্দুন অর্থাৎ কালচার। আজ দুই যুগ ধরে আমরা যাহারা কতিপয় কালচারের সৈয়দ জাদারা তমদ্দুনের ঝাণ্ডা উঁচু রাখি রাখি কাঁধে হলো বেহারার কড়া—আমাদের অক্লান্ত সাধনা আজ বুঝি যায় ভাসি বঙ্গীয় ভাষার বেনোজলে।

অচিন—অর্থাৎ?

অমাত্য—অর্থ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে এক বঙ্গীয় বিভাগ অর্থ, এই বাংলা একাডেমী আর এই উন্নয়ন বোর্ড আর এই সংবাদপত্রের চেড়িগণ এবং ছাত্রেরা— (অমাত্যের গা কাঁপিয়া উঠিল)

অচিন—তোমরা কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে তোমার তামাকদুন এবং তাবিজ—

অমাত্য—না হুজুর—তমাদ্দুন এবং তাহজিব

অচিন—কথা একই। বলো—

অমাত্য—হুজুর জানেন, আজকাল রাস্তাঘাটে রমনার মাঠে—এমনকি সরকারের রেডিয়োর পাটে বর্ষারম্ভে, বর্ষাকালে শরতে, হেমন্তে আর বর্ষের বিদায়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদে রবীন্দ্রনাথের নাম, রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের পদ্য শুনি—

অচিন—বন্ধ করে দাও, সুকঠিন আইন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কারখানা।

অমাত্য—বন্ধ করে দেখিয়াছি। তারপর এই সব লেখোয়ার গান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গীয় শিক্ষক একাডেমী, উন্নয়ন বোর্ড

ছাত্রদল। এমনকি উর্দ্দু লেখোয়ার প্রতিবাদ প্রসেশন এবং বয়কট। দেশ ভরে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেলা গিজ গিজ করে।

অচিন—(গর্জ্জন) তোমরা কি করো? পার না করিতে প্রসেশন তামাকদূনের ঝাণ্ডা নিয়া?

অমাত্য—(সকলে মাথা নীচু করিল)

অচিন—(অধিকতর গর্জ্জন) কি? কথা বলো। ভয় কেন? লজ্জা কেন? পয়সা খাও, এইটুকু নেমকের দাম দিতে পার নাক?

অমাত্য—হুজুর, এমন করে কখনো-ত কেউ করেনি হুকুম তাই ভয় হয় পাছে, যদি ঐ ঠাকুরের চেড়ীবৃন্দ আমাদের পরে আক্রমণ করিয়াই বসে কিংবা হুজুরের সশস্ত্রবাহিনী আমাদের পশ্চাৎ হইতে সটকান দেয়—

অচিন—হা-হা-হা!

কাপুরুষ। একে বলে নেমক হারাম। মার খেয়ে তারা ফিরে আসে—। তোমাদের বুকে যদি জোর নাহি থাকে তবে আছে ভাড়াটিয়া সশস্ত্র বাহিনী লাঠি-ঠেঙা, হকিবাজী লাঠি, রেডিয়োর চোঙা, আর টেলিভিশনের—দেব এক গণ্ডা সম্পাদক, সুবিস্তা ভাড়ার লেখোয়ার—ইহাতেও যদি বুকে জোর নাহি আসে তাহা হলে কি করিতে পারি?

অমাত্য—আসিবে, আসিবে জোর নিশ্চয় আসিবে। হে হুজুর শুধু যদি, করেন হুকুম। তবে কিনা 'বঙ্গদেশ' 'বাঙালী' 'বাঙালী' কথাটা আমাদের চিত্তে দেয় দোলা।

অচিন—বঙ্গদেশ?

অমাত্য—হাঁ হুজুর। বঙ্গদেশ।

অচিন—(আশ্চর্য হইয়া) তোমরা কি জান না-ক

আজ এক এক কুড়ি বর্ষ ধরি
আমাদের চর্ম হতে,
আমাদের চক্ষু পর্দা থেকে

আমাদের নাড়ী থেকে
সবচেয়ে কড়া ঝামা দিয়া
বঙ্গদেশ এবং বাঙালী এই দুটি মায়া
ঘষিয়া তুলেছি।
এখনও কি এই দুই পুরাতন মায়া
তোমাদের চিত্তে দেয় পাক?

অমাত্য—না, হুজুর। চিত্তে নহে, পিত্তে দেয় পাক

অচিন—পিত্ত কেন?

অমাত্য—হে হুজুর, আমাদের চিত্তের বালাই
অবশিষ্ট আর কিছু নাই,
আপনার দোয়ায়।
এখন রয়েছে শুধু
পিত্ত-কফ-বায়ু।

অচিন—সাধু। সাধু। এবে বলো পিত্তে তব কেন দেয় পাক।

অমাত্য—হুজুর শোনেন,
এই পাঁচ কোটি মুছলমান
(বাঙালী ব্রাকেটে)
হইয়াছে তাহাদের ভাষার গোলাম,
যদিও মনে ও প্রাণে ইসলামের পাবন্দ তাহারা—রবীন্দ্রনাথের নামে কোনই গিবৎ
শুনিতে নহেক রাজী।
যত বলি—ঠাকুরের ব্যাটা
পাকিস্তানী নহে ইসলামের বহির্ভূত লোক
ততই তাহারা, দেখি
ঠাকুরের নামে উন্মত্ত সকলে।
এমন কি ভয় হয় পাছে।
তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী মারিবে মাথায়।

ভয়ে তাই পিত্তের
ব্যারাম হয়ে পড়ে।
অচিন—কোন ভয় নাই। মারো মারো বলে,
হায়দারী হাঁকে নেবে যাও মাঠে।
অন্ততঃ একদা,
দেখাও পিত্তের জোর
চিত্ত যদি নাই থেকে থাকে।
আমরা রয়েছি পিছে।
সভা করো,
স্টেটমেন্ট দাও। প্রয়োজন হলে···
অমাত্য বর্গ—হ্যাঁ, হুজুর, আমরা প্রস্তুত।
অচিন—তবে যাও। আর দেরী নহে।
প্রয়োজন হলে বাংলার কোন কিছু
এই পাক ভূমে রাখিব না।
রবীন্দ্র ঠাকুর কেন শুধু,
তাহার এবং তার বেবাক চেলাকে
এই দেশ থেকে দেব দূর করি।
তাতে যদি এই দেশ জনহীন হয়
কোন ক্ষতি নাই।
ভাষা ত দূরের কথা।
ভাষা দিয়া কোন কাজ নাই।
সাহিত্যে কি আসে যায়?
এই দেশে আমরা এবং তোমরা থাকিবে। মহাসুখে বিরাম ভিটায়
নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করি। হরদম এই সব ঝামেলার মূল হোক দূর।
হোক দূর বাংলা দেশ। এবং বাঙালী।'

বাংলা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি হননের আরেকটি অপচেষ্টা ব্যর্থ হোল।

সরকারী সমস্ত বাধা উপেক্ষা করেও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীনচর্চা পূর্ব-পাকিস্তানে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে চলছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে যে দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে বাংলা একাডেমীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এই একাডেমীর একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

১৯৫৫ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমী স্থাপিত হয়। এই একাডেমী ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ১৩২ খানি বই প্রকাশ করেছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয় পর্যায়ের উপর এই বইগুলি রচিত হয়েছিল।

ভাষাতত্ত্ব—৪	জাতীয় সাহিত্য—৬
অনুবাদ—২২	দর্শন—৫
সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—২	প্রাচীন সাহিত্য—৫
লোকসাহিত্য—১২	আধুনিক সাহিত্য—৮
শিশুসাহিত্য—২০	বিজ্ঞান—৬
নাটক—১৯	বিবিধ—১৬
ধর্মীয় সাহিত্য—৭	মোট—১৩২

বাংলা একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের কথা। পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জেলার জনসাধারণের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—যা বিদগ্ধজনের সাহিত্যে স্থান পায়নি সেরূপ শব্দ সংগ্রহ করে এই অভিধান রচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের অভিধান এই প্রথম।

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যে চারখানি বই একাডেমী প্রকাশ করেছেন তারমধ্যে "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" এবং "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত" এই বই দুখানি উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ সাহিত্যেও একাডেমীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ইংরাজী

ও উর্দু থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরাজী ও উর্দুতে একাডেমী বাইশখানি অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশ করেছেন।

বাংলা একাডেমী তার কার্যকলাপের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে নাট্য সাহিত্যের বিকাশের উপরও জোর দিয়েছে। এ ধরনের প্রচেষ্টার গুরুত্বের কারণ হোল—পূর্ব-পাকিস্তানে কোন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নেই এবং সেদেশে মঞ্চায়নের উপযোগী নাট্য-সাহিত্যও এখনও গড়ে ওঠেনি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের যে অবদান রয়েছে আজ পর্যন্ত তার সঠিক কোন মূল্যায়ন হয়নি। এ উদ্দেশ্যে একাডেমীর গবেষণা বিভাগ আলাওল, সৈয়দ সুলতান, গরিবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা এবং মধ্যযুগের অন্যান্য মুসলমান কবি ও লেখকদের রচনা সম্পাদনার কাজ সুরু করেছেন। আলাওলের যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে তার তুলনামূলক পাঠ শেষ হয়েছে। গরিবুল্লাহ ও হামজার রচনাবলী সম্পাদনের কাজও সমাপ্ত প্রায়।

লোকসাহিত্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদির উন্নয়নের জন্যও একাডেমী বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শিশুদের জন্য একটি এনসাইক্লোপিডিয়া প্রণয়নের জন্য একাডেমী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিন লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন।

বাংলা একাডেমীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা প্রণয়ন। বাংলায় পরিভাষা প্রণয়নের এ দায়িত্ব সর্বপ্রথম একাডেমীই গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েক শো বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলা হরফ সংস্কার ও সহজীকরণের জন্য একাডেমী ১৯৬৩ সালে বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ্‌দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা করে বাংলা হরফ সংস্কার ও সহজ করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারকল্পে এই একাডেমীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে—অবাংলাভাষীদের জন্য বাংলা শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও লেখকদের আর্থিক সাহায্য-দান, সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলা একাডেমীর মূল উদ্দেশ্য হোল 'পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নয়ন' এবং এ কাজে এর পরিচালকবৃন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতী হয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

বাংলা একাডেমী ছাড়াও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধন এবং উচ্চপর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব-পাকিস্তানে কাজ করছে সেটা হোল বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। পাঁচ বছর আগে ঢাকায় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়।

উচ্চপর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং টেকনলজির ক্ষেত্রে বাংলাভাষার যে দৈন্য রয়েছে তা দূর করা ও জাতীয় মূল্যবোধের উন্নতি সাধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে রয়েছে শিশুদের জন্য বাংলাভাষায় উপযুক্ত বই এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞান, হিউম্যানিটিজ্ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ক্লাশের পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, বাংলা টাইপ রাইটার উন্নয়ন ইত্যাদি।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৮ খানি বই প্রকাশ করেছেন। এই ১৮ খানি বই-এর মধ্যে ৯ খানি হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক ও ৬ খানি হিউমানিটিজ্ গ্রুপের।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যরা মনে করেন যে সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষার উপযুক্ত

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন—শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা গ্রন্থের যে অভাব রয়েছে তা দূর করার জন্য বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বেশী জোর দিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত শব্দ আছে তার উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়নের কাজও বোর্ড গ্রহণ করেছেন। কারণ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হলে এ সবের বাংলা প্রতিশব্দ দরকার। এ উদ্দেশ্যে বোর্ড কয়েকটি পরিভাষা কমিটি গঠন করেছেন। পরিভাষা কমিটি বিজ্ঞানের ১১টি বিষয়ে মোট ১০ হাজার ৬শ ৫টি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেছেন। কলা শাস্ত্রের ৯টি বিষয়ে ৮ হাজার ৫শ ৬টি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়ন করা হয়েছে। বোর্ড ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিষয়ের প্রতিশব্দ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন।

বোর্ডের লাইব্রেরী এবং গবেষণা-বিভাগও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গবেষণা বিভাগে এক হাজার ষোলটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি মৌলিক গবেষণার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হবে। প্রাচীন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহেও বোর্ড অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। ইতি-মধ্যে দু-হাজারেও বেশী প্রাচীন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সব রেকর্ড-পত্র বাংলায় লেখা হয়। যে কোন সরকারী বা বেসরকারী অফিসে ইংরাজীতে যে রূপ দক্ষতার সঙ্গে অফিসের রেকর্ড লেখা হয়, এখানেও সমান দক্ষতার সঙ্গে তা লেখা হয়।

বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ছাড়াও সর্বস্তরে বাংলা-ভাষা প্রচারের জন্য আরেকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিছুদিন কাজ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল বাংলা প্রচলন সমিতি। এই সমিতি বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা, প্রাচীরপত্র এবং আলোচনা সভা ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা করে বাংলা চালু করার দাবী করেছিলেন।

এক কথায় পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাঁদের প্রিয় ভাষা বাংলা

ভাষা, তাঁদের গর্বের ভাষা বাংলাভাষার উন্নয়নের জন্য তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলা ভাষা সত্যিই তাঁদের কাছে—'মোদের গরব মোদের আশা—আমরি বাংলাভাষা।'

পূর্ব-পাকিস্তানের নবীন মুসলমান সমাজ আজ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তারা আত্মগর্বিত বাঙালী। বাংলার ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, নাটক, চলচ্চিত্র—এক কথায় বাঙালীর সংস্কৃতির যে কোন অঙ্গ—পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গ নির্বিশেষে তাঁদের একান্ত আপন। বঙ্গ-বিভাগ বঙ্গ-সংস্কৃতিকে তাদের কাছে বিভক্ত করতে পারেনি। বেশ কয়েক বছর হোল ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানী পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য নাকি পাকিস্তানে তৈরী চলচ্চিত্র শিল্পকে "protection" দেওয়া। অবশ্য গভীরতর আরেকটি উদ্দেশ্যও পাকিস্তানের শাসকচক্রের ছিল। সেটি হোল কলকাতায় নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রভাব থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকরা পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। বরঞ্চ এ সাংস্কৃতিক আকর্ষণ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই হয়েছে। এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন এখানে তুলে ধরছি। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ঢাকা শহরে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে ভারতীয় ছবি ছিল প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিত রায়ের 'মহানগর।' 'সত্যজিৎ রায়' পূর্ব-পাকিস্তানে একটি অত্যন্ত ঘরোয়া নাম। সেদেশে সংস্কৃতি-সচেতন মানুষের মুখে-মুখে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নামটি উচ্চারিত হয়। এই চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে 'মহানগর' যখন ঢাকায় এলো, তখন এই ছবিটি দেখতে সত্যজিৎ রায়ের অগণিত অনুরাগী, পশ্চিম-বাংলায় তৈরী ছবির অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেদিন কি

ঘটেছিল তার বিবরণ ২৮শে মার্চ (১৯৬৫)-এর "দৈনিক ইত্তেফাক"-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ হুবহু উদ্‌ধৃত করে জানাচ্ছি।

> 'গতকাল 'মহানগরের' ৩ টাকা দামের টিকিট কালোবাজারে ৩০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। অবশ্য যে ভাবে মানুষ এই টিকিট সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে এই বাড়তি মূল্য সম্ভবতঃ অসঙ্গত হয় নাই।'

'চলচ্চিত্র উৎসবের ভারতীয় ছবি 'মহানগরের' টিকিট সংগ্রহ লইয়া গতকাল (শনিবার) শহরে মহা হাঙ্গামা লাগিয়া যায় এবং স্টেডিয়ামে টিকিট ক্রয়েচ্ছু জনতার উপর পুলিসকে বারংবার লাঠিচার্জ করিতে হয়। এই লাঠি চার্জের ফলে প্রায় ১০০ ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে ২০।২৫ জনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যাইতে হয়।

এই বাংলা ছবিটি দেখার জন্য সারা শহর যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে। শুক্রবার রাত্রি ৮টা হইতে সুরু করিয়া প্রায় সারারাত্রি এবং সকালেও অসংখ্য নরনারী স্টেডিয়ামের নিকটে আসিয়া লাইন দেয়। বহু ছাত্র এবং ছাত্রী রাত্রিতে আসিয়া লাইন দেওয়ার জন্য তৈরী হয়। তবে শেষপর্যন্ত ছাত্রদের সঙ্গে দু-এক দফা মারামারির পর সকালের দিকে ছাত্রীরা চলিয়া যায়। শুধু ছাত্র-ছাত্রীই নয়—শহরের সাধারণ নাগরিকরাও এইভাবে টিকিটের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়ে স্টেডিয়ামের টিকিট ঘরের সম্মুখে লাইন রচনা করেন। ফলে গতকাল সারারাত্রিই স্টেডিয়াম পাড়া টিকিট প্রার্থীদের হাস্য-লাস্য এবং তাস খেলায় গুলজার থাকে। শেষ রাত্রের দিকে এই লাইনের কলেবর বাড়িতে শুরু করে এবং সকাল আটটার দিকে লাইন বায়তুল মোকাররমের নিকট হইতে শুরু করিয়া গোটা আউটার স্টেডিয়াম ঘুরিয়া ডি.আই.টি ভবন পর্যন্ত চলিয়া আসে। অর্থাৎ এই লাইনের সুরুতে যাঁহারা আছেন, ইহার শেষ কোথায় তাহা তাহাদের জানার উপায় নাই। ভোর পাঁচটার দিকে পুলিস ঘটনাস্থলে আসে। পুলিস যখন আসে, তখন স্টেডিয়ামের টিকিট কাউন্টারের নিকট হইতে ১০।১২টি

সারির প্রত্যেক সারিতে ১০।১২টি করিয়া উপ-সারি তৈরী হইয়া গিয়াছে এবং বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়ামের নিকটে রীতিমত বিরাট জনতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ প্রথমতঃ ১০।১২টি লাইনকে একটি লাইনে পরিণত করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত লাঠি চালাইয়া তাহারা একটি লাইন বানাইতে সমর্থ হয়। ইহার পর বেলা ৮টা পর্যন্ত মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলেও লাইনের লোকেরা নিজেদের স্বার্থের তাগিদে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। কিন্তু আটটার পর টিকিট কাউন্টার খোলার সঙ্গে-সঙ্গে লাইনে এবং লাইনের মধ্যে যাঁহারা নিজেদের ঢুকাইয়া দিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে রীতিমত লড়াই সুরু হইয়া যায়। এই পর্যায়ে পুলিশকে আবার লাঠিচার্য করিতে হয়। ফলে ছত্রভঙ্গ জনতা পুলিসের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এইভাবে দুইদলে রীতিমত সংঘর্ষ চলে। ইহার পর হইতে বেলা প্রায় পৌনে দু'টায় সমস্ত টিকিট (৭ হাজার) শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৫।৭ মিনিট পরপর পুলিসকে লাঠি চালাইতে হয়। এই লাঠি চালনার ফলে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ২০।২৫ জনকে চিকিৎসা গ্রহণ করিতে হয়। তবে কাহারও আঘাত মারাত্মক হয় নাই।

এদিকে স্টেডিয়ামে যখন মারামারি লাঠালাঠি চলিতেছিল' ওদিকে বলাকা সিনেমা হলের নিকটে তখন টিকিট প্রার্থীদের লাইন জমিয়া উঠিতেছিল। বলাকার নিকটে লাইনে বহু মহিলাও ছিলেন।'

ঢাকায় পশ্চিম-বঙ্গের চিত্র "মহানগরে"র এ অসাধারণ জনপ্রিয়তায়, "মহানগর" দেখবার জন্য ঢাকার সাধারণ মানুষের আকুলতা পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুবের তল্পীবাহকদের চক্ষুশূল হয়েছিল— তাঁরা পাকিস্তানের "জাতীয় তাহজীব-তমুদ্দন" রসাতলে গেল বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। "দৈনিক ইত্তেফাক" এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ধিক্কারজনক ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলেন:

'যে কারণে উৎসবের অন্যান্য ছবিতে ভিড় হইয়াছিল, সে কারণেই 'মহানগর'-এও ভিড় হইয়াছিল। তবে 'মহানগর'-এর বেলায় অতিরিক্ত দুই-তিনটি কারণ সংযোজিত হয়েছিল। প্রথম কারণ, ছবিটি বাংলা ভাষায়। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা আটানব্বই জন বাংলা-ভাষী হইলেও সারা বৎসরে এখানে দুই-চারিটা বাংলা ছবিও দেখার সুযোগ আসে না। স্বভাবতঃই বাংলা ছবির জন্য দর্শককুল অধীর হইয়া থাকে। 'তাহজীব-তমুদ্দন'-এর ঘেরাটোপে অন্ধ হইয়া আছে এমন 'লোকে'র সংখ্যা ত আর তেমন কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং 'মহানগর' দেখিবার জন্য দর্শককুল অত্যন্ত আগ্রহশীল হইবেন, ইহাই ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, 'মহানগর' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছবি। ছয়টি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পুরস্কারের গৌরবে 'মহানগর'-এর ললাট চিহ্নিত। 'মহানগর' ছবির নির্মাতা সত্যজিৎ রায়—যে নাম বর্তমান দুনিয়ার চিত্রজগতে অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করে। সুতরাং 'মহানগর'-এর জনপ্রিয়তা যদি তুলনামূলকভাবে অধিক প্রতিপন্ন হইয়া থাকে তবে আশ্চর্যের কিংবা বিষাদের কিছু নাই। এমনকি লাহোরেও 'মহানগর'-এর জনপ্রিয়তা এত অধিক হইয়াছিল যে, উৎসবের উদ্যোক্তাগণ ছবিটি প্রদর্শনের তারিখ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। পরিবর্তিত তারিখে সকল প্রকার সতর্কতা ও বিশদ ব্যবস্থা সত্ত্বেও হলের গেট ভাঙ্গিয়াছে, বিস্তর ঠেলাঠেলি হইয়াছে, এমনকি পিতা-পুত্রে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। তাৎপর্য একটাই: ভালো ছবি দেখার আগ্রহ।

কিন্তু আমাদের এখানকার একটি বিশেষ মহল 'মহানগর'-এর জনপ্রিয়তা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানের 'জাতীয় তাহজীব-তমুদ্দনে'র সর্বনাশ হইতে নাকি আর বিলম্ব নাই। এই মহলটি পূর্ব-পাকিস্তানের 'তরুণ-তরুণী'কে 'তরলমতি', ছাত্রছাত্রীকে 'হীনমনা' বুদ্ধিজীবীদের 'হ্যাংলা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছে।

তাহারা বলিয়াছে: 'একটি ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে রাজধানী ঢাকার বুকে যা হইয়া গেল তার অন্তরালবর্তী মর্ম উদঘাটনের প্রয়োজনীয়তা দেশ প্রেমিক মাত্রেই' নাকি অনুভব করিবেন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে: 'Patriotism is the last resort of a scoundrel.' আমরা আর ইহার অধিক কিছু বলিতে চাই না।'

পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের সংস্কৃতি সচেতনতার, সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের জন্য তাঁদের নিরলস সংগ্রামের পরিচয় আর কোন নিদর্শনের অপেক্ষা করে না।

এককালে বাংলার সন্ত্রাসবাদের বীর বিপ্লবী নেতাদের (যাঁরা সকলেই হিন্দু ছিলেন) সাম্প্রদায়িকতাতুষ্ট মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা "মুসলিম-বিরোধী" ও "সন্ত্রাসবাদের দ্বারা হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত" বলে উপহাস করতেন, এবং এ ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে অমিতসাহসী বিপ্লবী নেতাদের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রতি সাধারণ মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের অন্তরে শহীদ সূর্য সেন (মাস্টার-দা) ও অন্যান্য বিপ্লবী শহীদ নেতাদের স্থান অতি উচ্চে। পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিনিয়ত এই বঙ্গ সন্তানদের স্মরণ করেন, এঁদের জন্য গর্ব বোধ করেন। একটি নজির-স্বরূপ ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাস্টার-দার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বীর সন্তানরা যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন তার ৩৭তম স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার দৈনিক সংবাদ ১৯৬৭ সালে তাদের ১৮ই এপ্রিলের সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন:

'উনিশশো তিরিশের আঠারোই এপ্রিল। অগ্নিযুগের একটি অবিস্মরণীয় দিন। বীরপ্রসবিনী চট্টলার মাটিতে, জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায়, ভগ্নী প্রীতিলতার বক্ষ শোণিতে সেদিন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। সেদিন মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী তরুণদের জেহাদী কণ্ঠে আর অকাতর রক্তদানে এদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অজেয় ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল।

তাহাদের মত ও পথ ভ্রান্ত ছিল। ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ইতিহাস প্রমাণ কবিয়াছে সন্ত্রাসবাদ নহে; গণ-অভ্যুত্থানই বিপ্লবের একমাত্র পথ। তবু তাহারা বীর। তাহারা পূজনীয়। সূর্য সেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদ। সূর্য সেনের সাথীরা অগ্নিযুগের বিপ্লবী।

তাহারা নির্ভীক দেশপ্রেমিক, ইতিহাসের অমর নায়ক। যতদিন এই দেশের মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী মুখে-মুখে উচ্চারিত হইবে, মাস্টার-দা ও তাঁহার বিপ্লবী সাথী শহীদদের জীবন গাথা অজেয় দেশপ্রেম, চরম আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও আদর্শ প্রীতির পরশমণিরূপে প্রতিটি নরনারীর হৃদয় জাগরিত থাকিবে, ঘরে-ঘরে উচ্চারিত হইবে তাঁহাদের নাম।

সাঁইত্রিশ বছর পর পুনরায় আমরা তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিকে স্মরণ করিতেছি আর সালাম জানাইতেছি ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় দিন আঠারোই এপ্রিলকে।

এই বীর শহীদদের সালাম জানাইতে গিয়া স্বাধীনতার পরও আজ যাঁহারা কারান্তরালে, যাঁহারা দেশপ্রেমের জন্য আজও নির্যাতিত ও বিড়ম্বিত তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে ইতিহাসের ঋণের কথা। এই ঋণ হয়ত এখনও শোধ হয় নাই আর তাই সেই অগ্নিযুগের সাধকদের জন্য কবির যে বরাভয় ছিল আজিকার দেশপ্রেমিকদের জন্যও—সেই বরাভয় উচ্চারণ করিতেছি:

"ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,

নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

অবশেষে আয়ুব-শাহীর অচলায়তনে চিড় ধরলো এবং অচলায়তনের ভিত্ যে ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে স্বয়ং ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ কিছুটা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু ঝড়ের গতিবেগ যে এত ক্ষিপ্র হবে তা ভাবতে পারেন নি। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ইস্কানদার মীর্জাকে বিতাড়িত করে যিনি পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করলেন তিনি ১৯৬৮ সালের সেই অক্টোবর মাসেই জনতার দরকারে আসামীর কাঠগড়ায় সমুপস্থিত হলেন। যদিও 'প্রভু নয় বন্ধু' আত্মজীবনীতে দশ বছর ধরে পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন তার সময়পঞ্জী ও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত তুলে ধরেছিলেন—তবুও জনগণের দৃষ্টিতে তিনি চরম অপরাধী হয়েই ছিলেন।

গত অক্টোবর মাসে আয়ুব-শাহী যখন তার দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঘটা করে প্রগতির এক দশকের 'ঢাক-ঢোল' পেটাচ্ছিল সে সময় আয়ুব সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-আন্দোলন সুরু হোল পশ্চিম-পাকিস্তানে।

আয়ুব-তন্ত্রের বিরুদ্ধে পাক-জনতার আন্দোলন এই যে প্রথম সুরু হোল তা নয়। আন্দোলন, অন্ততঃ পূর্ব-পাকিস্তানে দীর্ঘকাল ধরেই চলছিল। এবার পশ্চিম-পাকিস্তানেও আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হোল। অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে অংশ

থেকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তার শক্তি সংগ্রহ করতেন সেই অংশেই তিনি হয়ে উঠলেন অনেকের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। পূর্ব এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের অভিযোগের ধরন অবশ্যই এক ছিল না, লক্ষ্যও আলাদা কিন্তু একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে যারা কবর দিয়েছে দেশের দুই অংশের কোন অংশই সেই স্বৈরতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠীকে চায়নি। পাক-রাজনীতিতে এই ঘটনা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

গত অক্টোবর মাসের ছাত্র আন্দোলনের পেছনে পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারে যে আয়ুবের বহু ঢক্কানিনাদিত 'বেসিক ডেমোক্রেসী' একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ভাঁওতা—ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার কৌশল মাত্র। সুতরাং জনসাধারণ সুনিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে সভা-সমিতি, বিক্ষোভ মিছিল গড়ে তুলে সমবেত শক্তিতে আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলেন।

এ সময় সারা বিশ্বের উৎসুক দৃষ্টি পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর নিবদ্ধ ছিল—যে পশ্চিম-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ আয়ুব-শাহীর গত এক দশকের মধ্যে এই সর্বপ্রথম মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো—যেখানে করাচীতে সীমিত আকারে যে ছাত্র-বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল মাত্র তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো।

পশ্চিম-পাকিস্তানের শহরে-শহরে সাধারণ মানুষ, ছাত্র এমন কি বিত্তশালী আইনজীবীদের ব্যাপক প্রতিবাদ-মিছিল ও আন্দোলনের অসাধারণ গুরুত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের ঈশান কোণেও যে কালো মেঘ সুদীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত হয়েছিল সে বিষয়েও সারা দুনিয়ার মানুষ অবহিত ছিলেন। একথা সত্যি যে, পূর্ব-পাকিস্তান বরাবরই রাওয়ালপিণ্ডির বিশেষ দুশ্চিন্তা ও শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল যে এবার পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক আকাশে

যে প্রবল ঝড় উঠবে তা সে অঞ্চলের গত কুড়ি বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসকেও ম্লান করে দেবে।

ঘটলোও তাই। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সাতদিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে পদার্পণ করার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে গণ-বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল। প্রথম দিনই অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ যেদিন জাতীয় আওয়ামী দল (ন্যাপ) মওলানা ভাসানির নেতৃত্বে প্রদেশব্যাপী 'নির্যাতন বিরোধী দিবস'-এর ডাক দিয়েছিলেন—কিছু-কিছু বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সে বিক্ষোভ বিস্ফোরণের মত সশব্দে ফেটে পড়ে। পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু ব্যক্তি হতাহত হন, বহু যানবাহন অগ্নিদগ্ধ হয়, সাধারণ ধর্মঘটে ঢাকা নগরী অচল হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে আয়ুবী সন্ত্রাসের নির্লজ্জ প্রদর্শন।

আয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছিলেন মৌলানা ভাসানির ন্যাশনাল আওয়ামী দল ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তান কৃষক সমিতি এবং পূর্ব-পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন। বিক্ষোভকারীদের দাবী ছিল : 'শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার চাই', 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র বাতিল করতে হবে' 'সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।' ইত্যাদি—

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের বর্ষীয়ান নেতা জনাব নুরুল আমীন ঢাকা শহরের উদ্বেগজনক অবস্থা আলোচনার জন্য পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু সরকার-পক্ষ রাজী না হওয়ায় বিরোধী সদস্যরা একযোগে অ্যাসেমবলি ছেড়ে চলে যান।

আয়ুবের একান্ত বশংবদ রাজ্যপাল মোনেম খান সাহেব মূলতঃ প্রভুর মন তুষ্টির উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়তঃ পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বলতে থাকেন, পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আয়ুব-সরকার যে অনেক কিছু করেছেন পশ্চিম-পাকিস্তানের গণ-বিক্ষোভ তারই প্রমাণ,—কারণ যদি সবই শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের পিছনেই ঢালা হোত তবে সেখানে কি আর এত সরকার-বিরোধী হাঙ্গামা হোত ?

যে কোন মুহূর্তে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রচণ্ড ঝড় ওঠার সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল—এর মধ্যে অন্যতম হল পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মেহবুব মুরশেদের নাটকীয় ঘোষণা যে তিনি আয়ুব-বিরোধী রাজনীতিতে সামিল হবেন।

বিচারপতি মুরশেদ ইতিমধ্যেই আয়ুব-শাহীর কোপদৃষ্টিতে পড়েন—ঢাকায় তাঁর বাসভবনে একাধিকবার খানাতল্লাশি চালানো হয়, তাঁকে 'হিন্দুস্থানের চর' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিচারপতি মুরশেদ পশ্চিম-বঙ্গের মুর্শিদাবাদের মানুষ। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ছিলেন এবং দেশ-বিভাগের বেশ কিছুদিন পরে তিনি ঢাকায় চলে যান। আরও উল্লেখযোগ্য হলো যে তাঁর সহধর্মিণী (কলকাতার প্রাক্তন মেয়র জ্যাকেরিয়া সাহেবের কন্যা) এখনও ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেননি, যদিও তিনি ঢাকাতে স্বামীর সঙ্গে বাস করছেন। যদিও প্রাসঙ্গিক নয় তবুও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিচারপতি সৈয়দ মেহবুব মুরশেদের ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব সৈয়দ মুসতাফ মুরশেদ আই. এ. এস্ বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের যুগ্ম স্বরাষ্ট্র সচিব।

অবশ্য বিচারপতি মুরশেদের রাজনীতিতে যোগদানের গুরুত্ব শুধু আয়ুবের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তাঁর ভূমিকা নয়। পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ও ঘোরাল রাজনীতিতে তাঁর অন্যতম অবদান হতে পারত নিরপেক্ষ একটি 'প্রতীক' হিসাবে বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন বিবাদমান অংশকে একটি যুক্ত মোর্চায় সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলে আয়ুব-শাহীর স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার অদম্য প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া। ভুট্টো, আগসর খান, ভাসানী, আবদুল ওয়ালি খান, নুরুল আমীন বা মুজিবর রহমান খানের মত বিতর্কিত বিভিন্ন মত ও পথ-অবলম্বী ঝানু রাজনীতিবিদ্‌দের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে বিচারপতি মুরশেদ তাঁর নিরপেক্ষ কর্মজীবনের পটভূমিকায় এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিলো।

ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের পূর্ববঙ্গ সফরের সময় রাজধানী ঢাকা নগরী উত্তাল হয়ে উঠলো। বর্ষিয়ান বিরোধী নেতা নুরুল আমীন সাহেব মিছিল নিয়ে পথে বেরোলেন, গুলি চললো, রক্ত ঝরলো, কিন্তু আন্দোলন স্তব্ধ হোল না—দাবানলের মত বেড়েই চললো।

ঢাকা শহরে সমবেত হয়ে আয়ুব-বিরোধীরা সেখানে ডেমক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি বা ডাকের গঠন করলেন। অংশ নিলেন আটটি আয়ুব-বিরোধী দল। তাঁদের মধ্যে থাকলেন আওয়ামি লীগ, সোভিয়েট পন্থী জাতীয় আওয়ামি লীগ (এটা ভাসানির জাতীয় আওয়ামি লীগ নয়, ভাসানির লীগ চীনপন্থী), জামাইত-ই-ইসলামি এবং পাকিস্তান ডেমক্র্যাটিক মুভমেন্টের (P. D. M.) পাঁচটি দল। তাঁরা অক্টোবরের নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা আট-দফা দাবি তৈরি করলেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল :

১। সাম্প্রতিক আন্দোলনে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে হতাহতদের জন্য ক্ষতি পূরণ দান।

২। পূর্ব-পাকিস্তানে ১৫বিঘা ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাড়ে ১২একর পর্যন্ত জমিকে খাজনামুক্ত ঘোষণা। কৃষকদের সকল বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, খাস জমি সত্ত্বাধিকার চাষীদের প্রদান, ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদেরকে খাসজমি প্রদান ও পশ্চিম-পাকিস্তানী চাষী উচ্ছেদ বন্ধ করা।

৩। শ্রমিকদের দাবী অনুসারে শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ধার্য, সকল শ্রমিক দমন আইন বাতিল ও আই-এল-ও কনভেনশন অনুযায়ী সকল অধিকার প্রদান করা।

৪। নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল এবং প্রোগ্রেসিভ পেপার লিমিটেডকে তার খোদ মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করা।

৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণ জাতীয় সমস্যা বলে মেনে নেওয়া।

৬। ছাত্রদের দাবীসমূহ মেনে নেওয়া।

৭। কৃষক, মৎস্যজীবী ও ক্ষুদ্র কারিগরদের নিকট থেকে ঋণ আদায় বন্ধ করা।

মূলতঃ দক্ষিণপন্থী 'ডাক' আওয়ামি লীগকে আপন দলে টানতে পেরে বিরাট সাফল্য লাভ করলেন, কেননা আওয়ামি লীগ পূর্ব-বঙ্গে দারুণ জনপ্রিয়। কিন্তু বামপন্থী ভুট্টো এবং ভাসানি সম্পূর্ণ-রূপে অস্বীকার করলেন 'ডাকে'র সঙ্গে হাত মেলাতে, কেন না তাঁদের চোখে আয়ুবের সঙ্গে 'ডাকে'র মূলত কোন পার্থক্য ছিল না।

এই সময় ছাত্রদের নেতৃত্ব দিলেন ছাত্রনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব তোফায়েল আহমদ। তিনি সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন কিন্তু তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করলেন না। গত কুড়ি বছরের অবিরাম সংগ্রামে—সংগঠন, আন্দোলন ও নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজের চিন্তা, ভাবনা ও চেতনা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল। সে লক্ষ্যকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তার এগার দফা দাবীতে রূপায়িত করেছিল।

এই এগার দফা দাবী ছিলো :

১। শিক্ষাসমস্যার আশু সমাধান।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

৩। স্বায়ত্তশাসন।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু সহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করে ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাঙ্ক, বীমা, ইনস্যুরেন্স, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

৬। কৃষকদের উপর কর ও খাজনা হ্রাস। বকেয়া খাজনা ও ঋণ

মকুব। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, তহশীলদার অত্যাচারী ক্ষমতা হ্রাস। পাটের সর্ব নিম্ন মূল্য ৪০ টাকা মণ ও আখের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার, ধর্মঘট ইত্যাদি ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহার।

৯। নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার।

১০। সীয়াটো, সেন্টো ইত্যাদি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।

১১। আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি সহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং রাজনৈতিক কারণে জারী সমস্ত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার।

এই দাবিগুলোর কোনটাই ফাঁকা দাবি নয়। ছাত্র পরিষদ প্রত্যেকটি দাবি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা তিন নম্বর দাবি সম্পর্কে তাঁরা কী-কী চান, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসন-ভিত্তিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য বিষয়ে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে, কিন্তু শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে, দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। সকল প্রকার

কর খাজনা ধার্য এবং তা আদায় করার ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যের হাতে, ফেডারেল সরকার কোন কর ধার্য করতে পারবেন না। অঙ্গ-রাজ্যের আদায়ী রেভেনিউর নির্বাচিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে এবং এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

আরো ব্যাখ্যা আছে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক পৃথক হিসাব রাখবে এবং বহির্বাণিজ্যে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাজ্যের এক্তিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলি শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারে ফেডারেল সরকারকে দেবে। দেশজাত দ্রব্য বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদান-প্রদান চলবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি রপ্তানি করার অধিকার অঙ্গরাজ্যের থাকবে।

এবং সর্বশেষে, পূর্ব-পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবিগুলো যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, বাস্তব কি অবাস্তব, সেই প্রশ্নে না গিয়েও পরিষ্কার একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা কী চান, তাঁদের কর্মসূচীর কী ভিত্তি, সেবিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার। তেমনই পরিষ্কার শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের দাবিগুলো।

তাঁরা বলছেন, স্বচ্ছল যেসব কলেজ আছে তাদের প্রাদেশিকী-করণের নীতি ত্যাগ করতে হবে। জগন্নাথ কলেজের মতো যেসব কলেজকে প্রাদেশিক করা হয়েছে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে হবে, বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলো অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, টেকনীক্যাল, পলিটেকনিক এবং কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে। নৈশ কলেজ বা

নৈশ শিফট্ চালু করতে হবে। ছাত্রবেতন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করতে হবে। স্কলারশিপ এবং স্টাইপেণ্ডের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে সেসব কেড়ে নেওয়া চলবে না। কলেজ হল ও ক্যান্টিন সমস্যা দূর করতে হবে, সেজন্য সরকারকে সাবসিডি দিতে হবে।

এর থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ দাবি হচ্ছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার। দপ্তর আদালতেও বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। নারীশিক্ষার চাই ব্যাপক প্রসার।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার, নমিনেশনে ভর্তি করার প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল—এগুলোও শিক্ষাগত দাবির অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন আনতে হবে। শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির কুখ্যাত হাতিয়ার জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল করে গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কায়েম করতে হবে।

ছাত্রদের এই দাবিগুলো মৌলানা ভাসানি পুরো সমর্থন করলেন। ছাত্রদের আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ইতিহাস তৈরি করেছে। জাতীয় আওয়ামি লীগের চৌদ্দদফা দাবির সঙ্গে ছাত্রদের এগারদফা দাবির কোন পার্থক্য নেই।

আওয়ামি লীগের শেখ মুজিবর রহমানও জানালেন তাঁদের ছয়দফা দাবি ছাত্রদের এগারদফা দাবির মধ্যেই আছে। ছাত্রদের আন্দোলনকে তিনি পুরো সমর্থন করলেন।

পাকিস্তানি পিপলস পার্টির ভুট্টোও ছাত্রদের অভিনন্দন জানালেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপকতায় দিশেহারা প্রেসিডেন্ট আয়ুব ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন। দেশের উভয় অংশে প্রচণ্ড দমননীতির ব্যর্থতায় বিচলিত

হয়ে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর তল্পীবাহকদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল এবং তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগ্রহ প্রকাশ না করলে তাঁর পতন সমাসন্ন।

'ডাকে'-র আহ্বানে অনুষ্ঠিত ১৪ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৬৮) হরতালে সারা পাকিস্তান অচল হয়ে পড়ল। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব-পাকিস্তানের গণমানস প্রবুদ্ধ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ যেন শুধু একটা দিন নয়, নবজাগ্রত একটা জাতির দীর্ঘ পদচারণার এক ঘনীভূত ইতিহাস। এবার পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম শহীদ-দিবসে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছিল। ঢাকা সেদিন জনতার হাতে। ছাত্ররা উদ্ধত ব্যক্তিদের তারা স্বদেশী বা বিদেশী যাই হোক না কেন পা থেকে জুতো খুলতে বাধ্য করছে। নগ্নপদে সবাই চলেছে পূর্ব-বাংলার ন্যায্যদাবী আদায়ের জন্য রক্তক্ষরণের দৃঢ় শপথ জানাতে। এমনি দিনে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ঘোষণা শোনা গেল যে পাকিস্তানের আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি অংশ গ্রহণ করবেন না।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এই নাটকীয় ঘোষণার পরদিনই ঢাকায় একটি সরকারী প্রেসনোটে জানান হোল যে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সবাই এখন মুক্ত। বিজয়ী সহর্ষ জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব দেশে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এবার শুধু আগরতলা মামলা তুলে নেওয়া বা শেখ মুজিবরের মুক্তি নয়—'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রায় আড়াই বছর পরে মুক্ত হোল। পূর্ব-পাকিস্তানে জেলের তালা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন রাজবন্দীরা—মণি সিং, মোজাফফর আহমদ, ছাত্রী-নেত্রী

বেগম মতিয়া চৌধুরী, সন্তোষ ব্যানার্জি, মন্মথনাথ দে, অমল সেন ও মণিকৃষ্ণ সেন। তাঁদের মুক্তি দিবসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনে সমবেত হাজার হাজার জনতা শ্লোগান দিলেন : 'জেলের তালা ভেঙেছি—মণি সিং-কে এনেছি।' ময়মনসিংহে গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাজং উপজাতিদের টঙ্ক আন্দোলনের পুরোধা সুসং জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ-সন্তান মণি সিং-এর পাকিস্তানে কারামুক্তি শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাকিস্তান রাজনীতির গতি-প্রকৃতিতে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের একটি প্রতীক। জনতা যখন জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন তখন কারামুক্ত মনি সিং একটি কথা বলেছিলেন—'আমার চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আজকের আন্দোলনের মত আন্দোলন আর কখনও দেখিনি। বন্ধুগণ, দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার যে বিপুল প্রচেষ্টায় আপনারা ব্রতী হয়েছেন আমার সাধ্যমত সেই প্রচেষ্টার আমি সামিল হবো।'

গণসংগ্রামের এরকম প্রচণ্ড ধাক্কা সাম্প্রতিক কোন সামরিক ডিক্টেটরকে যে এভাবে পর্যুদস্ত করতে পারে তার নজির শুধু বিরল নয় অনন্য। সংগ্রামী ছাত্র ও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিরা ছাড়াও এ আন্দোলনে আবরু ফেলে নেমে এসে ছিলেন ঘরের-মা-বোনেরা, লাঙল ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলেন গাঁয়ের কৃষক, কলকারখানার আঙিনা ত্যাগ করে সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন শ্রমিক ভাইরা। শহীদদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বলে উঠেছিলেন :

'আমাদের ভাই ওরা আমাদের লোক
আমাদের করে গেছে এক
একটি জলন্ত অঙ্গার,
সার্থক করে যেতে হবে
রক্তদানের সেই
অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা'।

(পূর্ব-পাকিস্তানের কবি মোস্তাফার লেখা থেকে)।

আয়ুব-প্রস্তাবিত ও বহু প্রতীক্ষিত গোলটেবিল বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন: (১) তিনি শাসন ক্ষমতা থেকে অবসর নেবেন। (২) মৌলিক গণতন্ত্রের স্থান নেবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার-ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্র। (৩) এককেন্দ্রিক ভিত্তিক শাসনতন্ত্র বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। (৪) সংসদীয় শাসনে রাষ্ট্রপতির জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকারী ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল এবং রাষ্ট্রপতি নামেই থাকবেন রাষ্ট্র প্রধান।

গোলটেবিল বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের এগারদফা দাবী আয়ুব মানেননি। মৌলানা ভাসানির জাতীয় আওয়ামী লীগের চৌদ্দদফা ও আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ছয়দফা দাবী কার্যত হলো অস্বীকৃত। পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বজনপ্রিয় দাবী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন রয়ে গেল অপূর্ণ। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ-কামী স্বায়ত্তশাসন-কামী মানুষের আন্দোলন গোলটেবিল বৈঠকের পরও ক্ষান্ত হোল না।

পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক এম. এন. হুদা নয়া গভর্নর নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এর কয়েক দিন পরেই খবর পাওয়া গেল যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান বিদায় নিয়েছেন—২৫শে মার্চ (১৯৬৯) পাকিস্তানের 'এক দশকের এক নায়ক' রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছেন। সারা দেশে সামরিক আইন বলবৎ হয়েছে। আয়ুবী স্বৈরতন্ত্রের পর স্থলবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল ইহায়া খান পাকিস্তানের নতুন নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এক স্বৈরাচারীর জায়গায় এসেছেন আরেক স্বৈরাচারী। স্বৈরাচারের খোলস-টা বদল হয়েছে মাত্র—মূল কাঠামো একই আছে।

কিন্তু যতদিন না পূর্ব-পাকিস্তানের তথা সারা পাকিস্তানের মানুষের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরায় স্বীকৃত হয় বা পূর্ব-বঙ্গের

মানুষ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে সক্ষম হন, ততদিন তাদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চলবে। ততদিন—

'যতদিন দুই হাত থাকবে সবল,
যতদিন রক্তের তাপ থাকবে
সত্য থাকবে স্থির অন্তরে
যতদিন জড়াবে না
জিহ্বা ততদিন'

(পশ্চিম-পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমদের কবিতা থেকে)

আয়ুব-শাহীর পরিক্রমা শেষ হয়ে এল।

জাগ্রত জনমতকে দাবিয়ে রাখা কোন দেশেই কোন কালেই সম্ভব হয়নি। যে কোন গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ে শাসক শ্রেণীর নিপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেওয়ায় জন্য তার প্রচণ্ড চেষ্টা থাকবেই, কিন্তু বাঁধন যতই শক্ত হবে একদিন না একদিন সে বাঁধন টুটবেই এবং অত্যাচারী শাসককে জনতার গণতান্ত্রিক দাবীর কাছে মাথা নোয়াতে হবে। যেমন হয়েছে পশ্চিম-বাংলায়, যেমন হয়েছে পাকিস্তানে। পশ্চিম-বাংলার মানুষ একটানা একুশ বছরের শাসন ব্যবস্থায় বিপর্যস্ত হয়ে নিষ্পেষিত হয়ে এবারের নির্বাচনে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের রায় জানিয়ে দিয়েছেন—তাঁরা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি নিয়ে গঠিত 'যুক্তফ্রণ্ট'কে বিপুল সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করেছেন। আজ এখানে জনতার একান্ত আপনজনেরা জনতার রায়েই এ রাজ্যের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন।

পাকিস্তানেও ঠিক তেমনি এসেছে দিন বদলের পালা। সেখানেও ঢেউ উঠেছে। সারা পাকিস্তানে গণ-জাগরণের ঢেউ উঠেছে।

তাই ঢেউ উঠেছিল, সংগ্রামের ঢেউ উঠেছিল পূর্ব-পাকিস্তানে—পশ্চিম-পাকিস্তানেও। ধ্বসে পড়েছে আয়ুব-শাহী, যবনিকার অন্তরালে

আশ্রয় নিয়েছে গণতন্ত্র হত্যাকারী আয়ুব খান—মোনেম খান গোষ্ঠী। ফুরিয়েছে আয়ুব-শাহীর শাসনের দিন, পতন হয়েছে উন্মত্ত আয়ুবের।

পদ্মার ওপারে আমাদের ভাইরা লড়েছেন, লড়ছেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর আয়ুবী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এপারে আমরাও লড়েছি, লড়ছি।

সীমান্তের ওপারে আমাদের ভাইদের সংগ্রাম আমাদের অভিজ্ঞতা যোগায়, যোগায় প্রেরণা যেমন এ পারে আমাদের সংগ্রাম যোগায় ওপারে তাঁদের। তাই এপার থেকে আমরা হুঙ্কার দিয়ে বলি—সামন্ত-তন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, শোষণতন্ত্র সাবধান—হুঁশিয়ার! আমাদের ভাইদের সঙ্গে আমরা আছি যেমন আমাদের সঙ্গে আছে ওরা, আছে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ।

সংগ্রামের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে পূর্ব-পাকিস্তানে আর পশ্চিম-বাংলায় এসেছে দিন বদলের পালা। রক্তিম হয়ে উঠছে দুই বাংলার আকাশ—এ যেন নব সূর্যোদয়ের পূর্বাভাষ।

'পূর্ব দিগন্তে এই যে বিপ্লবের শিখা, এর আভা পশ্চিম-বঙ্গেও অন্যত্র পড়বে। সর্বত্রই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। সকল গণতান্ত্রিক জনমানুষের স্বার্থ আজ এক। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সংগ্রাম পরস্পরের পরিপূরক। এই সংগ্রামেই উভয় দেশের সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডুকতা ও প্রতিক্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড তৈরী হচ্ছে; ভারতবর্ষেও যে সব শক্তি গণতন্ত্রের গলা টিপে মেরে সামরিক শাসন কায়েম করার স্বপ্ন দেখতেন, তারা পাকিস্তানের আয়ুব-শাহীর এই দশা দেখে শিক্ষা পাবেন সন্দেহ নেই। এই অর্থে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের এই সংগ্রাম ভারতবর্ষেও প্রগতিশীল ভারতবাসীদেরও সাহায্য করেছে। যারা আজ ওদেশে শহীদ, তারা আমাদেরও শহীদ।' (শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, কম্পাস, ১লা মার্চ, ১৯৬৯)

'এপার বাংলা ওপার বাংলা'-র মানুষের ঐক্যের প্রতীক বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ব-বাংলার এক সংগ্রামী কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি এখানে উদ্‌ধৃত করে আমার এ কাহিনীর ইতি টেনে দিলাম।

আমরাও বাংলা

আমাকে কুচিকুচি করে কাটলেও
রক্ত মাংস সবটুকুই
বাঙলা
হৃদয়ের দুঃখ শোক প্রেম, শান্তি সবটুকুই
বাঙালী।

বাঙলার বড় বেদনা
তবু এ বেদনা ছাড়াও
অনেক গল্প নাটক সাহিত্যে
অনেক গানে গানে
অনেক ভাষার বেদনা
হৃদয়ে অনুভব করি
অনেক শেক্সপীয়র দান্তে তলস্তয়ের স্মৃতিতে
মাথা নিচু হয়
কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডের রক্তধারায়
গোটা একটা রবীঠাকুর।

খেতে শুতে উঠতে বসতে
বিরহে মিলনে
হৃদয়ের কানে কানে গান গায়
রবীন্দ্রনাথের ভাষা
হৃদয়কে ঘর পার করে পৃথিবীর পড়শীদের সাথে
মিতালী পাতিয়ে আনে
এই ভাষা

প্রতি পদক্ষেপে পরাজয়ের পর পালাবার পথে
মস্তিষ্কের কোষে কোষে
হৃদয়ের অলিতে গলিতে
নিঃশব্দে পদচারণা করে ফেরে
সবাক অথবা নির্বাক
আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষা।

এ ভাষাই
রবীন্দ্রনাথ।

আমরাও বাঙলা।

নিয়ামত হোসেন—

পূর্ব-পাকিস্তান জিন্দাবাদ্
পশ্চিম-বাংলা জিন্দাবাদ্